রাশিয়ান রমণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তখন "ড্রেফুস"-ব্যাপারে ইয়ুরোপ আন্দোলিত হইতেছিল। কোন প্রয়োজনীয় পত্র হস্তগত করিবার মানসে লুই গিলবেয়ার য়িহুদী-সম্প্রদায়-কর্তৃক বার্লিন নগরে প্রেরিত হইয়াছে।

"আজ রাত্রি দুই প্রহরের ট্রেণে প্যারিস প্রত্যাগমন করিব; তুমি । পত্র লইয়া সেই সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিও" ভৃত্যকে এই আদেশ দি লুই "শীত-উদ্যান" রঙ্গালয় অভিমুখে প্রস্থান করিল।

যখন তুষারশীতল রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সে শীত-উদ্যানের বিস্তৃত ঙ্গনে উপস্থিত হইল, তখন 'বল' নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, গৃহ বিবিধ-বেশধারী বনা ীতে পূর্ণ। এক ক্ষুদ্র টেবিলে বসিয়া লুই কফি পান করিতে করিতে াসী ও জর্ম্মাণ নৃত্যশালার মানসিক তুলনা করিতেছে; অদূরে তাঁহাকে দ্দশ করিয়া এক ব্যক্তি কোন রমণীকে বিদেশী ভাষায় অনুচ্চস্বরে কি তেছিল সে তাহা জানিতে পারে নাই।

বাজনা নীরব হইল নৃত্যও ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য স্থগিত রহিল, রঙ্গা-টেবিলগুলি পানার্থি-বেষ্টিত হইয়া গেল।

দেখিও, নেট্কা, সাবধান, যেন বিফল হইওনা।"

মামার কি কখন বিফল হইতে দেখিয়াছ?" রমণীর উত্তর অভিমান-

।

স্বস্ত হইয়া পুরুষ বিদায় লইল, যাইবার সময় কেবল বলিল "সঙ্কেত া ভুলিও না"।

ার বাজনা বাজিয়া উঠিল আবার নৃত্য আরম্ভ হইল। এ মৃত্য জন্য। লুই এর নৃত্যলিপ্সা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

দেখিল পার্শ্বস্থিত টেবিলে একটি রমণী একা বসিয়া নৃত্য দে
তাহার মুখে নেত্র-আবরণ (mask)। তাহার নিকট গিয়া লু
কহিল "আপনার সঙ্গলাভে আমি কি কৃতার্থ হইতে পারি?"
ণী মৃদু হাসিয়া স্বীকৃতা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেট্‌ক্সা ও লুই নৃত্যে
বর্ত্তে মিশাইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"বিদেশিন্, এই আমার ক্ষুদ্র কুটীর" এই বলিয়া সেট্‌ক্সা তুষার-প্রবেশ নিবারক বহির্বাবরণ উন্মোচন করিয়া অগ্নি-আধারসমীপস্থ কৌচে উপবেশন করিলেন।

তখন রজনী দেড় প্রহর হইবেক। বাহিরে অবিরাম তুষার পা হইতেছে। কৃষ্ণকায় আকাশ হইতে কে যেন ক্রমাগত লবণ-রাশি ঢালি তেছে। রাজপথ, গৃহতরু সকলই শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আর নগর বৈদ্যুতিক আলোকে প্রতিভাত হইয়া সে সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া

নৃত্যশালা হইতে রমণী গৃহে প্রত্যাগমনে উদ্যতা হইলে তাহার ভৃ অকারণ অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হইল. সে একাকী গৃহগমনে সঙ্কুচিতা, অগত্যা লুই অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে গৃহে পঁহুছাইয়া দিতে আসিল লুই প্যারিসিয়ান; বিপন্ন রমণীর জন্য তাহার আত্মত্যাগ বিস্ময়জনক নহে

'ক্ষুদ্র কুটীর' শুনিয়া লুই বলিল "এ যদি কুটীর মাদমোয়াজেল, প্রাসাদ কাহাকে বলিব"?

"যাহা হউক বিদেশিন্, তুমি যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছ তাহার জন্য চিরকৃতজ্ঞ।"

এমন সময়ে ভৃত্য সুরা প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল। ট্রেণ তখনও নিরাহার ছিল, তাহার উপর সুন্দরী রমণীর উপরোধ। ক্ষু

উৎসর্গ।

ন্ধে যথার্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বোধ হয়
ন্য ছিলেন রাজনৈতিক তোষামোদ অথবা
লেন। তিনি কখনও একটী সৎকার্য্যের ও
াস্ত থাকিতেন না অথবা কেহ কোন অপকর্ম্ম করিলে,
ক্য উচ্চ পদস্থই হউন না কেন, তাহার যথোপযুক্ত নিন্দা না
হইতেন না।

শ্রীযুক্ত ডো সাহেব ফেরিস্তার ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইংে
বাদ বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রকাশ করেন। কিন্তু সে অনু
র্ণ মূলানুগত হয় নাই। পারস্য কেতাবাদি ইংরাজিতে অনুদিত করা সং
সকল মহাত্মা অগ্রগামী ও পথ প্রদর্শক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডো সাহে
কতম; সেজন্য তদীয় গ্রন্থে ভুলভ্রান্তি থাকা কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক
কাপ্তেন স্কট সাহেব দক্ষিণাপথের বিবরণাংশের অনুবাদ প্রচার করিয়
ঐতিহাসিক সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। জেনারল ব্রিগস্ সাহে
চারিখণ্ড সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিয়া অক্ষ
কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। ইংরেজী অভিজ্ঞ পাঠকগণ বিভিন্ন গ্রন্থ হই
ভারতীয় মোসলমান শাসনের যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন তৎসমুদই ব্রি
সাহেবের গ্রন্থে একস্থানে সন্নিবদ্ধ আছে। ব্রিগস্ সাহেব আবশ্যকীয় তথ
কয়েকটী পরিশিষ্ট মূলগ্রন্থের অনুবাদের সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন

শ্রীরামপ্রাণ গু

—*—

ফরিস্তা যে নানারূপ ভ্রম প্রমাদে পতিত হ

হ।

মু যুগের আরম্ভ হইতেই ফেরিস্তার ইতিহাসে

। ফেরিস্তা স্বীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ জন্য সমস্ত বি

ণস্থল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই ইতিহা

মোসলমান রাজবংশ-সমূহের বিবরণও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদত্ত হই

স্থকর্ত্তা যে অবস্থায় ইহা রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাদৃশ পুঙ্খানুপুঙ্খ

প্রদান করিবার পক্ষে অনুকূল ছিল। ফেরিস্তা ভূমিকায় লিখিয়াছে

তিনি ৩৫ খানি বিভিন্ন ইতিহাস হইতে স্বরচিত পুস্তকের উপকরণ

করিয়াছিলেন; কিন্তু পুস্তকের গর্ভে আরও বহুসংখ্যক ইতিহাসের না

উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফেরিস্‌তা এই সকল গ্রন্থের গ্রহণযোগ্য ঘ

সকল এমন সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে সাধারণ পাঠকের পা

বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন করা অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য ফেরিস্‌তা

সকল গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশের

পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা একান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। একস্থানে সমুদয় মোসল

ান ইতিহাসের সার সংগ্রহ প্রদান করাতে যেমন একদিকে সুবিধা হইয়া

তেমনি অন্য দিকে উহাতে কিয়ৎ পরিমাণে দোষের স্পর্শও ঘটিয়াছে

থ্যের পর তথ্য উপর্য্যুপরি সন্নিবিষ্ট হওয়াতে ঘটনা সমূহ উপযুক্ত সমালোচনা

কারে পরিব্যক্ত না হওয়াতে কোন কোন অংশ প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও প্রাঞ্জল

ত পারে নাই।

ফেরিস্‌তার ইতিহাস পক্ষপাত অথবা কুসংস্কারদুষ্ট নহে; এমন কি তিনি

পতির অনুমত্যনুসারে ও অর্থ সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহারও

তোষামোদবাক্যে লেখনীর অপব্যবহার করেন নাই। কিন্তু সৈয়দকুল

কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার সময় ধর্ম্মবিদ্বেষের হাত হইতে একবারে

ণ লাভ করিতে পারেন নাই এবং মোসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক নির্দ্দোষ

র রক্তপাতের বর্ণনাতেও কিয়ৎ পরিমাণে গোঁড়ামি ও

ন। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই দুই

তদীয় স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের সঙ্গে তুলনায় স

ন। পক্ষান্তরে জুলস্মোল সাহেব
খৃষ্টাব্দেও স্বীয় গ্রন্থ সংশোধনে ব্যাপৃত ছি
। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন; তাহ
ন্ত জীবিত ছিলেন।।

বীয় ইতিহাসের খসড়া ইব্রাহিম
তিনি আবশ্যক মত সংশোধন, পরিবর্ত্তন
গ্রন্থে পরিণত করিবার জন্য জীবনের
ন। ফেরিস্তা গ্রন্থের শেষ ভাগে যে সকল
য়ন তন্মধ্যে পর্ত্তুগিসগণ কর্তৃক সুরাট নগরে
১৬১১ খৃষ্টাব্দে সুরাট নগরে পর্ত্তুগিসদের
রাল ব্রিগস সাহেব এই প্রমাণের উপর
ন যে ফেরিস্তা ১৬১১ খৃষ্টাব্দের কোন এক
তাহার অব্যবহিত পরেই কাল গ্রাসে পতি
কি তাহার দশ বৎসর পরের ঘটনার
। এজন্য ব্রিগস সাহেবের নির্দ্দেশ
না।

তিহাসের নাম গোল-মন-ই ইব্রাহিমি ও নৌরসনামা
বিজাপুরের অধিপতি এব্রাহিম শাহের নামে গ্রন্থ
হার নামের অনুকরণেই উহার প্রথমোক্ত নামাকরণ
ইতিহাসকে তারিখ-ই এব্রাহিমি নামেও অভিহিত
৪ খৃষ্টাব্দে নৌরস নামক এক নূতন রাজধানীর
র মুন্সির সন্তোষ বিধান

ফেরিস্তা প্রদত্ত হিন্দুরাজন্যবর্গের বৃত্তান্ত একান্ত ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন ফেরিস্তা বাধ্য পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমান ইতিহাসবেত্তাগণের গ্রন্থ অনুসর ছিলেন। এই সকল ইতিহাসবেত্তা হিন্দুধর্ম্ম-
গণের পরিচয় পেতা

রাশিয়া রাজ্যের গল্প শুনিতে শুনিতে লুই ভাবে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। মুখসংলগ্ন গ্লাসের উপর আলোকচ্ছটা পড়িয়া যখন "কিয়াস্তি"র রক্তবর্ণ উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিল, লুইএর মনে হইতেছিল, সে বর্ণ যেন রমণীর অধরপুটের মত।

"আপনি কি মুখাবরণ উন্মোচন করিবেন না, এ ভিক্ষা পাইবার অর্থি কি অযোগ্য ?"

হাসিতে হাসিতে, রমণী যখন নেত্রাবরণ উন্মুক্ত করিল, লুই ভাবিল "কি সুন্দর মুখ": তখন কিয়াস্তির বোতল নিঃশেষিত হইয়াছে।

রমণীর স্বদেশজাত সিগারেট (Cigarette) যখন অর্দ্ধনিঃশেষিত হইয়াছে, লুইএর মনে হইল যেন আকস্মিক ঘুমঘোর আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। উভয় তন্দ্রাবতী হইতেছে দেখিয়া মেট্জা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল।

"বিদেশিন্, ভবিষ্যতে আর কখন রাশিয়ান ধূম পান করিও না, আর বিদেশিনী স্ত্রীলোকের প্রলোভনে ভুলিও না।"

এতক্ষণে লুইএর মনে সন্দেহ স্থান পাইল। রমণী বলিতে লাগিলেন "আপনার নিকট যে পত্র আছে আমরা তাহাই চাই, তাহার জন্যই এই ফাঁদ পাতিয়াছিলাম"।

পিস্তল বাহির করিবার জন্য, কম্পিতহস্ত উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে লুই চেতনারহিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া লুই দেখিল সে কৌচের উপর। গতশেষ রাত্রের গত ঘটনা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তৎক্ষণাৎ পকেটে হাত দিয়া দেখিল—পত্র নাই।

পাগলের মত গাত্রোত্থান করিয়া, দেখিল অদূরে মেটুজা—রমণীর মুখে ম্লান হাসি। সকাতরে তাহার কাছে পত্রভিক্ষা করিল, রমণী উত্তর দিল "পত্র এখন শত যোজন দূরে"।

লুই কেবল ধীরে ধীরে বলিল "তুমি রমণী, আমি তোমায় কিছুই করিতে পারি না, কিন্তু এ জন্মে আমি আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না"।

বাতায়নের নিকট আসিয়া লুই দেখিল, তুষারপাত থামিয়া গিয়াছে ক্ষীণ চন্দ্রালোকে ধরাখানি যেন কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে পকেট হইতে পিস্তলটি বাহির করিল, আকাশের পানে চাহিয়া কাতরস্বরে বলিল "মার্গা-রীত, তুমি আমায় ক্ষমা করিও, আমি তোমার প্রেমের অযোগ্য"।

পিস্তলটি স্বীয় মস্তকোদ্দেশে ছুড়িতে যাইতেছে এমন সময় পশ্চাৎ হইতে মেটুজা আসিয়া ধরিল "না, না, বিদেশিন্ আত্মহত্যা করিও না"—তাহার স্বর অতি কাতর।

"তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, সমাজে মুখ দেখাইবার পথ বন্ধ করিয়া এরূপ জীবন বহনে লাভ কি? আমায় ছাড়িয়া দাও"।

"যে পথ আমি বন্ধ করিয়াছি, সে পথ আমিই আবার উন্মুক্ত করি পারি। বিদেশিন্, তোমার প্রেম ধন্য, মার্গারীতের জীবন ধন্য, তুমি অ কালে তাহার নাম লইতে উদ্যত! এরূপ ভালবাসা আমি কখন দেখি কই আমায় তো কেহ এরূপ ভাল বাসে না"—আবেগভরে তাহার চক্ষু বাষ্পে পরিপূর্ণ হইল।

লুইএর হস্তে পত্রখানি প্রদান করিয়া রমণী বলিল "এখনও সময় আছে আমার সহিত এস, তোমায় ষ্টেশনে পহুঁছাইয়া দি—"।

অকস্মাৎ কি মনে হইল, অকস্মাৎ দ্রুতগমনে পিয়ানোর নিকট গমন রিয়া একটি সুর বাজাইল; লুইকে বলিল "ইহা আমাদের সাঙ্কেতিক শব্দ, মার জন্য বহির্ভাগে চারিজন লোক অপেক্ষা করিতেছে, আমি বিফল ল তাহারা কার্য্যসমাধা করিবে; এই পত্র শুনিয়া তাহারা আমার দ্বারা সমাধা হইয়াছে স্থির করিয়া চলিয়া যাইবে। এখন আর বিলম্ব করিও ার সময় নাই।"

মুগ্ধের মত লুই রমণীর সহিত ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, ট্রেণ

ছিল, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রমণী লুই এর হস্তে এক হীরকাঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * *

দুই দিবস পরে লুই যখন মার্গারীতের সহিত কথা কহিতেছিল, অলক্ষ্যে তাহার নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু পতিত হইল। মার্গারীতের প্রশ্নের উত্তরে লুই বলিয়াছিল যে, সে অশ্রুবিন্দু বহুকালপরে মিলনজনিত সুখসম্ভূত; কিন্তু বোধ হয়, সেই রাশিয়ান রমণী তাহার পলায়নে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া পাষণ্ড হস্তে কি ভয়ানক শাস্তি প্রাপ্ত হইবে এই ভাবনায়ই অলক্ষ্যে এই অশ্রুবিন্দু ক্ষরিত হইয়াছিল।

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ

চৈনিক তীর্থযাত্রী।

— — * - - - —

মহাচীন হইতে যে সকল বৌদ্ধশ্রমণ ভারতবর্ষাভিমুখে তীর্থযাত্রা করিতেন, তাঁহাদের গ্রন্থে ভারতবর্ষের অতীত কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইবার আশায় দুইচারিজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যে সকল চৈনিক গ্রন্থের অনুবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাই এখন পর্য্যন্ত আমাদের একমাত্র অবলম্বন। সেকালের চৈনিক শ্রমণগণ ভারতীয় বৌদ্ধভূমি পরিক্রমণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় যেরূপ অধ্যবসায়ে ও কায়ক্লেশে নগনদী বিশাল বারিধি অতিক্রম করিয়া এদেশে উপনীত হইতেন, একালের আমরা স্বদেশের বিলুপ্ত কাহিনীর উদ্ধার করিয়া পুণ্যসঞ্চয় কামনায় তাহার শতাংশের একাংশমাত্র অধ্যবসায় লইয়া চৈনিক সাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত হইলে, এতদিনে অনেক পুরাতত্ত্বের লুপ্তোদ্ধার সাধিত হইতে পারিত। চৈনিক সাহিত্যে আমাদের পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহের কিরূপ সম্ভাবনা আছে তাহার আভাস দিবার জন্য সুবিখ্যাত ডাক্তার সামুয়েল বিল অনেকগুলি চৈনিক গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন;—দুর্ভাগ্যক্রমে সে সকল সহজলভ্য গ্রন্থও আমাদের দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হয় নাই!

খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই ভারতীয় বৌদ্ধমত এসিয়াখণ্ডের অনেক স্থলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কি সূত্রে ভারতীয় বৌদ্ধমত মহাচীন রাজ্যে প্রথম প্রবেশলাভ করে, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই; তাহা এরূপ শনৈঃ শনৈঃ সংসাধিত হইয়াছিল যে, কেহ সে কথা লিপিবদ্ধ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত চীনদেশের কোন বৌদ্ধশ্রমণের ভারত-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার সন্ধান পাওয়া যায় না; কিন্তু তৎকালে মহাচীন সাম্রাজ্যে বৌদ্ধমত বৌদ্ধাচার বৌদ্ধশিক্ষা ও বৌদ্ধসাহিত্য যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তীর্থযাত্রীগণ সমুদ্রপথে মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া চীনে ... ফিরিতেন। ভারতীয় শ্রেষ্ঠিসম্প্রদায়ের

...ত হইলেও, এ পথে পদে পদে বিপন্ন হইবার
. চীনদেশের লোকে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসিতেন

শ্রমণদিগের মধ্যে শাক্যপুত্র ফা হিয়ান সর্ব্বপ্রথম তীর্থযাত্রা লিপি-
করেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্যএসিয়ার
পথ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। দীর্ঘকাল ভারতভ্রমণ ও শিক্ষা
ভ করিয়া ফা হিয়ান সমুদ্র-পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার পদাঙ্ক
অনুসরণ করিয়া সুবিখ্যাত হিয়াঙ্গ থ্সাঙ্গ মধ্যএসিয়ার মরুপথে ভারতবর্ষে
প্রবেশ করিয়া নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও নানাতীর্থ পর্যটন করিয়া মধ্যএসিয়ার
পথেই খৃষ্টীয় ৬৪৫ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফা হিয়ান ও হিয়ঙ্গ
থ্সাঙ্গের দৃষ্টান্তে উত্তরকালে বহু বৌদ্ধশ্রমণ চীন হইতে ভারতবর্ষে উপনীত
হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ বা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, কাহারও জীর্ণ কং
ভারতবর্ষের ধূলির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৪৫ জন চৈনিক ভ্রমণকারীর ভারত ভ্রমণকাহিনী
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে;—তদ্দ্বারা খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দীর শে
পর্যন্ত তিনশত বৎসরের ভারতবিবরণী সংকলনের অনেক উপাদান সংগৃহীত
হইয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র মধ্যএসিয়া বৌদ্ধমতে অনুপ্রাণিত
ছিল;—দেশে দেশে বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধচৈত্য, বৌদ্ধশিক্ষা ও বৌদ্ধসাহিত্য
সমাদৃত হইত। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে আরবীয়গণ ইস্‌লামের নাম
মধ্যএসিয়া আক্রমণ করেন,—তৎকালে মধ্যএসিয়ায় মহাবিপ্লবের সূচনা হয়।
সে সময়ে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে যাতায়াত করাই চীনদেশের তীর্থযাত্রিবর্গের
পক্ষে সহজ ও নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

এই সকল তীর্থযাত্রিবর্গের মধ্যে ফা হিয়ান ও হিয়াঙ্গ থ্সাঙ্গের .
সুপরিচিত; অন্যান্যের কথা অনেকের অজ্ঞাত, সুতরাং ফা হিয়ান ও হিয়া
থ্সাঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিয়া পরবর্ত্তী তীর্থযাত্রিবর্গের কথাই সংক্ষে
আলোচিত হইল। এই সকল পরবর্ত্তী তীর্থযাত্রিবর্গের মধ্যে সর্ব্ব...
আই-সিঙ্গ।

খৃষ্টীয় ৬৯৪ অব্দে হিয়াঙ্গ থ্সাঙ্গের মৃত্যু হয়;
বালক ছিলেন। তথাপি তাঁহার হৃদয়ে ভারতভ্রমণে
ছিল। তিনি খৃষ্টীয় ৬৭২ অব্দে ৩৭ জন সহযাত্রী লইয়া ভা
হন। তৎকালে ক্যাণ্টন নগরে ভারতবাণিজ্যের বন্দর ছি
বাণিজ্যোপলক্ষে ভারতীয় অর্ণবপোত গতায়াত করিত। তাহারা যে
মহাসমুদ্রে ধাবিত হইত, চীনদেশের লোকে তাহাকে "দক্ষিণ সমুদ্রপথ" বলি
ভয়ে বিস্ময়ে অর্ণবপোতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন। এই সমুদ্রপ
একটি নির্দ্দিষ্ট মার্গ অবলম্বনে নির্দ্দিষ্ট ছিল,—চীন হইতে কম্বুর দ্বীপপুঞ্জ
হইতে সুমাত্রা দ্বীপস্থ শ্রীভোজবন্দর ও তথা হইতে কোয়েদাবন্দর পর্য্যন্ত এই
পথ পরিচিত ছিল। কোয়েদা হইতে তিনটি পৃথক পথ গৃহীত হইত,—
এক পথে সিংহল, অন্য পথে আরাকাণ ও মধ্যপথে নাগপত্তনে উপনীত
হ। এই সকল বিভিন্ন পথে পর্য্যটন করিয়া অর্ণবযান যথাকালে
তাম্রলিপ্তির প্রসিদ্ধ বন্দরে সমবেত হইত। এই সমুদ্রপথ কামরূপেশ্বর
... অবিদিত ও তদীয় রাজকীয় অর্ণবযানে সুরক্ষিত থাকিবার সময়ে
... সমুদ্রযাত্রা করেন। এই পথ যে বহুপুরাতন, ফাহিয়ান তাহার
পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহার আদি যেরূপ অন্ধকারে লীন হইয়া
হিয়াছে, কবে কি সূত্রে বাঙ্গালীর এই চিরপ্রচলিত সমুদ্রযাত্রা বিলুপ্ত হইয়া
গল, তাহাও সেইরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন! আমাদের সাহিত্যে ইহার সন্ধান
াভের আশা নাই। সুমাত্রা ও যবদ্বীপাদির ইতিহাস ও চৈনিক ভ্রম-
ণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত না থাকিলে, এই পুরাকাহিনী স্বপ্নকাহিনীর ন্যায়
অলীক বলিয়াই প্রতিভাত হইত। এখনও অনেকের এইরূপ ধারণা আছে—
এই সকল অর্ণবপোত কেবল সমুদ্রের কূলে কূলে তীরভূমি চুম্বন করিয়া নদী-
গামী নৌকার ন্যায় চলাচল করিত; তাহাতে সমুদ্রযাত্রার গাম্ভীর্য্য,
পোতচালনার কৌশল, বাণিজ্যবিস্তারের সাহস, বাহুবল ও অধ্যবসায়ের
...মাত্র পরিচয় ছিল না। এই সিদ্ধান্ত যে সত্য নহে, ফাহিয়ান তাহা
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কোয়েদা হইতে যে সকল পোত আরাকাণের
... তাম্রলিপ্তিতে গমনাগমন করিত এবং সিংহল হইতে যে সকল পোত
... পথে তাম্রলিপ্তিতে যাতায়াত করিত, তাহারা প্রায়ই কূলে কূলে

লিত হইত; কিন্তু ক্যাণ্টন হইতে কণ্ডুর, কণ্ডুর হইতে শ্রীভোজ, শ্রীভোজ
্তে তাম্রলিপ্তি ও সিংহল গমনাগমনে তীরভূমির আশ্রয় লাভের সম্ভাবনা
ল না। এই পথে ঝটিকা ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া নক্ষত্রমাত্র সহায় ও
ক্ষমাত্র অবলম্বন যাহাদের সমুদ্রযাত্রার সম্বল ছিল, তাহারা কোন্ শ্রেণীর
বিক ও কিরূপ সমাদরলাভের পাত্র বাঙ্গালীর সাহিত্যে তাহার পরিচয়
ই বলিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে তাহারা অপরিচিত;—তাহাদের বংশধর
ত্তমান বঙ্গীয় লস্করগণ এখন সম্পূর্ণ পৃথক জাতি বলিয়াই পরিচিত
াই-সিঙ্গ ভারতভ্রমণ সম্পন্ন করিয়া সমুদ্রপথেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।
ত্যাবর্ত্তনকালে তিনি শ্রীভোজে পোতারোহণে বিলম্ব করায় কিয়ৎকাল
দ্বীপে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে তিনি স্বদেশের তীর্থ
িগণের অবগতির জন্য "দক্ষিণ সমুদ্রযাত্রা"র বৃত্তান্তমূলক একখানি পুস্তক
করেন; তাহা অদ্যাপি অনুবাদিত হয় নাই। আই-সিঙ্গ ৫৬ জন
তীর্থযাত্রীর ভারতভ্রমণকাহিনী অবলম্বন করিয়া একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ
ন করিয়া গিয়াছেন; এই গ্রন্থ অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইলে ভারতীয়
িগণের ও সমুদ্রযাত্রার সম্পূর্ণ কাহিনী সভ্যজগতের সম্মুখীন হইবে। এই
্থের নাম "কাউ ফা কাও সাঙ্গ-চুয়া"।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

একখানি পত্র।

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য কলিকাতা পুলিশ আদালতের একটী সামান্য কেরাণীগিরিকার্য্যে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হন। ধরিতে গেলে দারিদ্র্যের সহিত তাঁহার আজীবন কঠোর সংগ্রাম এইখান হইতেই সূচিত! তৎকালে তিনি কুচবিহারাধিপতি মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের নিকট শাসনকর্ত্তার পদ প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখেন। আমরা পত্রখানি সংগ্রহ পূর্ব্বক বঙ্গানুবাদ-সহ নিম্নে অবিকল প্রকাশ করিলাম।

তখনও মধুসূদন মাতৃভাষা-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন নাই,—তখনও বাঙ্গলা কবিতা মিত্রাক্ষর-রূপ "কঠিন নিগড়ে" দৃঢ়বদ্ধা,—তখনও ত. বির অমর কাব্য "মেঘনাদবধ" সম্ভাবনা-রাজ্যের পরপারে! তথাপি অন্যান্য নানা কারণে মাইকেল মহারাজ বাহাদুরের সহিত বিশেষরূপ পরিচিতই ছিলেন! কিন্তু যোগ্যতা ও অধিকার—এতদুভয়ের মধ্যে তোষামোদ-বর্ম্ম চিরদিনই সসম্মানে বিরাজ করিতেছে! পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন—পত্রখানির কোথায়ও উপযাচকত্বের গন্ধমাত্র নাই, বরং ইহার প্রতি বাক্যে মাইকেলের স্বভাবসুলভ অভিমানদীপ্ত সরল তেজস্বিতাই অভিব্যক্ত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য তাঁহার অদৃষ্টে এ পদলাভ ঘটিয়া উঠে নাই।

কবির "জীবনচরিতে" এ পত্রের কোন উল্লেখ নাই। হয়ত এতদ্‌বৃত্তান্ত চরিতাখ্যায়কের অজ্ঞাত ছিল, অথবা ইহা তুচ্ছ বোধে তিনি জ্ঞাতসারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। মধুসূদনের ন্যায় কবির অমর লেখনীর একটী সামান্য রেখাপাতও প্রিয়জনের পবিত্র চিতাভস্মের ন্যায় আমাদের আদরণীয়! তাহা ছাড়া অন্য হিসাবেও ইহার আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। এই পত্রোল্লিখিত প্রার্থনা যদি মহারাজ পূরণ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত কবির সেই শোচনীয় ভাগ্য-ইতিহাস আমরা আজ পরিবর্ত্তিত দেখিতাম; এবং হয়ত,—"দাতব্য চিকিৎসালয়ে, তোমার মরণ"—এই অরুন্তুদ কবূক্তি আমাদের জাতীয় মলিনিমার চিরসাক্ষিরূপে বিরাজিত থাকিবারও অবসর পাইত না। উৎসাহ সম্পাদক।]

CALCUTTA POLICE.
27th January, 1860.

My dear Raja Sahib

I see an advertizement in the "Englishman" in which your Highness wants a magistrate. Allow me to offer my services to you. Your Highness knows that I have been for several years connected with the Calcutta Police & understand criminal matters pretty well. If the salary be worth accepting,— that is to say, if it be worthy of a Prince like your Highness to offer and a gentleman like myself to accept, pray, write to me, & I shall go up. Your Highness must know that I shall have to sacrifice my prospects here if I go up to your country, & the offer must be tempting enough to induce me to do so. I shall undertake to give you such a Police-Establishment throughout your Principality in one year, that your Highness will win the praise of the British Govt.. Your Highness must also assure me on your Princely word that I am not to be turned out at a moment's notice to gratify the hatred of some unprincipled Court-intriguer. Your Highness no doubt knows that such an important post must not be given to any but a gentleman of Education & principle, & that no gentleman of Education & principle will accept such a situation but on very liberal terms.

With kind wishes
Your Highness's

Michael M. S. Dutt.

কলিকাতা পুলিশ।

২৭শে জানুয়ারী, ১৮৬০।

প্রিয় রাজা সাহেব,

'ইংলিশম্যানে' একটা বিজ্ঞাপনে দেখিলাম মহারাজের একজ ম্যাজিষ্ট্রেট আবশ্যক। অনুমতি করিলে আমি কর্ম্মপ্রার্থী হইতে পারি। মহারাজ জানেন যে, অনেক ক'বৎসর হইতে আমি কলিকাতা পুলিশের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি, এবং ফৌজদারি কাজকর্ম্মও একরূপ বুঝি। মাহিয়ানা যদি গ্রহণ করিবার মত হয়, অর্থাৎ—তাহা যদি মহারাজের মত একজন নৃপতির প্রস্তাবোপযোগী হয় এবং আমার মত একটি ভদ্রলোকের গ্রহ যোগ্য হয়, প্রার্থনা করি, আমায় লিখিবেন, আমি যাইব। মহারাজ ইহ বিদিত থাকিবেন যে, আমি যদি আপনাদের দেশে যাই, তাহা হইলে আমা এথাকার ভাবী উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে; এবং এরূপ করিতে হইলে প্রস্তাব্য বেতন যথেষ্ট পরিমাণ লোভনীয় হওয়া প্রয়োজন। আমি এক বৎসরকাল মধ্যে আপনার রাজ্যময় এখন পুলিশ বন্দোবস্ত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিব যে, মহারাজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রশংসালাভ করিবেন। মহারাজ আপন রাজবাক্যে ইহাও নিশ্চয় করিয়া জানাইবেন যে, রাজদরবারের কোন স্থিরমতি-হীন কূটমন্ত্রীর ঘৃণা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, আমাকে মুহূর্ত্তের বিজ্ঞাপনে বিতাড়িত হইতে হইবে না। মহারাজ অবশ্য জানেন যে, এরূপ গৌরবের পদ শিক্ষিত এবং স্থিরমতি ভদ্রলোক ব্যতীত আর কাহাকেও প্রদান করা উচিত নহে; এবং মাহিয়ানা মোটা না হইলে কোন স্থিরমতি শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি এরূপ কর্ম্ম গ্রহণ করিবে না।

মহারাজের শুভানুধ্যায়ী

* * *

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

অনুরোধ।

কি চাহ বল, কি চাহ মোর সকাশে
মলিন মুখে, আসিয়া কেন দাঁড়ালে;
সখাগো বল, এসেছ আজি কি আশে
অতীতস্মৃতি কেন গো শুধু জাগালে ?

পৃথিবীমাঝে, যাছিল মোর, সকলি
দেছিনু তোমা' আছে কি তাহা, স্মরণে ?
শুকা'য়ে সবে, গিয়াছে কেন সেগুলি
জানত তুমি হয়েছে তা' কি কারণে !

তীব্রতম অগ্নিশিখা পশিয়া
সহসা হায় একদা হৃদি নিবেশে
দিয়াছে দেখ হৃদয়খানি দহিয়া
তোমারি সখা সকাশ হ'তে সে এসে !

হৃদয় মন যৌবন প্রাণ চরণে
দেছিনু তব অনেক আশা করিয়া,
ভাবিনি ওগো কখন সখে স্বপনে
দিবে যে সবি কঠিন পদে দলিয়া !

অতীত ব্যথা এখনো সখা ভুলিতে
পারিনে, তাহা রেখেছে হৃদি আগারে
দাওগো একা নয়ননীরে ভাসিতে
আসিয়া তুমি দিওনা ব্যথা বাড়ায়ে !

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ দেব।

বীতশোক।*

অবিচ্ছিন্ন শান্তি ও অখণ্ড আনন্দ সকল ধর্ম্মেরই মূল উদ্দেশ্য হইলেও, সকল ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠায় নরশোণিত সেচনের আবশ্যক হইয়াছে। বৈদিক পশুহিংসা নিবারণ উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত অহিংসামূলক বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারেও মহামূল্য মানবজীবনাহুতির আবশ্যক হইয়াছিল। বীতশোকের নির্ব্বাসন ও অপমৃত্যু তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বীতশোক, রাজচক্রবর্ত্তী বৌদ্ধ মহীপাল অশোকের কনিষ্ঠ সহোদর। বৌদ্ধগ্রন্থমতে রাজ্যেশ্বর রাজ বিন্দুসার ইঁহার পিতা এবং চম্পাপুরীনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যা সুভদ্রাঙ্গী ইঁহার মাতা। বিন্দুসার পাটলিপুত্র অধিকার করতঃ তথায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং কালে অশোক সেই স্থলে ভারতের একচ্ছত্র মহীপতি হইয়া তাহাকে সমগ্র জগতে বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের কেন্দ্রস্থানীয় করেন এবং বীতশোক বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া স্বধর্ম্মরক্ষাযজ্ঞে আপন জীবন আহুতি প্রদান করেন।

শাক্যসিংহ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইলেও তাঁহার জীবৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল বোধ হয় না। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাদি হইতে অনুমিত হয় যে, বারাণসী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম অশোকের পূর্ব্বে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারে নাই। তখনও বৌদ্ধমত আলোচনা ও তর্কের সামগ্রীমাত্র ছিল এবং খুব কমলোকেই বৌদ্ধমতানুবর্ত্তী হইয়াছিল। এই সময়ে বৌদ্ধবিরোধী ব্রাহ্মণগণ তীর্থিনামে অভিহিত হইতেন এবং বৌদ্ধমত ক্রমশঃ সমাজে সমধিক সমাদৃত হইতেছে দেখিয়া ইঁহারা বৌদ্ধমতনিরসনজন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। পরিশেষে বৌদ্ধযতিবিশেষের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া অশোক বৌদ্ধমতানুবর্ত্তী

* Dr. Rajendra Lal Mitra's Indo-Aryans নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের সারাংশ সঙ্কলিত।

হইলে, ইঁহারা আপনাদিগের বলক্ষয় উপলব্ধ করিতে পারেন এবং যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম আর অধিক প্রসারলাভ না করিতে পারে, তজ্জন্য সমবেত চেষ্টার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব পর্য্যন্ত ঘটাইতে প্রস্তুত হন।

তীর্থিগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অসারতা প্রচারে এই সময়ে বিশেষ মনোনিবেশ করেন এবং ইঁহাদের চেষ্টার ফলে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী হন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা ক্রমে সম্ভ্রান্তগণের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন এবং অবশেষে অশোকের ভ্রাতা বীতশোকের শরণাপন্ন হন।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, রাজপরিবারের সকলে বৌদ্ধমতানুবর্ত্তী হন নাই। বীতশোক তখন পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন, এবং সেই কারণেই তীর্থিকগণ বৌদ্ধধর্ম্মের আক্রমণ হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মরক্ষার জন্য বীতশোকের শরণাপন্ন হন। এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধমত খণ্ডন জন্য যেরূপ যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিতেন, তাহা বীতশোকের প্রতি তীর্থিকগণের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তীর্থিকগণ বীতশোককে বুঝাইতেছেন :—

"অস্মাকমেব সদ্ধর্ম্মমিহামুত্র শুভঙ্করং।
সর্ব্বধর্ম্মাধিকং প্রোক্তং সর্ব্বশাস্ত্রেষুতত্ত্ববিদৈঃ॥
তস্মদ্রাজন্ মহাবিজ্ঞ বিদিত্বৈব প্রমাণয়।
অস্মদ্ধর্ম্মং সমাকর্ণ্য ভজ নিত্যং সমাহিতঃ॥
তথা তে সমং নিত্যং সর্ব্বত্রাপি ভবেদ্ধ্রুবং।
সপারীংশ্চ বিনির্জ্জিত্য চক্রবর্ত্তী ভবেরপি॥
বৌদ্ধানাং ন হি সদ্ধর্ম্ম যতো মোক্ষো ন বিদ্যতে
তস্মাত্তদ্ধর্ম্মতা নৈব শ্রোতব্যা হি কথঞ্চন॥
যতস্তে মুণ্ডিতা ভ্রষ্টাঃ স্বকুলধর্ম্মনাশকাঃ।
মিথ্যাধর্ম্মাভিবাদস্তে জাতিধর্ম্মসমুজ্ঝিতাঃ॥
বেদধর্ম্ম বহির্জ্জাতা অব্রহ্মণ্যা বিচণ্ডিকাঃ।
অনাচারা অশুদ্ধাঙ্গা অশুচিত্বধারকাঃ॥
তস্মাত্ত্বে ভবতা রাজ্ঞা নৈব মান্য কদাচন।

বন্দনীয়া ন তে বৌদ্ধা দর্শনীয়া ন কেনচিৎ ॥
নাপি স্পৃশ্যা ন পূজ্যাশ্চ সম্ভাষ্যা নৈব তৈঃ সহ।
ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং ভোক্তব্যং নাপিসর্ব্বথা ॥
কিঞ্চিদপি ন দাতব্যং বুদ্ধক্ষেত্রে কথঞ্চন।
প্রমাদাদপি বুদ্ধানাং শৃণুয়ুর্ধর্ম্মমাদরাৎ ॥
শ্রোতব্যং নৈব কুত্রাপি যদি সদ্গতিমিচ্ছতি।
যদি মোহাদ্ গুণাং স্তেষাং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মং প্রমাণয়েৎ ॥
স ইহাপি পরিভ্রষ্টঃ পরত্র নরকং ব্রজেৎ।
ইতি হেতু মহারাজ মা ভজ বুদ্ধশাসনং ॥
তস্মাকং শাসনে স্থিত্বা ভজ সদ্ধর্ম্মমাদরাৎ।
এবং কৃতে পরত্রেহ সর্ব্বদাপি ফলং লভেঃ ॥"

এইরূপে মোহগ্রস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের নিন্দামাত্র দ্বারা তীর্থিগণ বীতশোকের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিরাগ সম্পাদনের চেষ্টা করেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুবর্ত্তনে ইহ ও পরলোকে অবশ্যম্ভাবী সুখসমৃদ্ধির প্রলোভন দেখান এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে থাকিলে যে রাজচক্রবর্ত্তিত্বপর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে তাহার আশামরীচিকায় তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত করেন। বীতশোক তীর্থিকগণের যুক্তির অসারতা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তীর্থিগণ পুনঃপুনঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মহিমাকীর্ত্তন করায় সম্ভবতঃ রাজত্বলাভের আশায় তিনি তীর্থিকগণের প্রলোভনজালে বিজড়িত হন।

অশোক, বীতশোকের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুরাগ ও তীর্থিকগণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু পুনঃপুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও বীতশোককে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে অশোকের জনৈক অমাত্য বীতশোকের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুরাগের মূল কারণ স্থির করিতে পারিয়া তাঁহাকে পাটলীপুত্রের রাজসিংহাসনদানে প্রলোভন দিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধমতে আনয়ন করেন। কিন্তু অশোক উক্ত বিষয়ে অমাত্যের সহিত একমত হইতে না পারিয়া সেই ভ্রাতৃদ্রোহী ও রাজত্বলোলুপ ভ্রাতার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। তখন অমাত্য এক সপ্তাহের জন্য বীতশোকের জীবনভিক্ষা করেন এবং সপ্তাহান্তে বীত-

শোক পাটলীপুত্র ত্যাগ করিয়া অশোকের বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তের আশ্রয়গ্রহ পূর্ব্বক বৌদ্ধমতে দীক্ষিত ও ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত হইয়া নানাদেশ পর্য্যটন করতঃ অবশেষে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হন।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের সমসময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব ছিল এবং তথায় বৌদ্ধগণ নানারূপে নিগৃহীত ও অপমানিত হইত। এই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের জনৈক নির্গ্রন্থাচার্য্য বৌদ্ধবিদ্বেষবশতঃ একখানি আপনার প্রতিকৃতি প্রস্তুত ও তৎপাদদেশে আসীন বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া বহুলরূপে প্রচার করেন। এই প্রতিকৃতি প্রচারের বিবরণ কর্ণগোচর হইলে অশোক ক্রোধপরবশ হইয়া এইরূপ অনুজ্ঞা দেন যে, যে কেহ উক্ত নির্গ্রন্থা-চার্য্যের মস্তক আনিয়া দিতে পারিলে, পুরস্কারলাভ করিবে। এই সময়ে জটাচীরধারী, অমুণ্ডিতশ্মশ্রু, অকর্ত্তিতনখ ভিক্ষু বীতশোক পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পর্য্যটন করিতেছিলেন, জনৈক আভীর পুরস্কারলোভে তাঁহাকে নির্গ্রন্থা-চার্য্যভ্রমে হত্যা করিয়া তাঁহার মস্তক রাজা অশোককে প্রদান করেন।

বীতশোকের বিবরণ নিতান্ত গল্পমূলক নহে। অশোকের বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তের জনৈক শিষ্যের বিরচিত অশোক-অবদান নামক গ্রন্থে এই বিবরণ আছে। বীতশোকের বিবরণ হইতে আমরা অন্ততঃ এই কয়টি ঐতিহাসিক সত্য পাইতেছি, —

(১) অহিরোধে ও শান্তিতে অহিংসামূলক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই।

(২) অশোকের সময়ে অঙ্গরাজধানী চম্পানগরী (বর্ত্তমান ভাগলপুর) বর্ত্তমান ছিল ও তথায় ব্রাহ্মণধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

(৩) অশোকের সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য বর্ত্তমান ছিল এবং তথায় ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব ছিল।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

লণ্ডনে ভারতপ্রদর্শনী।

চারি বৎসর পূর্ব্বে, এই সময়ে, লণ্ডন নগরে "ভারত প্রদর্শনী", লণ্ডন-বাসিগণের বিশেষতঃ মহিলাবৃন্দের কৌতূহল, বিস্ময় ও আনন্দ উৎপাদন করিতেছিল। ভারতীয় ব্যাপার বিদেশীয় সজ্জায় কিরূপ দেখাইয়াছিল এ প্রবন্ধে তাহারই আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

প্রদর্শনীর ভিতর Empress রঙ্গালয় সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তাহার ভিতর, ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত নয়টি দৃশ্য ছিল।

প্রথম দৃশ্য। সোমনাথ পতন—প্রকাণ্ড শিবমূর্ত্তির পূজা হইতেছে—পার্শ্বে এক সতীদাহের উদ্যোগ হইতেছে—বিধবা বালিকা আর্ত্তনাদ করিতেছে, সবলে তাহাকে চিতারোহণ করান হইতেছে। এমন সময়ে মামুদ সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইল—শত শত অশ্বারোহী সবেগে রঙ্গমঞ্চের উপর আসিয়া পড়িল! পুরোহিতেরা উৎকোচদানে মামুদকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইল; "ধর্ম্মের জন্য করিতেছি, অর্থের জন্য নহে" এই বলিয়া মামুদ সোমনাথ-মূর্ত্তি ভগ্ন করিলে তাহার ধর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ মূর্ত্তি-মধ্যস্থিত অজস্র রত্ন বহির্গত হইল!

দ্বিতীয় দৃশ্য। আক্‌বরের সভা—তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। আক্‌বরের তুলায় ওজন, সমবেত ব্যক্তিগণকে তুলাস্থিত স্বর্ণবিতরণ—মহা উৎসব—ইংরাজবণিকের আগমন—নৃত্যগীত।

তৃতীয় দৃশ্য। যমুনানদী—সুন্দর তরণীর উপর আক্‌বর; চতুর্দ্দিকে যুবতীগণ গান করিতে লাগিল, মৃদুহিল্লোলে তরণী নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইল। চতুর্দ্দিকে ভারতীয় প্রকৃতি-শোভা। আক্‌বর-জীবনে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল কি না জানি না, ইহা বোধ হয় কৃষ্ণচরিতের ছায়া।

চতুর্থ দৃশ্য। জাহাঙ্গীরের সভা—নানাদেশীয় স্ত্রীলোকের নৃত্য। এক এক দেশীয় স্ত্রীলোকগণ একরূপ সজ্জায় নৃত্য করিয়া যাইতেছে, তারপর

আর এক দেশীয় স্ত্রীলোক আর এক রূপ সজ্জায় আসিতেছে! সাজসজ্জার পারিপাট্য ও ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল।

পঞ্চম দৃশ্য। দূরে স্বর্গের দ্বার দৃষ্ট হইতেছে; শুভ্রবর্ণ মেঘপুঞ্জ ধীরে ধীরে আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে—দলে দলে স্বর্গীয় অপ্সরাকুল গান গাহিয়া যাইতেছে। অপ্সরাগণ মহামূল্য পোষাকে সজ্জিত।

ষষ্ঠ দৃশ্য। মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ সম্মুখে মোগলশিবির সন্নিবেশিত। এক অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় শিবজীর স্ত্রী ধৃত হইয়া আনীত হইল। শিবজী দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন, তুমুল সংগ্রাম হইল—মোগলেরা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল।

সপ্তম দৃশ্য। স্বর্গে অপ্সরা-নৃত্য—অতি সুন্দর ব্যাপার।

অষ্টম দৃশ্য। সমস্ত রঙ্গমঞ্চ অন্তর্হিত হইয়া, সেই স্থলে বিশাল জলরাশি উপস্থিত হইল। সম্মুখে পোর্টস্মাউথ (Portsmouth) বন্দর—অসংখ্য রণতরী। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ-দমনার্থ ইংরাজ সৈন্য ভারতে প্রেরিত হইতেছে। দলে দলে সৈন্যগণ আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জাহাজে উঠিতে লাগিল। জাহাজ চলিতে লাগিল, সৈন্যগন জাতীয় সঙ্গীত করিতে লাগিল।

নবম দৃশ্য। লাহোর দরবার—রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের মহারাণী হইয়াছেন ঘোষিত হইল; দলে দলে অশ্ব গজ উষ্ট্র রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইল। বিবিধ সাজসজ্জা নৃত্যগীত। যবনিকা পতন।

এই সকল দৃশ্য দেখিয়া ভারতের ঐশ্বর্য্য কিরূপ অতুল তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এ সব ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, ইংরাজদিগের দেখাইবার প্রণালী দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হইত। ১২০০ লোক একত্রে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিত, ইহাদ্বারা রঙ্গালয়টি কিরূপ প্রকাণ্ড তাহার অনায়াসে উপলব্ধি হয়। নানারূপ আলোকচ্ছটায় ও পট-পরিবর্ত্তনের সুন্দর নিয়মে সমস্ত দৃশ্যই অতি চমৎকার দেখাইত।

এই রঙ্গালয়, প্রদর্শনীর সামান্য অংশমাত্র অধিকার করিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে ভারতীয় যাবতীয় কার্য্যকলাপ প্রদর্শিত হইতেছিল। বহুব্যয়ে এদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী লোক আনীত হইয়াছিল! দোকানপাট

সমস্তই এ দেশীয় রূপে সজ্জিত—চাঁদনীচকের চিত্রটি মন্দ হয় নাই। ইহা ব্যতীত কোথাও কুম্ভকার মৃত্তিকাবাসন নির্ম্মাণ করিতেছিল, কোথাও তন্তুবায় বস্ত্রবুনন করিতেছিল, কোথাও দেশীয় মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছিল, কোথাও বা হুঁকা বাঁধাই, জুতা সেলাই প্রভৃতি চলিতেছিল। একদিকে স্বর্ণকার মৃত্তিকা প্রদীপশিখায় অনন্ত গঠন দেখাইতেছিল, অন্যদিকে কর্ম্মকার লৌহ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছিল! দোকানগুলি সমস্তই যতদূর সম্ভব এ দেশের মত গঠিত—এ দেশের বাজারও যথাসম্ভব প্রদর্শিত হইয়াছিল। এ সব দেখিয়া যে লণ্ডনবাসীরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ভারতীয় শিল্প, কারুকার্য্য, পুত্তলিকা প্রভৃতি ইংরাজ মহিলারা বিক্রয় করিতেছিলেন। বোধ হয় সে বৎসর লণ্ডনে প্রতিগৃহেই ভারতীয় দ্রব্য শোভা পাইয়াছিল।

ভারতীয় ব্যাপারের সহিত ইংরাজী আমোদ মিশ্রিত করিয়া প্রদর্শনীটি আরও আকর্ষক করিয়া তোলা হইয়াছিল। কোথাও ক্ষুদ্র হ্রদে বৈদ্যুতিক তরীগুলি দর্শকগণকে আহ্বান করিতেছে; কোথাও Switchback রেলে চাঞ্চল্যলহরী উত্থিত হইতেছে। একপার্শ্বে বেলুন যোগে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিবার সুবিধা ছিল, অপরপার্শ্বে ৩০০ ফিট উচ্চ উপবেশিকা-সংলিত চক্র ঘুরিতেছিল! ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে রম্যকানন, নয়নপ্রীতিকর প্রস্রবণ। দিবা রাত্র নানাবিধ বাজনা বাজিতেছিল—ভারতীয় নহবৎ ঢাকঢোলকেরও অভাব ছিল না। ফনোগ্রাফ, ইলেক্ট্রোফন, প্রভৃতি আরও কত পার্শ্বদৃশ্য দর্শকগণের সময় ও অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিল।

প্রদর্শনীর ভিতর আর একটি আমোদজনক ব্যাপার—নানাবিধ জন্তু-আরোহণ। হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ প্রভৃতি আরোহী লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ইহা ব্যতীত পানাহারের জন্য আয়োজন চতুর্দ্দিকেই। ইংরাজী খাদ্যের তো কথাই নাই। এ দেশীয় সর্ব্ববিধ খাদ্যও মিলিত।

রাত্রিকালে প্রদর্শনী আরও সুন্দর দেখাইত। তখন ভারতীয় ধরণে নানারূপ নানাবর্ণের দীপাবলি চতুর্দ্দিকে শোভা পাইত, সে সময় বিশেষতঃ সুন্দর রজনী হইলে এ স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত।

প্রদর্শনীর উপকারিতা লণ্ডনবাসীরা বিশেষরূপ অবগত আছে। এইজন্য

এখানে বৎসর বৎসর কোন না কোন প্রদর্শনী দর্শিত হয়। এ বৎসর, "স্ত্রীলোক-প্রদর্শনী", হইতেছে—এ জগতে প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকেরা যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় স্ত্রীলোক দেশীয় সজ্জায় স্বদেশীয় রীতিনীতি দেখাইতেছেন; প্রদর্শনীর ভিতরও সকল কার্য্য স্ত্রীলোকেরা করিতেছেন।

গত বৎসর "আফ্রিকা প্রদর্শনী" হইয়াছিল, আফ্রিকা হইতে নানাবিধ অসভ্য জাতি আনীত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, কিরূপে জুলুযুদ্ধে ইংরাজেরা জয়লাভ করিয়াছিল তাহার অভিনয়ও হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই এক ইংরাজ রমণী, আনীত আফ্রিকাবাসী একজনের প্রেমে পতিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। ইহা লইয়া সে বৎসর লণ্ডনে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল।

ইহার পূর্ব্ব বৎসর রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা সকলকে দেখান হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া যখন প্রথম সিংহাসনারোহণ করেন তখন কোন্ শিল্প কিরূপ ছিল এবং এখন তাহা কিরূপ হইয়াছে তাহার তুলনা প্রদর্শনীতে দর্শনীয়। আর এক পার্শ্বে 'জলযুদ্ধ' বলিয়া এক সুন্দর ব্যাপার প্রদর্শিত হইতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী উপস্থিত হইল—দুই পক্ষে প্রবল সংগ্রাম হইল—স্থলস্থিত দুর্গ কামানদ্বারা অন্তর্হিত হইল; শেষে পরাজিত শত্রু সন্ধি স্থাপন করিল।

এ প্রবন্ধে অন্য বৎসরের প্রদর্শনীর বিস্তৃত বিবরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। তবে পরিশেষে এইমাত্র বলি, প্যারিস চিকাগো প্রভৃতি নগরে বহুকাল অন্তর, একবার করিয়া প্রদর্শনী হয়, লণ্ডনে প্রতি বৎসর কোন না কোনও প্রদর্শনী সকলকে আনন্দিত করে, আর তাহার সুফল লণ্ডনবাসীরাই উপভোগ করে।

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ দেব।

স্ত্রীকবি-কুঞ্জ।

নির্ঝরের আত্ম-সমর্পণ।

পর্ব্বতের শিখর হইতে,
বহুদূর শিলাময় পথে,
ছুটে এসে, নির্ঝরিণী এক
ঝাঁপায়ে পড়িল হ্রদস্রোতে।
কোন দিকে আর চাহিল না,
কারে কিছু কথা কহিল না,
ভাবিল না দুদণ্ড দাঁড়ায়ে,
একেবারে পড়িল ঝাঁপায়ে!

অতিদূর পর্ব্বত-শিখরে,
কোন্ অন্ধকার গুহা-কোলে,
আঁধারের স্নেহের ছায়ায়,
নির্ঝরিণী ছিল শিশুকালে।
দিন যত যায়, দিনে দিনে,
কি যে চিন্তা ওঠে তার মনে,
একা একা কুলু কুলু স্বরে;
গান গাহে কারে মনে করে,
ভাল নাহি লাগে আর গুহা,
না জানি সে যেতে চায় কোথা
কে বুঝিবে নির্ঝরের ভাষা!
কে বুঝিবে তার মর্ম্ম ব্যথা!

যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে,
নির্ঝরিণী ছুটে চলে আসে,
কোথা' শিলা বাধা দেয় পথে,

ভ্রূক্ষেপ নাহি তার তা'তে;
অনন্তের অজানা পথেতে,
ক্ষুদ্রপ্রাণা একা নির্ঝরিণী,
কোথা যেতে চায় নাহি জানি।

পর্ব্বতের শিখর হইতে,
ছুটে এসে শিলাময় পথে,
ক্ষীণস্রোতা নির্ঝরিণী এক
ঝাঁপায়ে পড়িল হ্রদস্রোতে।
চাহি দেখিল না আগুপিছু,
একবার ভাবিল না কিছু,
দূর হ'তে ছুটিয়া আসিয়ে,
একেবারে পড়িল ঝাঁপায়ে।
যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাস,
যৌবনের মধু ভালবাসা,
যৌবনের গভীর আকাঙ্ক্ষা,
যৌবনের সুখ, দুঃখ, আশা,
সকলই মিশাইল আজি,
হ্রদস্রোতে ঢালি তনুখানি,
সরলা সে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী।

শ্রীসরলাবালা দাসী।

আকুল আহ্বান।

তুমি কোথায় এখন ?
লইয়া তৃষিত আঁখি,
আমি পথ চেয়ে থাকি,
চেয়ে থাকে কমলিনী দীনেশে যেমন !

উৎসাহ।

ডেকে ডেকে হই সারা
তবুও না পাই সাড়া,
কেমনে নিঠুর বল হইলে এমন!

নিতি যে তখন হায়,
না ডাকিতে একবার,
দেখা দিতে শতবার,
আজ এত অপরাধ কি করেছি পায়?
তত স্নেহ ভুলে কেন,
নিঠুর হইলে হেন,
এ দারুণ নিঠুরতা সাজে কি তোমার?

জাগিছ গো হিয়ামাঝ,
তোমারি মূরতি দিবা,
পরিপূর্ণ মোর হিয়া,
তবে গো নয়ন জল কেন ঝরে আজ!
সেথাকার রবি শশী
দূর করে তব মসী;
[illegible] এখানে হাসে পরি নব সাজ —

সেও তব পাশে ধায়,
ঢালিয়া সোনালী ছটা,
বাড়ায় সুষমাঘটা,
কোমল পরশে তার তোমারে জাগায়;
এই বায়ু স্নেহভরে,
যায় গো তোমার ঘরে,
মৃদুল বীজন করি তোমারে জুড়ায়।

তবে কেন এতদূর,
কেন নাহি ফিরে চাও,

ডাকিলে না সাড়া দাও
অথবা পশে না তথা মোর কণ্ঠস্বর
কি'বা তুমি দেব-পারা,
আমি নর আত্মহারা,
টলে না নরের ডাকে দেবহৃদি-পুর!

যদি তোমারে এখন,
বারেক ডাকিতে আর,
নাহি মোর অধিকার,
কোন্ মন্ত্র জপি তবে বহিব জীবন?
ও নাম "প্রণব" মোর,
আমি তব ধ্যানে ভোর,
তুমি যে গো ইষ্টদেব মানস-মোহন!

কে বলিল দেবতায়,
নরের ডাকিতে নাই,
তাও কি গো হয়—ছাই
দেবতার নাম জপি নর সিদ্ধি পায়।
তবে কেন ডাকিব না,
কেন মুখ স্মরিব না,
কেন পদ ভাসাব না নয়ন-ধারায়?

এই বুঝে মোর মন,
দেবহৃদি দয়া-ভরা,
না ডাকিতে দেয় ধরা,
তাই ত তোমারে আমি ডাকি অনুখণ।
পার্থিব বাসনা নাই,
প্রেমসিদ্ধ হ'তে চাই—
ও চরণে মিশাইতে চাহি এ জীবন।

তাই নিতি করি আবাহন,
বেশী নয় একবার,
দিবে কি দর্শন আর,
প্রীতির কুসুমে আমি করিব পূজন!
বারেক দেখিতে চাই
দেখাবে কি বল তাই,
বড় সাধ সিদ্ধ হব হেরে সে চরণ।

শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তফী।

বাল্য-স্মৃতি।

পেরেছ মুছিতে, সখি, বাল্য-ইতিহাস
নিয়তির চঞ্চল আঁচলে?
আমি দেখি সব আছে তুমি শুধু নাই কাছে,
দূরে, বহু দূরে গেছ চলে;
খুঁজে মরি মিছে হৃদি-তলে!

পড়ে আছে সোহাগের সোণার পিঞ্জর,
ছিন্ন ভিন্ন মায়ার শিকল;
ছাড়ায়ে বাঁধন-ডোর নির্দয় পরাণ-চোর,
উড়ে গেছে মোহি' নভস্থল
সেই এক পক্ষিণী পাগল!

হাসে না শারদ-শশী উদার গগনে,
ম্লান আজি কোটি কোটি তারা,
বাতাস হুতাস ভরে কি ব্যথা প্রচার করে?
দোয়েলা কোয়েলা কেঁদে সারা;
তার মাঝে আমি আত্মহারা!

কাণে আসে অতীতের উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস

গদগদ আঁখি জল-সনে;
হায় রে! এমনি রাতে এক সাথে হাতে হাতে
বেড়াতাম দুটিতে কাননে,
সুকুমার কুমারী-জীবনে!

প্রভাতে প্রত্যহ দোঁহে যেতাম বাগানে,
ফিরিতাম ভরি' দুটি ডালা;
আধ-ফুট' চাঁপা তুলে পরিতাম এলো চুলে;
মনে পড়ে মনে পড়ে, বালা,
দু'টি সদ্য সেফালির মালা?

কবে কোন্ বন্যা আসি লইল ডাকিয়া,
চলিলাম ভেসে নিরুদ্দেশে;
কল কল টল মল ছুটিল তরঙ্গ-দল;
যাত্রাপথ ফুরাল নিমেষে;
উতরিনু অতি দূর দেশে।

তুমি ত পেয়েছ শান্তি সাঁতারি' পাথার,
আছ সুখস্বপনে মগন!
বসন্তের ছায়াতলে যৌবনের মায়া-বলে
গড়িয়াছ নূতন জীবন;
ত্যজিয়াছ জীর্ণ পুরাতন।

ভোলা ভালো। ভয় নাই! তুলিব না কথা,
খেদ-গীত আর শুনাব না!
এই মুছিলাম আঁখি অতীত রাখিব ঢাকি,
কোথা যদি থাকে এক কণা
মুগ্ধধারে করিও মার্জ্জনা।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

প্রায়শ্চিত্ত।

বৈকালে বন্ধু অতুলচন্দ্রের ভৃত্য একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি এই:—

"শিশির,

ডাক্তারের আদেশ মত অদ্যকার রাত্রের ট্রেণেই আমি বৈদ্যনাথ রওয়ানা হইব। যাইবার সময় তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। কে জানে, হয়ত এই সাক্ষাতই শেষ সাক্ষাৎ! দুরন্ত ক্ষয়কাশ প্রতি পলে আমাকে মরণের দ্বারে টানিয়া আনিতেছে। তোমার রহস্যময় সন্তপ্ত জীবনের কোন কথাই আমার নিকট গোপন রাখ নাই। কিন্তু তুমি প্রত্যহ কেন যে তোমার দক্ষিণ পদ ক্ষত করিয়া রক্ত ক্ষরণ কর,—শত প্রশ্ন করিয়াও কোন দিন ইহার উত্তর পাই নাই! আজ এই কথাটী না শুনিয়া আমি ছাড়িব না। আশা করি, এই মুমূর্ষু বন্ধুর অন্তিম প্রার্থনাটি অরক্ষণীয় রহিবে না। ইতি

তোমার

অতুল।"

* * * * *

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অতুলের গাড়ী আসিয়া পহুঁছিল। প্রাণাধিক প্রিয়তমের শীর্ণ বাহু দুইখানি ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলাম। তাহার মরণছায়াক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। হায়, হায়, কাহার কাছে গোপন করিতেছি? মুমূর্ষুর কাছে আবার লজ্জা কি? শুন ভাই,—তুচ্ছ জীবনের তুচ্ছ কথা শুন;——

"তখন আমরা ছেলে মানুষ। মনে আছে?—তখন এক দণ্ড তোমাদের বাড়ী ছাড়া হইতাম না; এক দণ্ড তোমাকে না দেখিলে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত! সেই ছেঁড়া কাপড়ের বল, আর কেরাশিন তক্তার ব্যাট্ আমাদের কত প্রিয় ছিল! তোমাদের ক্ষুদ্র আঙ্গিনাখানি আমাদের খেলিবার 'মাঠ' হইত। তোমার ভগিনী রমা ছাদের উপর বসিয়া থাকিত; যদি দৈবাৎ আমাদের বল ছাদে গিয়া পড়িত,—রমা তাহা নীচে ফেলিয়া দিত। খেলা শেষ হইলে তোমার মা খাবার দিতেন। তোমরা ব্রাহ্মণ, আমি ব্রাহ্মণে-

তর—কিন্তু তা' বলিয়া তিনি কোন দিন আমাদের দুটিকে ভিন্ন মনে করিতেন না। আমরা দুটি ভায়ের মত পরস্পরের হাত হইতে খাবার কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতাম। এক সঙ্গে পড়া, এক সঙ্গে স্নান—মনে আছে?

যাক্—যাহা শুনিতে আসিয়াছ, তাহাই বলি। আমি রমাকে ভালবাসিয়াছিলাম! শুধু আমি নয়—রমাও বুঝি আমায় ভালবাসিত! আমার অপেক্ষাকৃত বয়স হইয়াছিল, জ্ঞান হইয়াছিল,—দেশ-সমাজ বুঝিতে পারিতাম! কাজেই আমার ভালবাসার মধ্যে কখনও কোন দিন কোনরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করি নাই। শুধু রমার কল্যাণের জন্য সমগ্র হৃদয়ের নীরব প্রার্থনা বিধাতার চরণে জ্ঞাপন করাই আমার এই ব্যর্থ জীবনের একমাত্র সুখ বলিয়া মনে করিতে তখন হইতেই আমি অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু হায়, সরলা বালিকা রমা যে একাগ্র দুরাশায় আপনার ক্ষুদ্র বক্ষ ভরিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ফলে, আজিও হয়ত সে তাহার অসংযত হৃদয়কে সম্পূর্ণ রূপে শান্ত করিয়া ভুলিবার অবসর পায় নাই।

একবার পূজার পর তোমাদের বাড়ী বিজয়ার প্রণাম করিতে গিয়াছি। মা, বাবা, দাদা—সকলকেই প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলাম; নিকটে রমা দাড়াইয়াছিল,—রমাকে একটা প্রণাম করিবার বড় ইচ্ছা হইল! বয়সে ছোট বলিয়া কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল! অথবা ঠিক তা'ও নয়—বুঝিবা মনে হইয়াছিল—"দেবি, তোমার আমি পদধূলি লইবারও নিতান্ত অযোগ্য!" কিন্তু সেই ক্ষুদ্র রাঙ্গা পা' দুখানিতে করস্পর্শসুখ লাভ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না; ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া দুই হাতে রমার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া নিজকে কৃতার্থন্মন্য মনে করিলাম! রমা "ও কি করেন—" বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সেই হইতে আমার প্রতি রমার কেমন একটা মধুর আক্রোশ জন্মিল। আমার এই আচরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য সে সর্ব্বদা সুযোগ অন্বেষণ করিয়া ফিরিত। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, রমা আমার পায়ে হাত দিয়া তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে চায়। সে কাছে আসিলেই আমি সাবধান হইয়া বসিতাম,—যাহাতে পায়ে হাত দিবার সুবিধা না পায়!

একদিন তোমাদের বৈঠকখানায় একা বসিয়া আছি। তুমি কি যেন

একটা কাজে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিলে। সন্ধ্যা হইয়াছিল, ঘরে তখনও আলো পড়ে নাই। আমি অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা করিতেছিলাম; হঠাৎ আমার পায়ে যেন কার হাত ঠেকিল। তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখি—রমা হাসিয়া পলাইয়া যাইতেছে!

রমা বাজী জিতিয়া গেল মনে করিয়া আমি একটু দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। কিন্তু পাল্টা গাহিবার জন্য আমিও সচেষ্ট রহিলাম।

তোমার বোধ হয় মনে আছে সে সময় আমি হাতে খুব লম্বা লম্বা নখ রাখিতাম; তোমরা আমাকে শ্লেষ করিয়া জন্তুবিশেষের নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে! তোমাদেরও বিশেষ অপরাধ দেখি না—সে নখ যেমন লম্বা, তেমনি ধারাল ছিল। একদিন দুপুরে রমা স্নান করিয়া বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়া চুল শুকাইতেছিল; তাহার মুখ ঘরের দিকে—সুতরাং সম্মুখে নজর পড়িবার কোন সম্ভাবনা ছিল না! আমি কম্পিত বক্ষে, ধীর পাদক্ষেপে অলিন্দার নীচে গিয়া দাড়াইলাম। রেলিংএর ক্ষুদ্র ফাঁকের মধ্যে হাত গলাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি যেমন রমার পায়ে হাত দিতে গিয়াছি—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রমাও চমকিয়া উঠিয়া পা টানিয়া লইবার উদ্যোগ করিয়াছে। আমার দীর্ঘনখর করপুটের সংঘর্ষণে রমার দক্ষিণ চরণখানি বহিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরিয়া পড়িল! রমা হাসিতে লাগিল;—এমন জয়লাভ বুঝি তাহার কখনও হয় নাই! তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত আমার আর কোন উপায় রহিল না!

জানি না, আমার এ কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কি! রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত—তাই সেই দিন হইতে প্রত্যহ আমি আমার দক্ষিণ পা হইতে রক্ত ক্ষরণ করি। এ যেন আমার একটা নেশা; যতক্ষণ রক্তপাত না করি, ততক্ষণ অন্তরের মধ্যে আমি কি যে গভীর অশান্তিময় যাতনা অনুভব করি, তাহা বলিতে পারি না।—দুই বিন্দু লোহিত শোণিত দেখিতে পাইলেই সে অশান্তির যেন কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। ভাই, দুর্ব্বলহৃদয় সুহৃদকে মার্জ্জনা করিও। এত দিন যাহা গোপন ছিল আজ তাহা— —"

মোহাবেশে আরও কি বলিতে যাইতে ছিলাম; হঠাৎ বাহিরে গাড়ী চলিয়া যাইবার ঘর্ঘর শব্দে চেতনা হইল—চাহিয়া দেখি, ঘরে অতুলচন্দ্র নাই।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

সাহিত্য।

(আশ্বিন, ১৩০৭)

মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় 'সাহিত্য' যেরূপ সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করিয়া সবলে সম্মার্জ্জনী চালনা করেন, লেখকবর্গের পক্ষে অনেক সময়ে তাহাতে বিলক্ষণ গাত্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে। ইহাতে 'সাহিত্যের' পদোচিত গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইবার কথা। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সুলেখক বলিয়া একদিন 'সাহিত্য' তাঁহার প্রবন্ধ পত্রস্থ করিতে ব্যস্ত ছিলেন; এখন পূর্ব্বপরিচিতের সহিত এরূপ ব্যবহার কেন? কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র বিলাতে গিয়াছেন; যাত্রাকালে কবি যে 'বিদায় মঙ্গল' গান করেন, তাহা একাধিক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া মনে হইতেছে, খ্যাতনামা লেখকের লেখা কুড়াইতে সম্পাদকগণ গলদ্‌ঘর্ম্ম। পিতৃস্নেহের হিসাবে 'বিদায় মঙ্গল' সুন্দর হইলেও কবিতার হিসাবে প্রকাশিত হইবার যোগ্য কিনা, তাহাতে মতভেদ আছে। এবার 'কমলে কামিনীর' সমালোচনা শেষ হইয়াছে; ইংরাজীর বুকনী ও তুলনা ছাড়া বাঙ্গালার কাব্য সমালোচনা বিরল! আলোকের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এখনও শেষ হয় নাই। 'বৌদ্ধযুগ' শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্পাদকীয় টিপ্পনী সংযুক্ত করিয়া লেখককে ফেরত দিলেই ভাল হইত। 'পরিচয়' নামক ছোট গল্প "আগা গোড়া মানানসই" হয় নাই।

ভারতী।

(ভাদ্র, ১৩০৭)

কয়েক মাস হইতে 'ভারতীর' আবরণখানি শাটীর ন্যায় মনোজ্ঞবেশ ধারণ করিয়াছে; তাহাতে পদ্ম ফুটিয়াছে, বীণা বাজিতেছে, বর্ণচ্ছটা ছুটিতেছে; কিন্তু লেখনীর সন্ধান নাই, দেবীও অবগুণ্ঠনবতী! একটী পদ্মের কিয়দংশ লাল, কিয়দংশ শাদা তাহা বোধ হয় কল্পনার প্রতিকৃতি। তুলসীদাসকৃত রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড হইতে 'কবির চান্দ্রবিজ্ঞান' বিষয়ক যে কবিতা অনূদিত

হইয়াছে, তাহা মূলের ন্যায় শ্রুতিমধুর হয় নাই। "হিন্দু ছেলের সাহেব বনা" প্রবন্ধে বিলাত ফেরতের পক্ষের কৈফিয়ৎ ছাপা হইয়াছে। সমাজের দোষেই যে 'ঘরের ছেলে পর' হইতেছে---ইহাই মূল কথা বলিয়া বোধ হইল। সমাজ ইহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারিবেন না; কিন্তু 'সাহেব বনার' জন্য 'হিন্দু ছেলের' যে নিতান্ত আগ্রহ আছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্---উভয়পক্ষের পক্ষেই এই ঋষিবাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্রদীপ।

(আশ্বিন, ১৩০৭)

কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় সম্পাদকহীন মাসিকপত্র বন্যাতাড়িত জলস্রোতের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার অঙ্গে যে বর্ষাবাহিত আবর্জ্জনারাশি মিলিত হইবে না, তাহা সম্ভব নহে। তথাপি 'সাহিত্য' যতটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়াছেন, 'প্রদীপ' তত নগণ্য পত্র বলিয়া পরিচিত নহে। 'কবির প্রতি কবিপ্রিয়া' কবিতাটি সুখপাঠ্য হইলেও সম্পাদকহীন পত্রিকারই উপযোগী, সম্পাদক থাকিলে ইহাকে প্রকাশিত করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। এই কবিতা মহিলা-লিখিত, ইহার ভাবভঙ্গী ভাল নহে। কবিতায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে রসাভাসের গন্ধ ছুটিয়াছে! 'কাব্য ও কবিত্ব' একটি সুলিখিত প্রবন্ধ, কিন্তু শিরোনামের যোগ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। 'প্রদীপ' বঙ্গসাহিত্যে ভাল কাগজ, ভাল ছাপা, ভাল ছবির আমদানী করিয়াছে, তাহার সঙ্গে ভাল লেখা সংযুক্ত হওয়া প্রার্থনীয়। লেখার বাছনি করিতে পারেন এমন একজন সম্পাদক কি জুটিয়া উঠিবে না?

দেব-দর্শন।

চলে তরী গঙ্গাবক্ষে, পাণ্ডা কাছে আসি'
কহিল আমারে ডাকি, "হের ওই কাশী।"
অপরাহ্নে দূরস্থিত দেউল মন্দির
মনে হ'ল যেন শত বিহার-শিবির
ভূ-প্রবাসী দেবতার; বাঁধাঘাট যত
নীরবে অষ্টাঙ্গ যেন করি অবনত
পাবনী জাহ্নবী-পদে পড়েছে লুটায়ে।
গদ গদ কুলুস্বরে, মৃদু মিষ্ট বায়ে
পুলক বিহ্বল প্রাণ বন্দিল তখন
দেবতা না সৌন্দর্য্যেরে, নাহি তা স্মরণ।
পশ্চিমের সূর্য্য যবে বসিবেন পাটে
নামহীন জনহীন স্তব্ধ শান্ত ঘাটে
ভিড়িল অস্থির তরী। সেই ঘাটে বসি
দেখিনু বিধবা-মূর্ত্তি ষোড়শী রূপসী,
পরি শুভ্র শুক্লবেশ স্নাত শুদ্ধ মন
কাষ্ঠের পাদুকা-পদে করিলা অর্পণ
আহরিত-পুষ্পাঞ্জলি। চুমি সকাতরে
পতির পাদুকা দুটি তুলি বক্ষোপরে
চলি গেলা যেন এক ত্রিদিবের ছবি;
নিঃশ্বসিল মুগ্ধ বায়ু, কাঁদিল জাহ্নবী।
সহসা উঠিল বাজি জাহ্নবীর কূলে
মধুর আরতি-শঙ্খ দেউলে দেউলে;

ঝলসিল শূন্যে শূন্যে স্বর্গ-রশ্মিজালা,
উঠিল জ্বলিয়া নীচে শত দীপমালা।
চমকি চাহিল পাণ্ডা, কহে মোরে ধীরে,—
"এই বেলা চল বাবু মহেশ-মন্দিরে
বিশ্বেশ্বর সন্দর্শনে।" অকস্মাৎ রবি
কহিনু তাহারে,—যাও যেথা তব খুসি,
দেবতা সাক্ষাৎ আমি পাইনু এখানে,
আর কোথা যেতে বল দেবের সন্ধানে?

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

গুজব।

বঙ্গসাহিত্যের মহারথিবর্গের মধ্যে অনেকেই গল্প-রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। এতকাল গল্প ও গুজব এক সঙ্গে লালিত পালিত হইয়া আসিয়াছে; এখন গল্পের আদর অধিক; সুতরাং গুজব কেবল একাকী পথে ঘাটে ঘুরিয়া ফিরিয়া গলগ্রহ হইতেছে; তাহার জন্য সাহিত্য-সভায় ঠাঁই নাই।

গল্প ও গুজব এক পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও এক পদার্থ নহে; উভয়ের মধ্যে বহু বিষয়ে পার্থক্য আছে। তদনুসারে গল্পের ন্যায় গুজবও সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে।

গল্প ব্যক্তিবিশেষের রচা কথা; কল্পনাক্ষেত্রের স্নেহপালিত ললিতলতা। গুজব বহুক্ষেত্রনিঃসৃত বর্ষাবিপুলীকৃত জলস্রোতের মত নিয়ত নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত,—যত সম্মুখে অগ্রসর, ততই আবিলতাময়।

গল্পের আদিঅন্ত সীমাবদ্ধ। গুজব অনাদি, অনন্ত। তাহার উৎপত্তি ও পরিণতি কোথায়, অনেক সময়ে তাহা চেষ্টা করিয়াও আবিষ্কার করিবার উপায় থাকে না।

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সম্ভব হউক, বা অসম্ভব হউক, গল্প চিরদিনই গল্প বলিয়া পরিচিত। নিতান্ত বালকবালিকা ভিন্ন কেহ তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না। লেখক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া "সত্য ঘটনা" বলিয়া গল্পের মস্তকে প্রশংসাপত্র বাঁধিয়া দিলেও নিস্তার নাই; লোকে তাহাকে আরও উচ্চশ্রেণীর গল্প বলিয়া ধরিয়া লয়! গুজব সত্য কি মিথ্যা, সম্ভব কি অসম্ভব, কেহ তাহার বিচার করিতে ব্যস্ত হয় না; বরং গুজব যত অসম্ভব হয়, ততই তাহা বিশ্বাসের পাত্র হইয়া দাঁড়ায়!

যাঁহারা গল্পে অবিশ্বাসী, তাঁহারাও গুজবকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। কারণ, গল্প গল্পের পোষাকে কল্পনার মুকুট পরিয়া অগ্রসর হয়; গুজব নিতান্ত পরমাত্মীয়ের মত সত্যের গন্ধ মাখিয়া দর্শন দান করে!

গল্প দুদিনে পুরাতন হইয়া পড়ে, লোকে তখন তাহাকে বাসি ফুলের মত সহজেই আবর্জ্জনারাশির সহিত রাজপথে ফেলিয়া দিতে পারে। কিন্তু

গুজব পুরাতন হইতে জানে না।

গল্প একবার শুনিলেই শুনিবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। গুজব শুনিয়া শুনিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া উঠে। যে দূরে থাকে, সে নিকটে ঘেঁসিয়া বসে; যে অন্যমনস্ক থাকে, সে উৎকর্ণ হয়!

কোন গল্প সরস, কোন গল্প নিতান্ত নীরস; কোন কোন গল্প বিলক্ষণ নিদ্রাকর্ষণও করিয়া থাকে! গুজব নীরস হইতে জানে না; নিদ্রাকর্ষণ করা দূরে থাকুক, বরং শ্রবণলালসায় মরা মানুষও জাগিয়া উঠিতে পারে।

গল্পের সমালোচনা চলে; গুজবের আবার সমালোচনা কি? গল্প নিতান্ত বাহিরের বস্তু; সে হৃদয়পটে কোন রূপ রেখাঙ্কন করিতে পারে না। গুজব সেখানে প্রবেশ করে, গভীর রেখায় আত্মপ্রভাব খোদিত করিয়া চলিয়া যায়!

গুজব দেশভেদে ও কালভেদে বহুধা-বিভক্ত,—সমাজভেদেও গুজবের আকৃতিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মূল প্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান। গুজবের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে, তাহার শক্তির সীমানির্ণয় করাও অসম্ভব। অনেক সময়ে সত্য ঘটনা অপেক্ষা গুজবেই মানবসমাজ অধিক উন্মত্ততা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাতে রাজ্য ও রাজপাট ভাসিয়া যায়, রাজমুকুট স্কন্ধচ্যুত হয়, বসুন্ধরা রুধিরস্রোতে প্লাবিত হইয়া পড়ে!! গুজব তাণ্ডবনৃত্যে মত্ত হইয়া "অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া" বিস্তার করিয়া লোহাকে সোনা ও সোনাকে লোহা বলিয়া লোকসমাজে চালাইয়া দিতে পারে। গুজবের কল্যাণে কত সুপণ্ডিত মূর্খ ও কত হস্তিমূর্খও মহামহোপাধ্যায় বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছে।

গুজব কালভেদে দ্বিধা-বিভক্ত —আধুনিক ও বনিয়াদী। গুজব দেশ-ভেদেও দ্বিধা-বিভক্ত,—দেশী এবং বিলাতী। গুজব একাল ও সেকাল, এদেশ ও সেদেশ ব্যাপিয়া সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের ইতিহাসেই আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছে!

গল্পে কেহই আত্মহারা হয় না; গুজবে সকলেই আত্মহারা হইয়া পড়ে। এইরূপে আত্মহারা হইয়া কত লোকে আত্মহত্যা, পরহত্যা প্রভৃতি মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যানির্ণয় করিবে? গুজব কাণে কাণে

গুঞ্জিত;—যত অস্ফুট, যত অব্যক্ত, যত অযুক্ত, ততই বিক্রমশালী। এই যে গল্প-লেখক সাহিত্য-সেবকগণ—ইঁহারাও গুজবে বাড়িয়া উঠিতেছেন, গুজবে বসিয়া পড়িতেছেন। গুজব ভাল হইল ত সংস্করণের পর সংস্করণ,—অসংখ্য গ্রন্থ-অল্প সময়ে বিকাইয়া গেল; গুজব ফুটিল না, বা কুটিলপথে ধাবিত হইল ত প্রথম সংস্করণের খানকত কেতাব, তাহাও পুরাতন কাগজের দরে বেণেপটীতে মসলাবাঁধা কাগজের প্রয়োজনে বিক্রয় করিতে হইল! গুজবে সক্রেতিস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত; গুজবে গ্যালিলিও কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত; গুজবে কলম্বস উন্মাদ বলিয়া উপেক্ষিত; গুজবে ভণ্ডশঠ প্রবঞ্চকদল মানব-সমাজের অকৃত্রিম সুহৃৎ বলিয়া সম্মানিত!

দেশী অপেক্ষা বিলাতী জিনিস ভাল,—ইহা একটি এদেশের আধুনিক গুজব। দেশের লোকে দেশী জিনিস ছাড়িয়া বিলাতী জিনিসের জন্য পাগল হইয়াছে,—রাজা রাজড়া বিলাতী দোকানে নাম লিখাইয়া ধারে বিলাতী জিনিস কিনিয়া বাড়ীর বনিয়াদী দেশী জিনিসগুলি আবর্জ্জনার ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিতেছে! একজোড়া দেশী শালে সাত পুরুষের শীত কাটিত, অসময়ে বাঁধা রাখিলে দশ টাকা ধার পাওয়া যাইত, দায়ে ঠেকিয়া বিক্রয় করিতে হইলেও দায় উদ্ধার হইত। বিলাতী চাদর এক ধোপে বিবর্ণ হইয়া যায়, এক শীত না ফুরাইতেই আর একখানির জন্য বাজারে বাহির হইতে হয়। বিলাতী আলোক-ঝলকে পলক ফেলিতে দেয় না, অনিমেষ লোচনে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু অসাবধান ভৃত্যকরে দণ্ডে দশবার খণ্ড খণ্ড হয়, তীব্রতেজে চক্ষুরত্ন অল্প দিনের মধ্যেই চস্‌মা-শোভিত বার্দ্ধক্যবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হয়! পিলসুজ প্রদীপ পিতামহের শাস্ত্রালোচনার সহায়তা করিয়াছিল,—এখন অনাদরে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, সন্ধান লইবার উপায় নাই! এক ঘটীর যত কাজ চলিতে পারে, না হারাইলে তিন পুরুষেও পুরাতন হয় না, মাজিয়া ঘসিয়া সাজাইয়া রাখিলে সর্ব্বদাই ঝক্ ঝক্ করে। বিলাতী বাসনের একটির দ্বারা অন্যের কাজ সাধিত হয় না; একবার একটি ঘরে আনিলে শীঘ্রই আরও দশটির সন্ধান করিতে হয়। অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন কি? দরিদ্র জাতির পক্ষে যে বিলাতী জিনিস ভাল হইতে পারে না, তাহা কে না বুঝিতে পারে?

তথাপি গুজবের অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া মন্ত্রমুগ্ধের মত কোটী কোটী নরনারীকে দেশী জিনিসে অনাদর প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিয়াছে!

ইংরাজ অপেক্ষা বাঙ্গালী ভাল,—ইহাও একটি এদেশের আধুনিক গুজব হইয়া উঠিতেছে! যাহাদের স্বদেশপ্রীতি দশ টাকার স্বার্থত্যাগ করিতে হইলে আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠে, তাহারা স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ অকাতরে মুণ্ডদানে উম্মত্ত গর্ব্বোদ্ধত বৃটনের অপেক্ষা ভাল,—ইহাকে গুজব ভিন্ন আর কি বলিয়া অভিহিত করিব? অথচ ইহা মুখে মুখে বিস্তৃতি লাভ করিয়া বাঙ্গালীর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা সম্পাদন করিতেছে! কেহ দৈবাৎ কোন একটি উচ্চ পরীক্ষায় ইংরাজকে পরাস্ত করিলেন, কেহ দৈবাৎ কোন একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যার রহস্যভেদ করিলেন, কেহ দৈবাৎ কোন দেশের সেনা-বিভাগে প্রবেশলাভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিলেন,—আর অমনি গুজব ছুটিয়া চলিল,—"আমরা মরিয়াছি বলিয়াই কি মরিয়া আছি? এত যে অধঃপতিত, তথাপি আমরাই ভাল!"

আধুনিক দেশী গুজবের ন্যায় আধুনিক বিলাতী গুজবেরও অন্ত নাই। একটি বিলাতী গুজব বড়ই খ্যাতিলাভ করিয়াছে; সে মুখ বাড়াইয়া গলা কাঁপাইয়া হাত নাড়িয়া বলিয়া বেড়াইতেছে—"বাঙ্গালী ভীরু!" এ গুজব নিতান্তই আধুনিক; শতবর্ষ পূর্ব্বেও ইহার ভাল করিয়া মুখ ফুটে নাই! ভারতবর্ষের আর কাহাকেও ভীরু বলিবার সাহস নাই, কারণ তাহারা এখনও ইংরাজের লবণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অকাতরে মুণ্ডদান করিতেছে। বাঙ্গালীর মুণ্ডদানের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে—কাজেই তাহাকে ভীরু বলিতে আর ইতস্ততঃ কি? দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শাহ ভারতবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন; তিনি মাসিদন হইতে বহির্গত হইয়া অবলীলাক্রমে পারস্য তাহার পদানত করিয়া ভারতদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া "গঙ্গারিডি" বা রাঢ়দেশীয় বাঙ্গালীর সন্ধান লইয়াছিলেন। তখন তাহারা পরাক্রান্ত বীরজাতি বলিয়া পরিচিত ছিল;—সেকেন্দ্রায় শাহ সে দেশ জয় করা অসম্ভব বলিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাচীনের বৌদ্ধাচার্য্য শাক্যপুত্র ফা হিয়ান যখন বঙ্গদেশে উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালী সাহসী, সুচতুর ও জলেস্থলে

প্রতাপশালী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কামরূপেশ্বর তখন সমুদ্র-পথের অধিনায়ক, তাম্রলিপ্তি তখন সমুদ্র-যাত্রার উৎসাহে উদ্যমে জগদ্বিখ্যাত, দ্বীপে দ্বীপে অর্ণবপোত প্রধাবিত হইয়া বাঙ্গালীর বাণিজ্য-ভাণ্ডার বহন করিতে ব্যতিব্যস্ত! হিয়াঙ্গ থ্সাঙ্গ যখন ভারতভ্রমণে বহির্গত, তখন কর্ণসুবর্ণেশ্বর কান্যকুব্জেও শক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন,---তখনও বাঙ্গালী ভীরু বলিয়া কীর্ত্তিত হয় নাই। বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গদ্বারে উপনীত হইবার সময়ে বাঙ্গালী বহুবৎসর আত্মরক্ষা করিয়াছে। গৌড় গিয়াছিল; কিন্তু কামরূপ, কুচবিহার, পূর্ব্ববঙ্গ ও চন্দ্রদ্বীপ যায় নাই। মোসলমান ইতিহাস-লেখক অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বঙ্গদেশে উপনীত হইয়াও পূর্ব্ববঙ্গে মোসলমান রাজ্যের সন্ধান পান নাই; ইতিহাস বলিতেছে,---পাঠানেরা তিনশত বৎসরেও সমগ্র বঙ্গদেশ করতলগত করিতে পারে নাই। মোগলকে কতবার বঙ্গবিজয় করিতে হইয়াছিল, তাহা কি ইতিহাসে অপরিচিত? মোগল বাদশাহ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থকে যে, লস্কর ও ফৌজদার পদ প্রদান করিতেন, তাহার স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ইংরাজেরা যখন রাষ্ট্রবিপ্লবে বাঙ্গালীর সহায়তা করেন, তখনও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের অধীনে বিংশতি সহস্র পদাতিক বা অশ্বারোহী রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইত। তাহার পর ক্লাইবের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ লালপল্টনের সিপাহীসেনার শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য কৃতজ্ঞ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাই জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। এতকালের ইতিহাসে বাহুবলের পরিচয় দিয়া আজ যাহারা ভীরু বলিয়া কলঙ্কিত, তাহারা আজিও মরিতে ডরায় না। দানা না ফুরাইলে মানুষ মরিতে পারে না, যে দিন যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে অক্ষয় অমর,—ইহাই বাঙ্গালীর চিরসংস্কার। সাত টাকার বাঙ্গালী লাঠিয়াল এখনও হাসিতে হাসিতে মাথা ফাটাইবার জন্য ছুটিয়া চলে; বন্দুকের গুলিতে সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি লাঠিয়াল লাঠি ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই, এমন মৃতদেহ আমি স্বচক্ষে একাধিকবার দর্শন করিয়াছি! বাঙ্গালী ভীরু,—ইহা নিতান্তই আধুনিক বিলাতী গুজব!

ইংরাজমহিলা সতীত্বের মর্য্যাদা জানেন না;—ইহা একটি নিতান্ত আধুনিক দেশী গুজব! সংবাদপত্রবিশেষে ক্রমাগত বিলাতী বিবাহ-বিচ্ছেদের

বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এই অসম্ভব গুজবের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। যাঁহারা স্বচক্ষে ইংরাজমহিলাকে তাঁহার গৃহধর্ম্মপালনের পবিত্র ব্রতে নিযুক্ত দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কেহ বিশ্বাস করে না;—যাহারা দেখে নাই, তাহাদের অস্ফুট গুঞ্জনই এই গুজবের প্রধান অবলম্বন। যাঁহারা মাতৃরূপে, কন্যারূপে, ভগিনীরূপে, ভার্য্যারূপে, একদেশের সমগ্র মানবসমাজকে উন্নতিপথে উৎসাহিত করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই বা অধিকাংশই কুলটা—এমন অসম্ভব কথা গল্পে লিখিলে লোকে বিশ্বাস করিত না; গুজবের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে। এই গুজব শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই কিয়ংপরিমাণে চালিত করিয়া লইয়াছে; স্ত্রীস্বাধীনতার কথা তুলিবামাত্র তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়!

যিনি যে বিষয়ে কিছুমাত্র অনুসন্ধান করেন নাই, তিনি সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে বসিলেই গুজবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধানদেশ—ইহা একটি এই শ্রেণীর আধুনিক বিলাতী গুজব! অতি পুরাকালে কালদীয় রাজ্য শৌর্য্য বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহার পর মিশর ও গ্রীসের ভাগ্যোন্নতি সাধিত হয়। তৎকালে ফিনিসীয়গণ বাণিজ্য-প্রভাবে দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পথে রোম ও আধুনিক ইউরোপ ধীরে ধীরে পদার্পন করিয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগরই ঐশ্বর্য্য-লাভের কেন্দ্রস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। আধুনিক পণ্ডিতসমাজের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছে যে,—ভারতবর্ষই এই সকল ইতিহাসবিখ্যাত পুরাতন রাজ্যের ভাগ্যোন্নতির মূল। তৎকালে ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র শিল্পপ্রধান দেশ বলিয়াই বিখ্যাত ছিল। আধুনিক ইউরোপীয়গণও যখন শনৈঃ শনৈঃ ভারতবর্ষে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন, তখনও ভারতবর্ষ শিল্পপ্রধান দেশ বলিয়া সুপরিচিত ছিল;—সেই গুজবে অর্থলাভের লোভেই ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন। সে দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া পরিচিত হইল কেন, ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন নিগূঢ় কারণ বর্ত্তমান আছে। গুজব সর্ব্বত্র কার্য্যকারণের পরিচয় প্রদান করে না; কি সূত্রে কোন্ কথা প্রচার করে তাহাও বুঝিতে দেয় না। ইংরাজ কি জন্য ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া গুজব রটনা করিয়াছেন,

ইতিহাসে তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ গুজব বড়ই প্রবল। দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে এই গুজবে অনেক কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার সুবিধা হইয়াছে! যে দেশ কৃষিপ্রধান সে দেশে নৈসর্গিক কারণে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষ এখন কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং এদেশে দুর্ভিক্ষ হইবে না কেন? ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইল কেন? ইহার উত্তরে গুজব সৃষ্ট হইয়াছে—"ভারতবর্ষ ত চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ!" এ কথা এখন ইতিহাসে সংযুক্ত হইয়া বিদ্যালয়ে অধীত হইতেছে; সুতরাং ইহাকে এখন দেশী গুজবের মধ্যেও স্থান দান করা যাইতে পারে।

আধুনিক গুজবের ন্যায় বনিয়াদী গুজবগুলিও কৌতুকাবহ। কোরাণের ধর্ম্ম খরশাণের সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল; ইহা একটী বনিয়াদী বিলাতী গুজব। আরবীর মরুমরীচিকায় ইস্‌লামের অভ্যুদয় হয়। ইস্‌লামের নবোত্থিত মহাশক্তি প্রথমে এসিয়া, তৎপরে আফ্রিকা ও সর্ব্বশেষে ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই ধর্ম্মবিস্তৃতির ইতিহাসের সহিত যুদ্ধ কলহের ইতিহাস সংযুক্ত হইয়া বহু গুজবের সৃষ্টি হইয়াছে। মোসলমান যখন দক্ষিণ ইউরোপ করতলগত করে, তখন তথায় খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। তরবারির সাহায্যে কোরাণ প্রচার করা সত্য হইলে ইউরোপেও মোসলমানের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। ইস্‌লামকে পরাস্ত করিবার জন্য সমগ্র খৃষ্টীয় জনপদ একসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল। যাহারা তরবারির সহায়তায় ইস্‌লামকে তাড়িত করিতে ব্যগ্র হইয়াছিল, তাহাদের প্রচারিত গুজব যে নির্ব্বিবাদে ইতিহাসে বাস্তব ঘটনার ন্যায় স্থানলাভ করিয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের ব্যাপার। ইস্‌লাম যে সকল দেশে প্রবেশ করে তন্মধ্যে সূর্য্যোপাসক পারস্য, বুদ্ধোপাসক মধ্য এসিয়া, দেবোপাসক ভারতবর্ষ ও খৃষ্টোপাসক ইউরোপ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল দেশের মধ্যে সূর্য্যোপাসক ইরাণ ও বুদ্ধোপাসক তুরাণ ভিন্ন আর কোন স্থান সম্পূর্ণরূপে মোসলমান হইয়া যায় নাই কেন, তাহার আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় খৃষ্টীয়ান ইউরোপ মোসলমানের নামে নিতান্ত ভিত্তিহীন গুজব রটনা করিয়া দিয়াছে!

মোসলমান ধর্ম্মবিস্তারবিষয়ক বিলাতী বনিয়াদী গুজবের ন্যায়; ইংরাজ জাতির উৎপত্তিবিষয়ক একটি দেশী বনিয়াদী গুজব প্রচলিত ছিল;— এখনও নিরক্ষর লোকসমাজ হইতে তাহা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। লোকে বিশ্বাস করিত,—ইংরাজ জাতি জাতিসঙ্কর; বানরের ঔরসে রাক্ষসীর গর্ভে সমুদ্রপারে সমুদ্ভূত আধুনিক দৈত্যবিশেষ। সেকালের ইংরাজ বণিকের আচার ব্যবহারে লোকে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিত। তাঁহাদের কঠিন কাষ্ঠাসনে উপবেশনের প্রবৃত্তি ও সুপক্ক কদলী-ভক্ষণে নিরতিশয় আসক্তি বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাদের পৈতৃক সংস্কারের পরিচয়স্থল বলিয়া প্রতিভাত হইত; মদ্যপান ও আমমাংসাহার রাক্ষসী মাতার স্বভাবসুলভ রাক্ষসপ্রকৃতির প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইত। এই গুজব ইংরাজের উপকারসাধন করিয়াছে। লোকে তাঁহাদিগকে মানুষ মনে করিলে, অল্পসংখ্যক বণিকের পক্ষে বহুসংখ্যক বাঙ্গালীকে বশীভূত করা সহজ হইত না!

বিলাতী বনিয়াদী গুজবের মধ্যে একটি গুজব অদ্যাপি সমগ্র ইউরোপে বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে—"খৃষ্টধর্ম্মই মানবসমাজের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতাবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে।" আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন—এই গুজব প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্রীস ও রোমের সভ্যতালোক নির্ব্বাপিত হইবার পর খৃষ্টান ইউরোপ নানারূপ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে আরবীয় সাহিত্যের সংশ্রবে নানা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ইউরোপে প্রবেশলাভ করে। প্রত্যেক গণিত, বিজ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞান খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া ধর্ম্মযাজকগণ কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, তরবারি, অগ্নিকুণ্ড ও কারাগারের সহস্র যন্ত্রণা দ্বারা জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতবর্গের তাড়না করিতেন। যাঁহারা ইউরোপের জ্ঞানবিস্তারের প্রবর্ত্তক, তাঁহারা সকলেই খৃষ্টধর্ম্ম কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিলেন। কালে জ্ঞানের বল ক্রমশঃ জয়লাভ করায় ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিকূলতা বিদূরিত হইয়াছিল। জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করা দূরে থাকুক,—খৃষ্টধর্ম্ম প্রাণপণে পথরোধ করিবার আয়োজন করিয়াছিল।

আধুনিক ও বনিয়াদী গুজবের ন্যায় সকল দেশেই কতকগুলি পৌরাণিক

গুজব বর্ত্তমান আছে,— তাহা এত পুরাতন যে জনসাধারণ আর তাহাদের কথা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে না। গ্রাম নগরের উৎপত্তি, রাজবংশ-বিশেষের অভ্যুদয়, সুবিখ্যাত গ্রন্থাদির রচনাপ্রণালী, সুপরিচিত সেনানায়ক-দিগের সমরকৌশল ইত্যাদি বহুবিষয় অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর সকল দেশেই এইরূপ পৌরাণিক গুজব বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মশাপে কুসুমপুর নামক আর্য্যাবর্ত্তের পুরাতন রাজধানীর রাজকন্যাগণ কুব্জা হইয়াছিলেন বলিয়া নগরের নাম কান্যকুব্জ হইয়াছিল; বিক্রমাদিত্য তাল বেতাল নামক দৈত্যদ্বয়ের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন; দ্বৈপায়ন মুখে মুখে শ্লোক রচনা করিবার সময়ে গণপতি হস্ত-চতুষ্টয়ে তাহা দ্রুতগতিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরাল হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে যজ্ঞাগারে নিভৃতে নিহত করিতে হইয়াছিল;— ইত্যাদি দেশী পৌরাণিক গুজবের অনুরূপ কাহিনী সকল দেশেই শুনিতে পাওয়া যায়!

আমাদের দেশে একটি সনাতন গুজব প্রচলিত আছে— একাল অপেক্ষা সেকাল ভাল; কলি অপেক্ষা দ্বাপর, দ্বাপর অপেক্ষা ত্রেতা, ত্রেতা অপেক্ষা সত্য ভাল ছিল। এই গুজব আমাদের সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবনের সকল কার্য্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই গুজবে আমাদের জাতীয় জীবনে অজ্ঞাতসারে একটি অবসন্ন ভাব আনিয়া ফেলিয়াছে; ইহাতে চেষ্টা ও অধ্যবসায় স্থায়ী কীর্ত্তি লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া সাময়িক অভাব বিমোচনের জন্যই লালায়িত হইয়াছে। স্থায়ী শুভফল লাভের জন্য আপাততঃ ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়—আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। দুদিনের হাসি, দুদিনের অভ্যুদয়, দুদিনের যশঃ ও দুদিনের কীর্ত্তি আমাদের লক্ষ্য হইয়াছে—তজ্জন্য আমরা জাতীয় স্বার্থের সিংহাসনে ব্যক্তিগত স্বার্থকে সংস্থাপন করিয়া একের অভ্যুদয়ের জন্য বহুলোকের নিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর ললাট কলঙ্করেখায় অনুলিপ্ত করিয়াছি! গুজবের কলরবে সেকালের তুলনায় একালের কথা আর কাহারও চিত্তাকর্ষণ করিতেছে না;— আমরা কি ছিলাম, সেই কথারই আলোচনা চলিতেছে, আমরা এখনও কি হইতে পারি, তাহার আলোচনার পথ উন্মুক্ত হয় নাই!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

প্রেমের পরিণাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ কার্লোর মত সুখী কয়জন আছে? সমস্ত বার্সিলোনা নগরী কার্লোর নামে উন্মত্ত; কার্লোর মূর্ত্তি প্রতি গৃহে বিরাজমান; কার্লোর প্রশংসাধ্বনি সর্ব্বত্র; বার্সিলোনার সুন্দরীগণ কার্লোকে দেখিবার জন্য, কার্লোর হস্তে পুষ্প-গুচ্ছ প্রদান করিবার জন্য ব্যাকুল! কার্লো বার্সিলোনার অপূর্ব্ব কৌশল-শালী মেতাদর*, তাই তাহার এত গৌরব।

কিন্তু সমস্ত নগরবাসীর আদরের পাত্র বলিয়া আজ কার্লো এত সুখী নয়; তাহার সুখের প্রধান কারণ আজ সে নগররক্ষকের সুন্দরী তনয়া ওতেরোবালার প্রেম লাভ করিয়াছে। নগণ্যবংশোদ্ভব সামান্য ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর সুখের আর কি কারণ থাকিতে পারে?

রক্ষকের প্রাসাদ-উদ্যানদ্বারে ওতেরোবালার কোমল হস্ত ধরিয়া কার্লো দণ্ডায়মান। আকাশে সপ্তমীর চন্দ্র হাসিতেছিল, নাতিশীতল পশ্চিমবায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। যেদিন কার্লোর বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া, ওতে-রোবালা পুষ্পগুচ্ছ প্রদান করিতে আসিয়া তাহার হৃদয়খানি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কার্লো সেই দিনকার কথা কহিতেছিল।

মিলনসুখে যখন উভয়ে বিভোর, কর্কশস্বরে কে ডাকিল "ওতেরো"!

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় ওতেরোবালা এত ভীত হইত না। কারণ, সে স্বর তাহার পিতার।

নগররক্ষক অলক্ষ্যে তনয়ার কীর্ত্তি দেখিতেছিলেন; নিঃশব্দে ওতেরোর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছেন।

ওতেরোর হস্ত ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় একবার ঘৃণাব্যঞ্জক আঁখিতে

---

* স্পেনদেশে বৃষযুদ্ধের বড় আদর। প্রথমে অরণ্যে জীবন্ত বৃষ ধৃত হয়, পরে বৃষগুলি একে একে রঙ্গভূমে প্রবেশ করান হয়। রক্তবস্ত্রখণ্ড ও অসি-হস্তে মনুষ্যগণ ইহাদের সহিত যুদ্ধ করে। এই সকল মনুষ্য মেতাদর নামে অভিহিত।

কার্লোর দিকে চাহিলেন, গম্ভীরভাবে বলিলেনঃ——

"নীচ বংশোদ্ভব! দুরাকাঙ্ক্ষার বশে বোধ হয় স্মরণ নাই যে, নগর-রক্ষকের কন্যা তোর মত লোকের জন্য নহে। তোকে বধ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিতে চাহি না, কিন্তু সাবধান ভবিষ্যতে যেন আমার প্রাসাদ-সমীপে তোর মত জন্তুকে আর দেখিতে না পাই।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত কার্লো নীরব হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাল কার্লোর মত সুখী আর কেহ ছিল না। আর আজ? এখনও কার্লোর নামে সকলে উন্মত্ত; এখনও তাহার প্রশংসা সর্ব্বত্র। দিবাভাগে রাজপথে উপস্থিত হইলে এখনও বার্সিলোনার সুন্দরীগণ তাহার হস্তে পুষ্প-গুচ্ছ অর্পণের জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু কার্লো ভাবে—

"আজ, কি যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো
তাই, চারিদিকে চায় প্রাণ কেঁদে গায়
এ নহে এ নহে নয় গো"।

কার্লোর মনে হয় তার মত দুঃখী এ জগতে আর নাই।

দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, কার্লোর অতৃপ্ত তৃষা মিটিল না। প্রতিরাত্রি আকুল হৃদয়ে নগররক্ষকের প্রাসাদ বহির্ভাগে অপেক্ষা করিত, যদি কখনও ওতেরোর দর্শনলাভ ঘটে—কিন্তু তাহার আশা পূরিত না। কোন রাত্রি হয়ত বাতায়নে কাহারও দীপালোক-ছায়া পতিত হইত, কার্লোর মনে হইত সে বুঝি ওতেরোর ছায়া! হয়ত তাহাতে তৃষিত হৃদয়ে বিন্দুমাত্র বারিপাত হইত, কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণারই বৃদ্ধিই হইত।

একদিন দেখিল, সে রাত্রি প্রাসাদে মহাসমারোহ। নানা বর্ণের পতাকা গৃহে গৃহে উড্ডীয়মান, ফুলমালা ও আলোকপুঞ্জে প্রাসাদ সুশোভিত। গৃহ-মধ্য হইতে সঙ্গীতধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল, উৎসবের সকল চিহ্নই দেখিতে পাইল। কিন্তু বুঝিতে পারিল না সে কিসের উৎসব।

কার্লো শুধু ভাবিতে লাগিল এ উৎসবের মাঝে ওতেরো কার্লোর স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছে কি না।

পরদিন এক রাজকর্ম্মচারী কার্লোর গৃহে উপস্থিত হইল। নগররক্ষকের তনয়ার বিবাহ। শুভোৎসব উপলক্ষে বৃষযুদ্ধ হইবে, কর্ম্মচারীর হস্তে কার্লোর নিয়োগপত্র।

এতক্ষণে কার্লো গতরাত্রির সমারোহের কারণ বুঝিতে পারিল। তাহার আশার ক্ষীণ প্রদীপ নিবিয়া গেল—মনে হইল সমস্ত পৃথিবী যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

কার্লো দেখিল এ উৎসবে সে বৃষযুদ্ধে নিপুণতা দেখাইতে পারিবে না—কিন্তু পরক্ষণে মনে হইল এ সুযোগে সে ওতেরোকে দেখিতে পাইবে, হয়ত আবার ওতেরোবালা তাহার গলে বিজয়মালা প্রদান করিবে।

নিয়োগপত্র স্বাক্ষরিত করিল। কিন্তু রাজকর্ম্মচারী বুঝিতে পারিল না, আজ সমস্ত নগরবাসীর আদরের পাত্র কার্লোর চক্ষে কেন অশ্রুকণা!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নগরীর রঙ্গভূমি লোকাকীর্ণ। নিকটে দূরে যে যেখানে ছিল কার্লোর নাম শুনিয়া আগমন করিয়াছে। আর স্থান নাই—যাহারা বিলম্বে আগমন করিয়াছে বিষণ্ণ মুখে তাহাদের প্রত্যাগমন করিতে হইতেছে।

ক্রমে মেতাদরেরা রঙ্গভূমে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের উজ্জ্বল পোষাক, বঙ্কিম মস্তকাভরণ, তীক্ষ্ণধার অসি, রক্তবর্ণ বস্ত্রখণ্ড দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইয়া দিল।

কন্যাসহ নগররক্ষক উপস্থিত হইলেন—বাজনা বাজিয়া উঠিল—রঙ্গদ্বার উন্মুক্ত হইল; ভীমনিনাদে এক বৃষ রঙ্গভূমে উপস্থিত হইল। প্রথম মেতাদরের অসি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না—নিমেষমধ্যে দ্বিতীয় মেতাদরের অশ্ব বৃষশৃঙ্গে বিদ্ধ হইয়া ভূমে পতিত হইল-আরোহীরও জীবননাশের অধিক বিলম্ব ছিল না, কিন্তু এমন সময়ে প্রথম মেতাদর রক্তবস্ত্র প্রদর্শন করিল। বৃষ তাহার অভিমুখে ধাবিত হইল, অসির আঘাতে ভীত হইয়া পশ্চাদপদ হইবামাত্র আর এক মেতাদর রক্তবস্ত্র প্রদর্শন করিল-তাহার উদ্দেশে আবার

বৃষ ধাবিত হইল—আবার অসির আঘাত। এইরূপে বারবার অসির আঘাতে উন্মত্ত হইয়া প্রথম মেতাদরের উদ্দেশে বৃষ ছুটিল-সবেগে তাহার অসির উপর পতিত হইল। আমূল অসিখানি বৃষস্কন্ধে বিদ্ধ হইল,---বৃষের জীবনলীলা ঘন করতালির মধ্যে শেষ হইয়া গেল।

আবার করতালি উঠিল, কারণ কার্লো রঙ্গভূমে প্রবেশ করিয়াছে। আবার বাজনা বাজিয়া উঠিল, আবার রঙ্গদ্বার উন্মুক্ত হইল। উন্মত্তের মত রক্তচক্ষু: এক ভীমদেহ বন্যবৃষ বহির্গত হইল। অন্যান্য মেতাদর সরিয়া দাঁড়াইল; এবার কার্লো একাকী কৌশল দেখাইবে।

সগর্ব্বে বন্যবৃষ কার্লোর অভিমুখে ধাবিত হইল -কার্লো চকিতে সরিয়া দাঁড়াইল---উন্মত্ত বেগ সামলাইতে না পারিয়া বৃষ কার্লোকে পরিত্যাগ করিয়া অনেকদূর গিয়া পড়িল।

এই অবসরে কার্লো নগররক্ষকের উপবেশিকার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল--দেখিল ওভেরোবালা নগররক্ষকের দক্ষিণে বসিয়া আছে; আর তাহার পার্শ্বে এক নবীন যুবক। এ যুবক কে, কার্লো তাহা বুঝিতে পারিল। অকস্মাৎ কার্লোর আঁখিদুটি জলপূর্ণ হইয়া উঠিল!

ইতিমধ্যে বৃষ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কার্লোর অভিমুখে পুনর্ধাবিত হইয়াছে। কার্লো তাহা জানিতে পারে নাই; তাহার আসন্ন বিপদ দেখিয়া দর্শকবৃন্দ যখন চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন সরিয়া দাঁড়াইবার সময় ছিল না---তাহার অসি উত্তোলনের ক্ষমতাও যেন তিরোহিত হইয়া গেল।

কার্লোর সুন্দর সজ্জা রক্তে পূর্ণ হইয়া গেল---ভীত দর্শকবৃন্দ পলক ফেলিবার পূর্ব্বে, অন্য মেতাদর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার অগ্রে, কার্লোর প্রাণশূন্য দেহ বৃষপদতলে পতিত হইল।

ওভেরোবালা মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল---অন্যান্য রমণীরাও চীৎকার করিল, কারণ কার্লো সকলেরই আদরের পাত্র ছিল। কাহারও মনে কোনও সন্দেহ স্থান পাইল না---কিন্তু সেই শুভ্রকেশ গম্ভীরবদন নগররক্ষক বোধ হয় দর্শকবৃন্দকে কার্লোর অকাল মৃত্যুর কারণ বলিতে পারিতেন।

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ দেব।

বিশ্বনাথ।*

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর কিছুর না হউক,—অন্ততঃ যদি উপন্যাসের সংখ্যা দেখিয়া সাহিত্যের উন্নতি অবনতি নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্য যে "পরিণাম রমণীয়"—এ সম্বন্ধে বড় সংশয়ের কারণ দেখা যায় না। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, আপাতদৃষ্টিতে প্রায়-অস্তু-ত্তরণীয় এই উপন্যাস-রাশির অভ্যন্তরে কিয়দ্দূর মাত্র প্রবেশ করিলেই হৃদয় ক্ষোভে ও নিরাশায়, ঘৃণায় ও বিরাগে ভরিয়া উঠে! এই গ্রন্থ-রাশির অধিকাংশই প্রায় অপাঠ্য। কি বালক, কি যুবক, কি কৃতী, কি অকৃতী সকলেই উপন্যাস লিখিতে সিদ্ধহস্ত; কাহারও এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অণুমাত্র শঙ্কা বা সঙ্কোচ দেখা যায় না। অথচ কাজটা সত্যসত্যই যে এতই সহজ তাহাও নহে। সুতরাং আমাদের সাহিত্যক্ষেত্র ক্রমেই অসার আগাছা ও দুরতি ক্রম্য কণ্টক-বৃক্ষে ছাইয়া যাইতেছে।

বহুদিন হইতে আমরা বাঙ্গালার এই কুজ্ঝটিকাপূর্ণ উপন্যাস-গগনের পানে চাহিয়া চাহিয়া অবসন্ন হইতেছিলাম। কিন্তু এতদিনের পর দেখিতেছি, যেন এই তমোরাশি ভেদ করিয়া কোন অষ্টমীর শশধর ধীরে ধীরে আপনার স্নিগ্ধ বিমল বিভায় উপন্যাসাকাশ আলোকিত করিতে উদিত হইতেছে। এই লেখক "বিশ্বনাথ"-প্রণেতা বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীশ বাবু বাঙ্গলা সাহিত্যে অপরিচিত নহেন। "বিশ্বনাথ" ইহাঁর চতুর্থ উপন্যাস। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক যে ইহাকে ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, এমন কথাও আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। শ্রীশ বাবুর কোন উপন্যাসেরই এপর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই,—ইহাই এ কথার প্রমাণ। বাঙ্গালীর চিরদিনের অপবাদ,—বাঙ্গালী ভালমন্দ সহজে বিচার করিতে পারে না। মধুসূদনের মত মহাকবিকেও বাঙ্গালী ভিখারীর বেশে বিদায় দিয়াছে! এই কলঙ্কের কতকটা অপনোদন-মানসেই আজি এ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। বাঙ্গলা পাঠক-

* উপন্যাস, শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য এক টাকা। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

সম্প্রদায়ের তরফ হইতে আমি শ্রীশ বাবুকে জানাইতে চাহি যে, আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ নহি!

শ্রীশ বাবুকে এতটা প্রশংসা করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। শ্রীশ-বাবু তাঁহার রচনায় কতকগুলি অনন্যসাধারণ গুণের পরিচয় দিয়াছেন। আধুনিক জীবিত উপন্যাসলেখকদিগের কাহারও মধ্যে সে গুণগুলির বড় বিকাশ দেখা যায় না। এই গুণগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান গুণ শ্রীশ বাবুর অপূর্ব্ব ভাষাসম্পত্তি। বাঙ্গলা ভাষার উপর এতটা অধিকার বাঙ্গলার আধুনিক লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত শ্রীশ বাবুর ভাষা মহিমা-ময়ী এবং ঐশ্বর্য্যশালিনী না হইলেও, স্বাভাবিক সরলসৌন্দর্য্যে এবং কোমল মধুরতাগুণে ইহারও আকর্ষণীশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। শ্রীশ বাবুর ভাষা স্বচ্ছ, নির্ম্মল, সংযত, গভীর ও সুমিষ্ট। স্বাভাবিক সরস কৌতুকে লেখক স্থানে স্থানে ভাষাকে আরও বিমোহন বেশে সজ্জিত করিয়াছেন।

লেখকের দ্বিতীয় ক্ষমতা তাঁহার দুর্লভ পর্য্যবেক্ষণী-শক্তি। এই অলৌ-কিক ক্ষমতা-প্রভাবে লেখক বাঙ্গালার জড় ও মানবপ্রকৃতি এমন সুন্দর ফুটাইয়া তুলিতে পারেন যে, তাঁহার উপন্যাস পড়িতে পড়িতে সুজলা সুফলা বাঙ্গালার শান্ত মধুর ছবিখানি, ইহার শান্ত, সুকুমার স্নেহময় অধিবাসীকে বক্ষে করিয়া ধীরে ধীরে মানসপটে সমুজ্জ্বল-দীপ্তি-ভরে ফুটিয়া উঠে! কিন্তু শ্রীশবাবুর প্রতিভা পল্লীগ্রামের শান্ত, বিমুক্ত দৃশ্যের মধ্যেই বিচরণ করিতে ভাল বাসে—নগরের হিংসাকুটিলতাময়, কলহ- কোলাহলপূরিত পিঞ্জর হইতে সসম্ভ্রমে দূরে থাকিতে চায়। বাস্তবিক বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের ও খাঁটি বাঙ্গালীর এমন নিখুঁত ছবি আমরা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই দুইটী অলোকসাধারণ ক্ষমতা-বলে শ্রীশবাবু বাঙ্গালার অনেক ঔপন্যাসিকের শীর্ষ-স্থানীয়।

আর একটী গুণ থাকিলে শ্রীশবাবু বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নিকটে যাইতে পারিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীশবাবু আজিও সে গুণের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন নাই! আমাদের আশা ছিল, শ্রীশবাবু বিশ্বনাথে সেই গুণের পরিচয় দিবার উপযুক্ত অবসর পাইবেন। কিন্তু শ্রীশবাবু

হ্যাতেও আমাদিগকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। শ্রীশবাবুর প্লট জমাইবার ক্ষমতা তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ-ক্ষমতার তুলনায় সামান্য বলিয়াই মনে হয়। অষ্টমীর শশধর যেমন প্রশান্ত নীলিম সাগরহৃদয় প্লাবিত করিয়া তাহার ঈষচ্চঞ্চল তরঙ্গশিরে রত্নরাজি সাজাইয়া দেয়, শ্রীশবাবুর রচনাও তেমনি পাঠকের প্রীতিবিমল হৃদয়ের স্থানে স্থানে এক একখানি সমুজ্জল ছবি আঁকিয়া যায়, কিন্তু সমস্ত হৃদয়টাকে উদ্বেলিত আকুলিত করিতে পারে না। শ্রীশবাবু অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ ছবি নিখুঁত ভাবে আঁকিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু সেই গুলিকে ঠিক যেমন করিয়া সাজাইলে সমস্ত ছোট বড় ছবিগুলি মিশিয়া একখানি সুবৃহৎ উজ্জ্বল অবিচ্ছিন্ন ছবি নির্ম্মিত হয়, ঠিক তেমন করিয়া সাজাইতে পারেন না। শ্রীশবাবুর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে মনে হয়, পৃথক পৃথক ছবিগুলির মধ্যে যেন একটু একটু অবকাশ রহিয়া গেছে, যেন জোড়গুলি বেশ "বেমালুম" হইয়া যায় নাই!

শ্রীশবাবুর আর একটী অপূর্ণতা এই যে, তিনি অনেক সময়ে উপন্যাসকে তাহার সহজ, সবল ও স্বাভাবিক পরিণামে আনিয়া ফেলিতে পারেন না। শ্রীশবাবুর উপন্যাস পড়িয়া মনে হয় যে, তাঁহার উপন্যাসের শেষভাগ, প্রথমভাগ অপেক্ষা যেন কতকটা তাড়াতাড়ি এবং অসাবধানে লিখিত। তাঁহার অবকাশ অথবা ধৈর্য্য—কিসের অভাবে ঐরূপ অপূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহা আমরা সম্যক অবগত নহি। যাহা হউক, আমরা আমাদের অদ্যকার সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে শ্রীশবাবুর এই গুণ ও দোষ-ভাগ যথাসাধ্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

"বিশ্বনাথ" পড়িলেই মনে হয়, দুইটী বিভিন্ন গল্পের সংমিশ্রণে সমস্ত উপন্যাসখানি গঠিত। একটীতে কোন অসহায়া কুলীন ব্রাহ্মণকন্যার পতি-সকাশে গমন, পতিকর্ত্তৃক লাঞ্ছনা ও অবশেষে পুনর্ম্মিলন এবং অপরটীতে বিখ্যাত দস্যু বিশ্বনাথের কীর্ত্তিকলাপ অভিব্যক্ত। কিন্তু এই দুইটী গল্প পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়সম্বদ্ধ—বিশ্বনাথেরই স্নেহ এবং করুণায় দুঃখিনী সরলা পতিলাভ করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং এই অনৈতিহাসিক গল্প বিশ্বনাথের চরিত্রোন্মেষণে গ্রন্থকারকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং ইহার সমাবেশ নিরর্থক নহে। গ্রন্থকার অন্য কোন সংক্ষিপ্ত উপায়ে যে বিশ্বনাথচরিত্রের

এই অংশটুকু ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না, এমন কথা আমরা বলি না; কিন্তু তাহা হইলে আমরা একটি রমণীর কুসুমসুকুমার অথচ সতীত্বগর্ব্বে গর্ব্বিত অপূর্ব্ব নারীচরিত্রে বঞ্চিত হইতাম!

সুতরাং আমরা ঐ গল্পাংশের জন্য লেখককে দোষারোপের পরিবর্ত্তে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। বাস্তবিক শ্রীশ বাবুর সরলাচরিত্র পড়িতে পড়িতে সময়ে সময়ে কালিদাসের কবিকল্পনার অপূর্ব্ব সামগ্রী কাননললাম-ভূতা কোমলহৃদয়া শকুন্তলাচিত্র মনে পড়িয়া যায়! উভয়েরই অবাচিতভাবে পতিগৃহে গমন, উভয়েরই পতিকর্ত্তৃক সতীত্বধর্ম্মে আঘাত, উভয়েরই মুখে সেই একই কথা— "অনার্য্য! সকলকেই আত্মবৎ দেখিতে চাও?" অথবা, "এই স্বামী? এই অধার্ম্মিক আমার দেবতা!" আবার উভয়েরই স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন, উভয়েরই স্নেহ ও প্রেমে অপূর্ব্ব প্রতিশোধ, উভয় চরিত্রকে একই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। বাস্তবিক কোমলহৃদয় বাঙ্গালীর মধ্যে কোমলতর বঙ্গনারীর সুকুমার চিত্র অঙ্কিত করিতে শ্রীশবাবুর অপূর্ব্ব ক্ষমতা! "শক্তি কাননের" হৈমবতী, "ফুলজানির" ফুলকুমারী, "কৃতজ্ঞতার" কুসুমমালা—সকলেই এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে অবকাশমতে পাঠকবর্গের সম্মুখে শ্রীশবাবুর দুই একটী রমণীচিত্র উপস্থিত করিবার বাসনা রহিল।

ইহাছাড়া শ্রীশবাবু দুএকটী বেহারী-চরিত্র বাঙ্গালায় আনিয়া, বঙ্গ সাহিত্যে আর এক নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। "কৃতজ্ঞতার" অকালীসিংহের চরিত্র এবং "বিশ্বনাথে" মীরা ও বিক্রম সিংহের চরিত্র ইহার উদাহরণ। ইহাদিগকে বাঙ্গালীসমুচিত অধিকাংশ গুণে বিভূষিত করিয়াও লেখক অসামান্য কৌশলে তাহাদের দুই একটী বিহারী সুলভগুণ এমন সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে বাঙ্গালার নিম্নসমভূমির মধ্য হইতে তাহাদের উন্নত মস্তক অনায়াসে চিনিয়া লওয়া যায়। লেখকের পর্য্যবেক্ষণী-শক্তির ইহা সামান্য উদাহরণ নহে। যাহা হউক এইবার আমরা স্বয়ং বিশ্বনাথ চরিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মুসলমানের গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, অথচ ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তিও এ পর্য্যন্ত তেমন সুদৃঢ় হয় নাই—এই পরিবর্ত্তনযুগে বাঙ্গালায় ঘোর

অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল! লেখকের মতে—"এই ঘোর অরাজকতা দুইটী কারণে ঘটিয়াছিল। প্রথম, নিম্নশ্রেণীর অতিদারিদ্র্য; দ্বিতীয়, তাহাদের উপর উচ্চতর সম্প্রদায়ের অত্যাচার। এ অবস্থায় যে কোন সমাজে কাপুরুষতা এবং দারুণ প্রতিহিংসার ভাব অত্যাচারিতের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালার ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। দস্যু ও "মানসুরে"র দলে বাঙ্গালা দেশ ছাইয়া গিয়াছিল—সুতরাং অত্যাচার ও রক্তপাতের অভাব ছিল না। ধনী, নির্ধন, স্ত্রী, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধ সকলকে সর্ব্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকিতে হইত। চারিটী পয়সার লোভেও 'মানসুরেরা' বাক্ষাতনয়ের প্রাণবধ করিতে কুণ্ঠিত হইত না; এমন কথাও শুনা যায়।

"বাঙ্গালার মানুষের সঙ্গে মানুষের যখন এই অহিনকুল সম্বন্ধ, তখন বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিল। বিশ্বনাথ অল্প বয়সেই বলবীর্য্য ও প্রতিভার পরিচয় দিল, সুকুমার বয়সেই তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি, তাহার জন্মভূমি "গাড়রা ভাতছালা"র চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। তখনকার দিনে ডাকাইতি একটা ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইত। ডাকাইতদিগকে লোকে সম্ভ্রম ও ভীতি ভিন্ন ঘৃণার চক্ষে দেখিতে সাহস করিত না। বিশ্বনাথ যৌবনে দস্যুব্যবসায় অবলম্বন করিল। বিশ্বনাথের দস্যুব্যবসায় অবলম্বনের সঙ্গে একটি গল্প জড়িত আছে। গল্পপাঠে বোধ হয় বিশ্বনাথ প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতামানসেই এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম নদীয়া জেলার অস্থিমজ্জাগত। দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাপ্রভুর সে পবিত্র ধর্ম্ম ও উহার আদর্শ অনেক স্থলে বিষম বিকৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবি চণ্ডীদাস 'রজকিনী রামী'কে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া যে মধুর রসে ভোর ছিলেন, নদীয়াসমাজ তাহার তরঙ্গাভিঘাতে যেমন প্রহত হইয়াছে, আর কোথাও তেমন নহে। ইহার ফলে সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটা উদার সহানুভূতি এবং গূঢ় সংযোগের ভাব অন্তঃশিলা বহিয়া আসিতেছে। এই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র এই যে, যত প্রকৃতি পুরুষ, রস তত প্রকার!

"প্রথম বয়সে বিশ্বনাথ এই সম্প্রদায়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অতি সংগোপনে স্বগ্রাম "গাড়রা ভাতছালা" ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহাকে মিলিত হইতে হইত। ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ বেলোয়াড়

পাঁচকড়ি সর্দ্দারের কন্যার সঙ্গে বিশ্বনাথের ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। এই ঘনিষ্ঠতার বিকারের কোন হেতু ছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু পাঁচকড়ি সর্দ্দার একদিন নিশীথে বিশ্বনাথকে কন্যার গৃহে দেখিল এবং ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিল। কুলকলঙ্কভয়ে চোর বলিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত করিতে পারিল না। পাঁচকড়ি সর্দ্দার ভাগিনেয় মেগাইয়ের সঙ্গে একত্র আসাননগরের অদূরবর্ত্তী নীল-কুঠিতে পাইকের কাজ করিত। বিশ্বনাথকে বাঁধিয়া রাখিয়া সে ভাগিনেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেল। সেই অবকাশে কন্যা বিশ্বনাথের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল; মাতার অনুযোগ এবং পিতার নিষেধ গ্রাহ্য করিল না। বিশ্বনাথ মুক্ত হইয়া সতর্ক হইল বটে, কিন্তু যে সখী নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল, তাহার আর কোন খবর পাইল না। কিছুদিন পরে গ্রামে খবর আসিল, সর্দ্দারের কন্যা মেগাইয়ের গৃহে সর্পদংশনে মারা গিয়াছে! বিশ্বনাথ বুঝিল আসল ব্যাপারটা কি। নিজকে হত-ভাগিনীর অকালমৃত্যুর কারণ জানিয়া সে মর্ম্মাহত হইল। পাঁচকড়ি সর্দ্দার ও মেগাইয়ের উপর জাতক্রোধ হইল।"—ইহারই ফলে বিশ্বনাথ দস্যু-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিল। তাহার সকল সংকল্প, সকল আশা, ভরসা এই একই খাতে প্রবাহিত হইল। "বিশ্বনাথ ক্রমে নিজেই ডাকাইতের দল করিল।"

বিশ্বনাথ নিজের প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা-মানসে দস্যু-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু বিশ্বনাথের দস্যুতাবলম্বনে যে, দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়! "সে একদিকে ডাকাইতের কাপুরুষতা, নিরর্থক অত্যাচার সংযমিত করিয়া দিল, অন্যত্র সে সময়ে যাঁহারা সমাজের নেতা—ধনবান ও তাঁহাদের আশ্রয়চ্ছায়ার বর্দ্ধিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল,—তাঁহাদের যমস্বরূপ হইয়া উঠিল! বিশ্বনাথের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানস্থরের দল প্রায় অন্তর্হিত হইল। ডাকাইতেরা স্ত্রীলোক, বালক ও গরিব লোকদের প্রতি বীরোচিত ক্ষমা এবং দয়া প্রকাশ করিতে শিখিল। এদিকে দেশের ধনকুবেরগণ বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদের অগাধ ধনের একাংশ বিশ্বনাথ বাবুর অবশ্যপ্রাপ্য। সহজে না দিলে সে বলে লইবে।"

বিশ্বনাথ নিজে বা দলের কোন লোককে দরিদ্র, বিপন্ন বা স্ত্রীলোকের প্রতি আক্রমণ করিতে দিত না। বিশ্বনাথ দলের কাহাকেও কোন অনাথার অর্থের প্রতি লোভ করিতে দেখিলে বলিত "যদি বাপের ব্যাটা হ'স্, মরদের সঙ্গে ল'ড়ে টাকা আন্।" বিশ্বনাথকে কখন কেহ বিপন্নের প্রতি আক্রমণ করিতে শুনে নাই। এই জন্যই যখন কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর খড়িয়া নদীতীরে নৌকারোহী ছদ্মবেশী বিশ্বনাথের সমক্ষে বলিতেছিলেন,---শুধু বিশ্বনাথের ভয়েই তাঁহাকে কার্য্য শেষ না করিয়াই বাড়ী ফিরিতে হইতেছে,---তখন বিশ্বনাথের "আনতচক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।" বিশ্বনাথ হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল "ঠাকুর বিশেডাকাত তোমার মত কন্যাদায়গ্রস্তের টাকা নিয়েছে, কখনো এমন শুনেচো কি?" এবং এই জন্যই বিশ্বনাথ যখন দূতমুখে শুনিতে পাইল যে বৈদ্যনাথ সরলা'র নৌকার পিছু লাগিয়াছে, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—তৎক্ষণাৎ সুসজ্জিত হইয়া 'রণ্‌পা' সাহায্যে পূর্ব্ববর্ণিত স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। লেখক সেই অবকাশে নৈশান্ধকারে ভরা ভাদ্রের বন্যাপ্লাবিত ক্ষেত্রপথের অপূর্ব্ব সুষমা এমন সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে বাস্তবিকই প্রাবৃট-প্রকৃতির করুণ, বিষণ্ণ, গাম্ভীর্য্যময় চিত্রখানি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মানসপটে ফুটিয়া উঠে:——

"ঘোরান্ধকারে আন্দাজে মাঠের সোজা পথ ধরিয়া বিশ্বনাথ চূর্ণী নদীর গতি অনুসরণ করিয়া চলিল। সেই ভরাভাদ্রের জলে, ভরাধান্যক্ষেত্রে এবং পঙ্কিল আইলপথের পার্শ্বদেশ হইতে অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব উঠিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আকাশে মেঘের সঞ্চার ছিল না, মাঝে মাঝে প্রান্তরে ইতস্ততঃ সঞ্চিত বর্ষাজলে নক্ষত্রসনাথ নভোমণ্ডল ছায়া হিল্লোলে ঈষৎ কাঁপিতেছিল। কচিৎ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে প্রবাহিত জলের করুণ কল্লোল ধ্বনিত হইতেছিল। কোথাও গ্রামপ্রান্তে নিবিড় বটচ্ছায়ার ছেদশূন্য অন্ধকার মধ্যে পেচকদম্পতী বিকট চিৎকার করিতেছিল। নিশীথের এই রুদ্র গাম্ভীর্য্য বাস্তবিক অনন্তের বিরাটমূর্ত্তি প্রকটিত করে।"

যাঁহারা বর্ষারজনীতে কখনও পল্লীগ্রামের ধান্যক্ষেত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই বর্ণনাপাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে পল্লীগ্রামের, অতিক্ষুদ্র, অতিতুচ্ছ

সৌন্দর্য্যটী পর্য্যন্ত অজ্ঞাতসারে লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না! শ্রীশবাবুর পুস্তকে এরূপ বর্ণনা অনেক স্থলেই আছে। ইহাঁর বর্ণনাশক্তি অতি সুন্দর। পল্লীগ্রামের প্রকৃতি-বর্ণনায় (শুধু প্রকৃতি-বর্ণনায় কেন? সাধারণ সরল মানবপ্রকৃতি বর্ণনাতেও) অনেক সময় মনে হয়, ইহাঁর আসন বঙ্কিমবাবুর আসনের নিম্নে নহে!

যাহা হউক, বিশ্বনাথ যখন মুক্ত প্রান্তরের অপূর্ব্ব প্রাকৃতোৎসব দেখিতে দেখিতে ছুটিতেছিল, তখন অনাথা সরলা 'পরিহারে'র বিখ্যাত রাজপুতবীর বিক্রমসিংহের আশ্রয়ে বসিয়া আপনার সুখ দুঃখের কথা ভাবিতেছিল। কিন্তু অধিকক্ষণ সে শান্তিসুখ ভোগ করিতে পাইল না—বৈদ্যনাথের দল সেখানেও তাহাকে আক্রমণ করিল; বৃদ্ধ বিক্রমসিংহ অসামান্য সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াও দস্যুসম্প্রদায়কে বাধা দিতে পারিলেন না—তাহারা সরলার যথাসর্ব্বস্ব পুঁটুলিটি গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিল। ক্ষণকাল পরেই বিশ্বনাথ তাহার ভগবদ্‌প্রেমিক বন্ধু ভগবান মদকের সঙ্গে আসিয়া ঘটনাস্থলে সমুপনীত হইল। বিক্রমসিংহকে বিপন্ন ও সরলাকে সর্ব্বস্বান্ত দেখিয়া ক্রোধে তাহার হৃদয় একেবারে জ্বলিয়া গেল। বিশ্বনাথ বীরত্বের যথেষ্ট গৌরব করিত। বিক্রমসিংহের প্রতি তাহার আচরণ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বিশ্বনাথ বিক্রমসিংহের নিকট বিদায় লইয়া বৈদ্যনাথের অনুসন্ধানে ছুটিল। পথে তাহার দেখা পাইয়া ক্রোধের অধীরতায় তাহাকে বৃক্ষশাখে দৃঢ়বদ্ধ রাখিয়া চলিয়া গেল। বিশ্বনাথের "যত মায়া তত রাগ ছিল"। অন্যায় সে কিছুতেই সহিতে পারিত না। প্রকৃত বীরপুরুষের ইহাই লক্ষণ।

দুষ্টের দমন ও অনাথের উপকার--ইহাই বিশ্বনাথের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু বৈদ্যনাথের প্রতি উক্ত প্রচণ্ড শাস্তিই বিশ্বনাথের অন্তিম নিকট করিয়া আনিল। বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথের দল ছাড়িয়া, বিশ্বনাথের চিরশত্রু পাঁচকড়ি সর্দ্দারের সঙ্গে যোগদান করিল। বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। সুতরাং বৈদ্যনাথের ঐই কৃতঘ্নতা মৃত্যুকালেও বিশ্বনাথের হৃদয়ে জাগরূক ছিল! ফাঁসির সময়ে সকলকে সম্বোধন করিয়া বিশ্বনাথ বলিয়াছিল "গোয়ালাকে কেউ বিশ্বাস কোরো না ভাই!"

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জালের মধ্যেও বিশ্বনাথের অতুল নির্ভীকতা ও

দূরদর্শিতা তাহাকে মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করে নাই! এইরূপ বিপদে পরিবেষ্টিত হইয়াও অনাথা সরলার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে, তাহার স্বামীর কারামোচনের ব্যবস্থার জন্য, বিশ্বনাথ দলস্থ সকলের বিরাগভাজন হইয়াও দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মেঘা তাহাকে সাবধান হইতে বলিলে সে স্পষ্টই বলিয়াছিল "আমি কুকুর বিড়ালের মত লুকিয়ে লুকিয়ে থাক্‌তে পারব না মেঘু!"

নীলকুঠি লুঠ করিয়া মেঘা যখন সামুয়েল ফেডিকে বন্ধনদশায় আনিয়া উপনীত করিল, তখন বিশ্বনাথের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধিনায়কোচিত গুণগ্রামের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। দলের সমস্ত লোকের মত—ফেডি সাহেবকে হত্যাকরা, কিন্তু একাকী বিশ্বনাথের মত—তাহাকে বন্ধনমুক্ত করা। সকলের আপত্তি সত্ত্বেও—পাঁচশত বলবান্ দস্যুর ক্রোধ এবং হিংসা উপেক্ষা করিয়া বিশ্বনাথ "ক্ষিপ্রহস্তে দৃঢ় সংকল্পে ফেডিকে বন্ধন মুক্ত করিয়া বসাইল।" "নীরবে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই দস্যুসেনা দলপতির আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল, মশালের আলোকে বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, বিশ্বনাথের প্রতি-বাক্যে প্রত্যেক অঙ্গুলিসঞ্চালনে অমানুষী নির্ভীকতা এবং দৈববল সূচিত করিতেছিল। সে মোহ—যাহার মহিমায় মানুষ যথার্থ মহত্ত্বে দেবত্ব আরোপিত করিয়া প্রতিভার পদে আত্ম সমর্পণ করে—তাহাই আসিয়া অকস্মাৎ বিদ্রোহোন্মুখ রোষচঞ্চল দস্যুদলে কুহক বিস্তার করিল।" বিশ্বনাথের এই অপূর্ব্ব মানসিক তেজস্বিতা তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বিশ্বনাথ প্রাণের ভয় কখনই করিত না। তাহার অন্তিম কালে সিপাহী ও গোয়েন্দার দল যখন ভোজন-নিরত দস্যুদলপতিদের ঘিরিয়া ফেলিল—তখনও বিশ্বনাথ অটল অচল। তখনো বিশ্বনাথ ভীত বা চিন্তিত নহে। তখনও সে আপন সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলিল, আর বাঁচার চেষ্টা বৃথা! মাকালী অপ্রসন্ন না হ'লে আজ ইঁদুরের মত কলে প'ড়তাম না। স্বপ্নে কদিন তাঁর ভ্রূকুটিই দেখছি! তোদের যা ইচ্ছা হয় কর, আমি বাঁচবার জন্য একটু আঙ্গুলও তুলব না।" তার পর কৃতঘ্ন সামুয়েল ফেডির বিশ্বাসঘাতকতায় বিশ্বনাথ ধরা পড়িল। কিন্তু সে বিচলিত হইল না! তখনও সিংহবিক্রমে তীব্র উপহাসের সহিত ফেডি সাহেবকে

বেশ দশকথা শুনাইয়া দিল। মেঘা দৃঢ় হস্তে তীক্ষ্ণধার তরবারি আপনবক্ষে আমূল বসাইয়া দিল। অবশিষ্ট দস্যুদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কতক বা পলায়ন করিল, কতক বা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

লেখক বিশ্বনাথের সাংসারিক জীবনের কোন সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করেন নাই। তাহার মাতৃভক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার দাম্পত্যজীবন যে পবিত্র বা সুখময় ছিল না,— লেখক তাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারণেই বোধহয় সুরুচির অনুরোধে সে চিত্র পাঠকের সম্মুখে প্রকটিত করিতে সাহসী হন নাই!

যাহাই হউক, বিশ্বনাথচরিত্র আগাগোড়া যেরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে সামান্য দস্যু বা তস্কর বলিয়া মনে করিতে হৃদয়ে সঙ্কোচ বোধ হয়। তাহার অসামান্য সাহস, তীক্ষ্ণ প্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সদাশয়তা ও দরিদ্রের প্রতি কোমল সহানুভূতির ভাব,— বিশ্বনাথচরিত্রকে শুধু দস্যুশ্রেণীর কেন— সাধারণবাঙ্গালীর আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছে। সুকঠোর দস্যুব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাহার হৃদয়ক্ষেত্র নিরবচ্ছিন্ন মরুভূমিতে পরিণত হইতে পারে নাই! চিরবিশুষ্ক, বালুকাময়, হিংসাদ্বেষনিষ্ঠুরতাপরিতপ্ত ভূভাগরাশির মধ্য হইতে সময়ে সময়ে যে সুন্দর মধুরগন্ধ কুসুমদাম, স্ত্রীজাতির প্রতি সসম্ভ্রম সম্মান, দরিদ্রের প্রতি করুণা এবং আরাধ্য দেবতা ও স্নেহময়ী জননীর প্রতি সরল ভক্তি ও অনুরাগরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিশ্বনাথের সুগভীর হৃদয়তলে মনুষ্যত্বের মধুরবাহিনী স্রোতস্বতী চিরতরে বিশুষ্ক হইয়া যায় নাই। সুতরাং বিশ্বনাথচরিত্রে শিখিবার অনেক কথা আছে।

আজকালকার অবসন্ন মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীচরিত্র অনুশীলন করিতে করিতে হৃদয়ে এমন এক বেদনার সঞ্চার হয়, যাহার প্রশমনের জন্য বিশ্বনাথের মত দোষগুণময় দস্যুচরিত্রকেও সম্মান ও সমাদর করিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে! সেই জন্যই বিশ্বনাথের প্রতি গ্রন্থকারের কেমন একটু আন্তরিক টান দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বনাথের গুণভাগ বিশদীকৃত এবং দোষভাগ যেন কতকটা ইচ্ছাপূর্ব্বক অস্পষ্টীকৃত!

বিশ্বনাথে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য চরিত্র ভগবান মদক। বাহুবলের সঙ্গে ধর্ম্মবলের এরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন বঙ্গসাহিত্যে বিরল! যে ভগবান বাহুবলে স্বয়ং বিশ্বনাথকেও অতিক্রম করিয়াছিল,– ডাকাইতদলের সঙ্গে ধরা পড়িয়া তাহারই মুখে তর্জ্জনগর্জ্জনের পরিবর্ত্তে

"দুখের দিনে তোমারে ডাকি পরাণ মন ভরে না"—

গীতি নিতান্ত বিস্ময়কর মনে হয় নাকি? বাস্তবিক ভগবানের পরোপকার-পরায়ণতা, সুখে দুঃখে জগদীশ্বরের উপর চিরনির্ভরের ভাব, অসাধারণ শারীরিক পরিণতির সঙ্গে ভক্তি ও প্রেমে প্রগাঢ় তন্ময়তা,– ভগবানচরিত্রকে বিশ্বনাথ অপেক্ষাও ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে। এরূপ চরিত্র বাঙ্গালীর আদর্শস্থানীয়!

তার পর মীরা। কোমলতাময়ী, প্রেমময়ী সরলার পার্শ্বে, বাঙ্গালীর কমনীয়তা ও রাজপুতের তেজস্বিতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে গঠিত মীরাচরিত্র বাস্তবিক হৃদয় বিমুগ্ধ করে! এতদ্ভিন্ন বিক্রমসিংহ, বিনোদবিহারী প্রভৃতি সকলেই যথাযথ চিত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাদের চরিত্রবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করিতে আর ভরসা হয় না।

এক্ষণে শ্রীশবাবুর উপন্যাসের বিষয়নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীশবাবু এ পর্য্যন্ত যতগুলি চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, সকলগুলিই প্রকৃত বাঙ্গালিত্বের অনুকূল।

এক্ষণে জাতীয় উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম হইতেছে। সুতরাং এই জাতীয় উন্নতি কোন্ পথে সম্পাদিত হওয়া উচিত তাহা আজকালকার একটি গুরুতর আলোচ্য বিষয়। আমাদের দেশীয় সংস্কারকগণের অধিকাংশের মত, বোধহয়, আমাদের জাতীয় উন্নতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংমিশ্রণে সম্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এই মত আমাদের দেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অধিকাংশের আচারব্যবহারে এবং তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদিতে পরিস্ফুট। তাই আজকাল শাড়ীর সঙ্গে সেমিজ, বডি এবং পাদুকার সংমিশ্রণ, দেশীয় খাদ্যের সঙ্গে একাধারে ইংরাজী খাদ্যের সমাবেশ, আসনের পরিবর্ত্তে চেয়ার ও ডিনার টেবিল স্থাপনের ঐকান্তিক আগ্রহ! জাতিভেদ বিলোপ এবং স্ত্রীস্বাধীনতা ও বিধবাবিবাহ প্রচারের বিপুল আয়াস ও প্রবল অনুরাগ! গ্রন্থ-

কারগণের প্রণীত উপন্যাস এবং কাব্যেও সুতরাং এইরূপ চিত্রের সংস্থান ও বিকাশ। স্বয়ং বঙ্কিম বাবুও বুঝি এইরূপ সংস্কারের কতকটা অনুকূল, নহিলে তিনি সূর্য্যমুখীকে গাড়ী করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে প্রয়াসী হইতেন, বোধ হয় না।

শ্রীশবাবু কিন্তু এরূপ সংস্কারের প্রতিকূলে। তাঁহার মতে— "বাঙ্গলার আসল যে মহত্ত্ব, তাহা খাঁটি বাঙ্গালিত্ব হইতেই সম্ভবে। যাহা কিছু সেই বাঙ্গালিত্বের বিঘ্নকর, তাহাতে সুফল ফলিবে না।" (শক্তি কাননের ভূমিকা।) সেইজন্য তাঁহার সমস্ত চরিত্রই খাঁটি বাঙ্গালী চরিত্র। এ সম্বন্ধে কোন্ সম্প্রদায়ের মত সমীচীন, তাহা আমি এক্ষণে আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহি; এবং কিরূপ শিক্ষা বাঙ্গালিত্বের অনুকূল, কিরূপ শিক্ষাই বা প্রতিকূল, তাহারও নিরাকরণ করা সহজ নহে। আমি আমাদের দেশের চিন্তাশীল সংস্কারক-সমাজকে এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করি। এই পরিবর্ত্তনযুগের প্রারম্ভেই এ বিষয় মীমাংসিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ কোন সংস্কার, ইষ্টকর বা অনিষ্টকর— যাহাই হউক না কেন, একবার সমাজ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাহার উন্মূলন দুষ্কর। যদি শ্রীশবাবুর মত অভ্রান্ত হয় তাহা হইলে, তিনি সমাজকে উন্নতির প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিয়া যে ইহার মহৎ উপকার করিতেছেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং তাহা হইলে শ্রীশবাবুর পুস্তকের যত প্রচার হয় সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল।

আর এ সম্বন্ধে শ্রীশবাবুর মত অভ্রান্ত না হইলেও সাহিত্যজগতের উচ্চাসন হইতে শ্রীশবাবুর অধঃপতনের সম্ভাবনা দেখি না। কারণ, এই নূতন উন্নতির স্রোতে যখন আমরা বহুদূরে ভাসিয়া যাইব, তখন শ্রীশবাবুর অকৃত্রিম বাঙ্গালীচিত্রগুলি আমাদিগকে আমাদের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রকৃত জাতীয় ইতিহাসের কার্য্য করিবে, সন্দেহ নাই। তাই একএকবার মনে হয়, শ্রীশবাবু বঙ্গসাহিত্যে কতদূর উচ্চাসনলাভের অধিকারী, সে বিষয় প্রকৃত মীমাংসা করিবার দিন এখনও আসে নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

—

কোকিল।

আজ এই মধুমাসে হাসিছে সংসার ওই,
সুখে মাতোয়ারা;
যেন প্রকৃতির বুকে উছলি' পড়িছে শত
অমৃতের ধারা!
শুধু পিক তুমি কেন আকুল অধীর কণ্ঠে
কাঁদিয়া বেড়াও?
মধুর বসন্তে হায়, এ হেন ব্যাকুল চিতে,
কাহারে বা চাও?
তোর ও কাতর কণ্ঠে কি জানি কি আছে গাথা,—
বিষাদ তরল;
কি যেন দারুণ ব্যথা, বিরহের হা হুতাশ,
নয়নের জল!
শুনে তোর কুহু কুহু প্রাণ হুহু হুহু করে,
কি যেন রে নাই;
কি জানি আছিল আগে, এখন গিয়াছে কোথা,
কি যেন বা চাই!
পরাণের আধখানা কোথায় চলিয়া গেছে,
কি যেন না পাই!
একাকী কদম্বমূলে দাঁড়ায়ে রয়েছে শ্যাম—
কোথা গেল রাই!
কোথা কোন্ প্রেমময়ী ফুল ল'য়ে গাঁথে মালা,
গান শুনে তার;—
মনে পড়ে প্রাণ-বঁধু, বুঝি হয়নাক হায়,
মালা গাঁথা আর!
মিলনের সুখ যত একে একে উঠে জাগি

সকলি আবার।
তোর ওই মধু স্বরে শুনি যেন কণ্ঠধ্বনি
প্রিয়ার আমার!
আকর্ণবিস্তৃত তার প্রেমভরা আঁখি দুটি
মনে পড়ি যায়!
সুধার আধার সেই স্ফুরিত অধরযুগ
সমুখে ভাসায়!
তুমি কি বিরহী কোন অথবা পথিক-বধূ
বঁধুর উদ্দেশে,
আকুল ব্যাকুল চিতে অধীর কাতর কণ্ঠে
ফির' দেশে দেশে!

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

রমণী-হৃদয়।

পূর্ব্বকালে আর্য্যমহিলাদিগের হৃদয় যেরূপ উন্নত ছিল, অধুনা নারী-হৃদয়ে তাহার একাংশেরও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষার জন্য সভাসমিতি ছিল না, বালিকা-বিদ্যালয়, বেথুন কলেজ, বিদেশীয় বা দেশীয় শিক্ষয়িত্রী,— এ সব কিছুই ছিল না। তথাচ তাঁহাদিগের হৃদয় এরূপ উন্নত হইত কিসে? তাঁহারা গুরুজনবর্গের নিকট যে শিক্ষা লাভ করিতেন, সে শিক্ষা বিদ্যালয়ে বা কলেজে হইতে পারে না। রমণী সংসাররূপ রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী, তাঁহাদের হৃদয় ধর্ম্মভূমি। অতএব সংসার-পালনের জন্য তাঁহাদের যে শিক্ষার আবশ্যক, তাহাই প্রধান শিক্ষা এবং তাহাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য-কর্ম্ম,— কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু সে শিক্ষা কি স্কুল কলেজে হয়? স্কুল কলেজে নীতিশিক্ষা, জীবন-চরিত প্রভৃতির আলোচনায় হৃদয় যে উন্নতিলাভ করে না,— এমন কথা বলি না; কিন্তু শুধু তাহাতে কোন ফল দর্শিবে না,— তাহার সহিত আরও কিছু প্রয়ো-

জন। যেমন কেবল তৈল-ঘৃতের সংযোগে রন্ধন সুমিষ্ট হয় না, একটু লবণ চাইই,— স্ত্রীশিক্ষায় তদ্রূপ শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদির যতই ব্যবস্থা থাকুক না কেন, একটু সাংসারিক শিক্ষা চাইই। তাহা না হইলে রমণী-হৃদয় সম্যক্‌রূপে গঠিত হয় না, সংসারে শান্তি থাকে না। অনেকে বলিতে পারেন, সাংসারিক শিক্ষা বয়োবৃদ্ধির সহিত আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ কথা অভ্রান্ত নহে। সংসার করা মুখের কথা নয়,— ইহা একটি রাজ্য-পালনবিশেষ। রাজনীতিজ্ঞ না হইলে রাজ্যপালন রাজার পক্ষে যেরূপ দুরূহ ও প্রজাবর্গের ক্লেশজনক হয়, সংসারনীতি পরিজ্ঞাত না হইলে নারী-জাতির অবস্থা তদ্রূপ শোচনীয় হয় এবং আনুসঙ্গিক ব্যক্তিগণও যন্ত্রণায় জর্জ্জ-রীভূত হইয়া থাকেন। সংসার পালন একটি গুরুতর কার্য্য; কল্পনার রাজ্য নহে, ইহা কোমল পদ্মময় নহে— কঠিন গন্ধময়।

সংসারই ধর্ম্মভূমি। সকল আশ্রম হইতে সংসারাশ্রমই শ্রেষ্ঠ যথা:— —

যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমোগৃহী॥

মনু, ৩, ৭৮।

কিন্তু অধুনা আমরা তাহা ভাবিয়া কার্য্য করিতে পারি না, এই জন্যই আমা-দের সংসার এত হাহাকারপূর্ণ! অধুনা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্ত্রীজাতিদ্বারা সংসারের শ্রী-বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, শ্রী-হ্রাসই হইতেছে অধিক। এইজন্যই অনেক দুঃখে সমাজমর্ম্মজ্ঞাতা অমৃত বাবু লিখিয়াছেন,—

ফটকে আটক রব না,
গেটের বাহিরে পা দিয়েছি ছেড়ে জেনানা।
তোমরা সব কুট্‌না কোট বাট্‌না বাট, দাও
লক্ষ্মীপূজার আলপনা।

বিদ্যা হইতেই বিনয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু অধুনা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে— বিদ্যাশিক্ষা করিয়া নারীজাতি বিকৃত স্বভাবই প্রাপ্ত হইতেছেন অধিক। ইহার কারণ কি? কারণ স্থির করা কঠিন কার্য্য নহে। নারী-জাতির কর্ত্তব্যোপযোগী শিক্ষার অভাবই ইহার মূল কারণ। সংসারে থাকিতে

হইলে কোন্ কোন্ বস্তুর প্রয়োজন, সর্ব্বাগ্রে নারীজাতির তাহাই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই শিক্ষা সম্যক্‌রূপে অনুশীলিত হইলেই সমস্ত অভাব বিদূরিত হইতে পারে।

অধুনা আমরা আপনার স্বার্থের জন্য না-করিতে-পারি এমন কোন কার্য্যই নাই, কিন্তু পরার্থে কিঞ্চিন্মাত্রও স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত হই না। আমরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরার্থ কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছি! কিন্তু বিদ্যালয় বা কালেজে অধ্যয়ন না করিয়াও আমাদের প্রাচীন মহিলাগণ পরার্থে কিরূপ আত্মবিস্মৃত হইতেন তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে। এক্ষণে একটি প্রাচীন মহিলা হৃদয়ের অপূর্ব্ব চিত্র পাঠিকাগণের সম্মুখে ধরিব।

একদা দুর্য্যোধন নৃপতির উৎপীড়নে মাতা কুন্তীসহ ব্রাহ্মণ-বেশে পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চাল নগরে এক বিপ্রগৃহে অজ্ঞাতরূপে বাস করিতেছিলেন। পঞ্চাল নগরে বকাসুর-নামক এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বাস করিত। সেই দুর্দান্ত রাক্ষসের উৎপীড়নে রাজ্য ছারখার হইল দেখিয়া একদা পঞ্চাল-রাজ বকাসুরকে পঞ্চায়ৎ দিবার জন্য প্রত্যেক প্রজাকে আদেশ করিলেন। প্রজাবর্গ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল।

যে ব্রাহ্মণ-গৃহে মাতা-সহ পঞ্চ পাণ্ডব অবস্থান করিতেছিলেন, যথাসময়ে সেই বিপ্রগৃহে বকাসুরের পঞ্চায়ৎ পড়িল। সেই ব্রাহ্মণের একটি অনূঢ়া কন্যা একটি শিশুপুত্র ও সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ব্রাহ্মণ কাহাকে রাক্ষসসেবায় প্রদান করিবেন,— ভাবিয়া আকুল হইলেন। গৃহে হাহাকার উঠিল! কন্যা বলিলেন "আমাকে রাক্ষসমুখে অর্পণ করিয়া এ বিপদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করুন্।" গৃহিণী কহিলেন "কন্যাদানে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, অতএব কন্যারত্নকে রাক্ষসমুখে প্রদান করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আমিই আজ রাক্ষসভক্ষ্য হইয়া আপনাকে আশু বিপদ হইতে ত্রাণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রাণ দিয়াও স্বামীর উপকার করা নারীর কর্ত্তব্য, অতএব এই ক্ষুদ্র প্রাণ দিয়া যাহা পারি আপনার উপকার করিয়া যাই।" তাঁহাদের এই সকল মর্ম্মবিদারক কথোপকথন পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবীর শ্রুতিগোচর হইল। শ্রুতিমাত্র তিনি স্বীয় মধ্যমপুত্র ভীমকে রাক্ষসভক্ষ্য হইয়া ব্রাহ্মণকে আশু বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে আদেশ করিলেন। ভীম মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত

হইলেন। যথাসময়ে ভীম রাক্ষসমন্দিরে গমন করিলেন, কিন্তু ভীমকে ভক্ষণ করা দূরে থাক্, রাক্ষস তাঁহার সহিত রণে পরাস্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ভীম রাজ্য নিষ্কণ্টক করিলেন। কিন্তু ধন্য কুন্তীর পরদুঃখকাতর হৃদয়! তিনি প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তানকে পরের বিপদ-ত্রাণের জন্য রাক্ষসমুখে প্রেরণ করিলেন,- এরূপ উন্নত হৃদয় না হইলে সে হৃদয়ের মহত্ত্ব কি? কিন্তু হায় আমাদের হৃদয়ে কি আর এখন এমন পবিত্রতা আছে!!

যাহাতে রমণী হৃদয় দয়া-মমতা নিস্বার্থতায় পরিপূর্ণ হইয়া সংসারে অমৃত-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারে, আমাদের এখন সেই শিক্ষা আবশ্যক হইয়াছে। রমণী হৃদয়ের গৌরব রক্ষা করিতে রমণীগণের যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী সরস্বতী।

হাসির গান।

বাঙ্গালের শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত।

তারা নাম কর্‌তে কর্‌তে জিব্বাডা আমার
একেকালে গ্যাচে আরাইয়া।
গুরু যে কি মাথা কৈর‍্যা দিল কাণে,
ফেল্‌চি জন্মের মত হারাইয়া।
বৈস্যা বৈস্যা ক্যাবল কৈর্‌চি তারা নাম,
কি দোষ পাইয়া তারা, হৈয়্যা বস্‌চস্ বাম;
শোন্ কের্‌পামই, আমি যাইমু কৈ,
মিথ্যি যদি পাও ছাবাইয়া?
তারা বৈল্যা যারা পাও ধইর‍্যা থাকে,
তারা তারা কৈর‍্যা চক্ষু মুইদ্যা ডাকে;
টিকি ধইর‍্যা তার সাত সুমুদ্দুর পার
দ্যাও দ্যাশেথনে তারাইয়া।

ভাল মতে পরক্ কৈর‍্যা দ্যাখ্‌লাম আমি,—
বৈক্ষদ্যাশে পাথর বাঁইদ্যা বস্‌চ তুমি;
এত কাঁদ্‌বার লাগ্‌চি, মাথা বাঙ্‌ব্যার লাগ্‌চি,-
দ্যাখ্‌ফার্ লাগ্‌চ তুমি দারাইয়্যা।

বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো ও বাঙ্গাল চাকর।

কর্ত্তা। আমার এমন কি বয়েসটা বেশি?
সত্যি হ'লে কোষ্টি, এই যে আস্‌ছে জ্যোষ্টি
এই মাসে পূরিবে আশি!
আরে নাঃ না! আমার বিয়ে কর্‌বার কাল
যায়নিক এখনও; আরে পান্নালাল
কি বলিস্?

চাকর। কর্‌তা, এখনও ছাওয়াল
হৈবো, বিয়্যা করেন্, তামুক লৈয়্যা আসি।

কর্ত্তা। আরে দ্যাখ্‌না আমার সংসার অচল
ছেলে পিলে মানুষ কে করে তাই বল্
আমি চুলে কলপ দেব, দাঁত বাঁধিয়ে নেব
(আর) এম্‌নি ক'রে (প্রদর্শন পূর্ব্বক) হাস্‌ব সুমধুর হাসি।
আমার চামড়া গেছে ঝুলে চোক গেছে কোটরে,
কোমর গেছে বেঁকে বেড়াই লাঠি ধ'রে
তা, "শৃঙ্গার-তিলক" কিছু নেব তোয়ের ক'রে।

চাকর। (আর) যৈবন ফিরা্যা পাইবেন্, হৈবেন্ মোট্টা খাসী।

কর্ত্তা। কচি মুখখানিতে বল্‌বে প্রেমের বুলি,
গহনা পেয়ে আমার বয়েস যাবে ভুলি,
ক্ষীর নবনী দিব চাঁদমুখেতে তুলি,

চাকর। (আর) চরণ হ্যাবা কোর্‌ব হৈয়্যা হ্যাবাদাসী।

কর্ত্তা। কথায় কথায় যদি ক'রে বসে মান,

পায়ের উপর প'ড়ে বল্‌ব "ছুটো খান্‌",
তাতেও না ভাঙ্গিলে ত্যজিব এ প্রাণ।
চাকর। কর্‌তা, আমি আপনার গলায় দিয়া দিমু ফাঁসী।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

প্রকৃতির প্রতি।

যখন যে ভাবে দেখি, মুগ্ধ তোর রূপে
লো সুরসুন্দরি,
অতুল লাবণ্যলীলা একি মরি মরি!
প্রভাতে সজল আঁখি অবাক্‌ চাহিয়ে থাকি;
তোমার তরুণী মূর্ত্তি হেরি নির্নিমেষে।
শিশির সলিলে নাও, সিঁথিতে সিন্দূর দাও,
সরমে ফুটিয়া উঠ নববধূ-বেশে।

দেখিতে দেখিতে ফুল্ল যৌবন বিকাশ
অঙ্গে অঙ্গে তোর,
পরাণ কাড়িয়া নিস্‌ রে পরাণ চোর!
রূপরাশি টল্‌ মল্‌ নাই সীমা নাই তল,
দেখি দেখি ঢুলে আসে শ্রান্ত দু'নয়ন;
দহিয়া আপন তাপে আচম্বিতে কি সন্তাপে
সর্ব্বাঙ্গে ঢাকিয়া দাও তিমির বসন।

সেকি সাধ জেগে ছিল লো প্রকৃতি তোর
জীবন প্রভাতে,
তরুণ স্বপন রাগে আভাতে শোভাতে।
আহা, কোন্‌ ভাগ্যধরে খুঁজি লোক-লোকান্তরে
ফিরে এলে মালা হাতে পাওনি সন্ধান;

পরাণে আগুন ল'য়ে তবু খোঁজ মত্ত হ'য়ে
বাতাসে নিশ্বাস-বিষ করে যাও দান।

মর্ম্মাহত জীবনের সকরুণ ধ্বনি
বাজে চরাচরে,
জলে স্থলে মেঘে মেঘে আধ চাপা স্বরে।
চন্দ্র তারকায় মিশে প্রকাশিছে দিশে দিশে
সে নীরব হাহাকার শুনিবারে পাই!
শেষে যবে ম্লান মুখে লুকাস্ আঁধার বুকে
আমিও আঁধার লয়ে ঘরে ফিরে যাই।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

বিচিত্র ভুল-সংগ্রহ।

(১)

জিনিসটা পকেটেই আছে, অথচ সারা ঘর খুঁজিয়া বেড়াইতেছি,—এ এক রকম ভুল! এমন লোক দেখা যে, ঘাড়ে গামছা কিংবা বগলে ছাতি রাখিয়া ছাতি ও গামছার অযথা অন্বেষণ করে; আফিসের বেলা হওয়ায় সাহেবের বকুনি খায়! কৈফিয়ৎ দেওয়ার সময় হয়ত বলে—"গিন্নির অসুখ করেছিল।" "চির-কুমার সভার" সভাপতি মহাশয় ইহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ; তিনি গলায় বোতাম লাগাইয়া বোতামের তাগাদায় নিরপরাধিনী ভাগিনেয়ীটিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন!

(২)

একদল বোকা জোলা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। বাড়ী ফিরিবার সময় কাহাকেও কুমীরে খাইয়াছে কিনা, হিসাব করিতে বসিল। যে গণনা করে, সে নিজকে বাদ দেয়; কাজেই একটা কম পড়িয়া যায়! তখন তাহারা অজ্ঞাত বন্ধুটীর অপমৃত্যুতে সকলে মিলিয়া কাঁদিতে বসিল।—এ ত গেল গল্প! সত্যসত্যই এ রকম ভুল আমাদেরও হয়। সে দিন ক্রিকেট্ ম্যাচ্ হইবে, এগারটী লোক দরকার। এগার জন পুরিল কিনা, দেখিতে

গিয়া দেখা গেল, একজন কম!—এখানেও সেই ভুল চলিতেছিল। ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।

(৩)

অন্ধকার রাত্রিতে মানুষ চিনিতে ভুল হয়। তা হোক্, কিন্তু দিনে দুপুরে ভুল হওয়াটাকে বিচিত্র ভুল বলিব না কেন? মুখ ফিরিয়া কেহ পথ চলিতেছে,—মনে হইল ঠিক যেন আমাদের রাম বাবু যাইতেছেন। ফস্ করিয়া "কি হে রাম বাবু," বলিয়াই পিঠে একটা পাকি এক সের ওজনের চাপড় লাগান হইল। লোকটা অবশ্য মরা মানুষ নয়; সে কিল খাইয়াই মুখ ফিরাইল; বাবা, এ কে গো?

(৪)

এখানে দুইজনেই ভুল করিতেছে। দুই জন লোক রাস্তা চলিতেছে; একজন যাইবে উত্তর দিকে, অপর জন দক্ষিণ দিকে। যখন উভয়ে সামনা-সামনি হইল, তখন একজনকে অবশ্য একটু পাশ কাটিতে হইবে। যাহার মুখ উত্তরে, তিনি খুব ভদ্রলোক, মনে করিলেন— আমিই পাশ কাটিয়া যাই না কেন? যাহার মুখ দক্ষিণে তিনিও নেহাত অভদ্র নন, তিনিও সেই মুহূর্ত্তে ভাবিলেন—পাশটা আমিই কাটিব। বাস্——কিছুক্ষণ পাশকাটাকাটিই চলিল! ঠিক এক সময়ে উভয়েই পাশ কাটিতে চান, কাজেই উভয়েই পুনরায় সামনাসামনি হইয়া পড়েন। অবশ্য, সাত পাকের পূর্ব্বেই তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া যায়।

(৫)

কথা বলিতে অনেকেরই ভুল হইয়া থাকে; কিন্তু এক রকম ভুল আছে, যাহা কথকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সারে ঘটে! মা শুধাইলেন "আর দুটো ভাত নিবি?" মনে হইল বলি "নিব", কিন্তু মুখে বাহির হইল—"না"। শুধু কি মুখের ভুল? কাণও ভুল করিল; কাণেও যেন শুনিলাম, বলিয়াছি "নিব"। কাজেই ভুল সংশোধন করার সুবিধা নাই। অবশেষে যখন মা ভাত দিলেন না, তখন বড্ড রাগ হইল। যে কয়টী ভাত পাতে ছিল, তাহাও আর রাগের জ্বালায় খাওয়া হইল না!

গান।

(ধানশী ।)

সখি রে কাহে সব করত বয়ান।
কাহে মোক করত দুখ-দান ॥
কানু মোক ছোড়ি গেয়ি মথুরায়।
কাহে কহত সব বুঝান না যায় ॥
অনুদিন কানুয়া আছুয়ে মোর পাশ।
সতত রসিকরাজ করত পরিহাস ॥
কভু শোই পালঙ কভু বৈঠে মোর কোর।
কভু সো আঙ্গিয়া পর আখি ঝর লোর ॥
যঁহি যঁহি নেহারই নয়ানের আগে।
অন্তরে বাহিরে সতত পিয় জাগে ॥
তব রে সখি কাহে কহত সব মেলি।
কানু মোক ছোড়ি আনত গেলি ॥
রায় কহ তুহ রাই কৈছন নারী।
ইহ ব্রজধাম সব বৈরী তুহারি ॥
তুহ রাই বহুত গোঙারিণী।
ঘুমল জাগল ভেদ না জানি ॥

শ্রীশশধর রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী।

(কার্ত্তিক, ১৩০৭)

এবারকার 'ভারতীর' কবিতা, গল্প ও 'চিরকুমার সভার' বিস্তৃত উপন্যাস ছাড়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে। রবি বাবুর কবিতা আবৃত্তি করিতে

অক্ষম হইয়া অনেকে তাহার রসাস্বাদ করিতে পারেন না; চিরপরিচিত পয়ারাদিচ্ছন্দে লিখিত কবিতাগুলিও কেমন নূতন ধরণের বলিয়া বোধ হয়; সেই জন্য পড়িবার সময় কেমন বাধ বাধ ঠেকে! শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী মহাশয় "কবিতার ছন্দ ও মিল" প্রবন্ধে রবিবাবুর কবিতার গুরুলঘুপর্য্যায়ে আবৃত্তি কৌশলের আভাস দিয়া দেখাইয়াছেন,– হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণানুসারে হয় না, ভাবানুসারে বিবক্ষাবশতঃ কবি হ্রস্বকে দীর্ঘ ও দীর্ঘকে হ্রস্ব করিয়া থাকেন। বিবক্ষাবশতঃ কেবল রবি বাবুই যে অকারকে দীর্ঘ ও আকারকে হ্রস্ব করিয়া লইয়াছেন তাহা নহে; বাঙ্গালী জাতি সংস্কৃতের শৃঙ্খল পরিহার করিবার পর হইতে সকল কাযেই পুরাতন হ্রস্বকে ফাঁপাইয়া, পুরাতন দীর্ঘকে খাটো করিয়া এক নূতন ধরণের ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ ও জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে;– তাহার মধ্যে ছায়া আছে, কায়া নাই; মানুষ আছে, মনুষ্যত্ব নাই; সুতরাং আধুনিক কবিতার মধ্যেও ধ্বনি আছে, সংস্কৃতানুযায়ী গুরুলঘুভেদে উচ্চারণ-কৌশল নাই! "আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষক" শীর্ষক প্রবন্ধটি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমাদের শিক্ষা যে ঠিক পথে চালিত হইতেছে না, এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ নাই; বরং কথাটা হাটে মাঠে বিদ্যালয়ে সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি হইলে ঠিক হয়, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে কাহাকেও যত্নশীল দেখি না! বর্ত্তমান প্রণালীর সমালোচনা যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে; কোন্ প্রণালীতে ভবিষ্যতে অগ্রসর হওয়া উচিত তাহার একটা আদর্শ দাঁড় করাইয়া তদনুসারে আন্দোলন করিবার সময় আসিয়াছে। সে আদর্শ স্থির করিয়া দিবার জন্য অল্প লোকই অগ্রসর! "মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী মহাশয়ের ইংরাজী প্রবন্ধের বাঙ্গলা সমালোচনা। রবি বাবু সমালোচনা করিতে গিয়া চৌধুরী সাহেবের অনেক কথাই মানিয়া লইয়াছেন;– পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিলে রবি বাবুর ন্যায় সাহিত্যসেবকের সহানুভূতিতে মোসলমানসম্প্রদায়ের বিশেষ লাভ হইবে না।

সাহিত্য।

(কার্ত্তিক, ১৩০৭)

সেবারকার প্রবল ভূমিকম্প লইয়া সাহিত্যে একটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধের

অবতারণা হইয়াছে; ইহাতে অনেক তথ্য আলোচিত হইবার আশা আছে। দার্জ্জিলিঙ্গের ইতিহাস অনেকের নিকট অপরিচিত। রাও সাহেব হরিমোহন সান্ন্যাল বাঙ্গলা ভাষায় একখানি দার্জ্জিলিঙ্গের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন,—সে অনেক দিনের কথা; তখন বাঙ্গালী ইতিহাস পড়িবার জন্য ব্যাকুল ছিল না। তাহার পুনর্মুদ্রণ প্রার্থনীয়। "তৈমুর লঙ্গ" একটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ; শেষ না হইলে সমালোচনা চলিবে না। "বিদেশী গল্প" অনুবাদিত প্রবন্ধ; কিন্তু এ গল্পের ইহাই কি প্রথম বঙ্গানুবাদ? "ঐতিহাসিক কাগজ-পত্র"গুলি পণ্ডিত শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্করের সংগৃহীত মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিবরণের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ;"এরূপ কাগজপত্র" প্রকাশিত হওয়া প্রার্থনীয়। সাহিত্যে উদ্ভিদ্বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় 'সাজি' 'ডালি' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া উদ্ভিদ্বিদ্যাপ্রীতির পরিচয় দিয়া থাকেন;—তাঁহার পত্রে এই প্রয়োজনীয় বিদ্যার আলোচনা দেখিয়া সুখী হইলাম। ইংরাজী ছাড়িয়া দিয়া সহজে বাঙ্গালীকে বোধ হয় এই বিদ্যা শিখাইবার উপায় নাই; তাই লেখক ইংরাজীর বুক্‌নী প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্য এই পথে অগ্রসর হইলে বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরাজীতে উদ্ভিদ্বিদ্যা অধ্যয়ন করাই হয়ত সহজ হইবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাবে বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা করা কঠিন; কিন্তু বাঙ্গলায় কি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গঠিত হইতে পারে না? আর কিছু না হউক— উদ্ভিদ্বিদ্যার পরিভাষা বাঙ্গলায় গঠিত করার চেষ্টা করা উচিত। ধান্যবৃক্ষের দেশে শ্বেতসার বলিয়া Starch এর অনুবাদ করিলে কেহ বুঝিবেন কি? সাহিত্যে "মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়" একটিমাত্র পৃষ্ঠা— যেন নিতান্তই কৃপণতা!

নব্যভারত।

(কার্ত্তিক, ১৩০৭)

"বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্ম" প্রবন্ধে গৌতম বুদ্ধত্বলাভের জন্য যে সকল বিচিত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে কোনই বিশেষত্ব নাই। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত"— প্রকৃতই কথা-অমৃত! অমৃত বোধ হয় কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না,—একাধিক পত্রিকায় একই বিষয় সন্নিবেশিত

হইতেও দেখা যায়। "সাবিত্রী-তত্ত্ব (সমালোচনা)", শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরি-লিখিত। সাবিত্রী-তত্ত্ব প্রকাশিত হইবার পর হইতে সাপ্তাহিক পত্রে অনুকূল প্রতিকূল- উভয়বিধ মতের পরিপোষক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে। মাসিক পত্রে ইহার আলোচনা এই সর্ব্বপ্রথম হইল বলিয়া মনে হয়। চন্দ্র-নাথ বাবুর সেই উৎকট "আর্য্যামীর" বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে গিয়া ক্ষীরোদ বাবু যেরূপ সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। আর্য্যামীর পাণ্ডাদিগের কাণে কাণে আমরা একটা সুপরামর্শ দিতে চাই,— ক্ষীরোদ বাবুর একটি পুত্র বিলাত গিয়াছেন, ভয় নাই, তাঁহাদেরও সৎসাহস (?) দেখাইবার একটা মহা সুযোগ আছে !! "ইউ-রোপীয় মহিলার পতিপ্রেম ধর্ম্মমূলক নহে"— এ বিশ্বাস শুধু চন্দ্রনাথ বাবুর নহে; ইহা এ দেশের একটি আধুনিক গুজব ! শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রবন্ধান্তরে এই গুজবের খণ্ডন করিয়াছেন। সাবিত্রী তত্ত্ব-পাঠক আমাদের জনৈক বন্ধু বলেন,- "সাবিত্রী-তত্ত্ব = সবেত্র তত্ত্ব !!" রামচন্দ্রের গুণানুকীর্ত্তন করিতে বসিয়া শকুনির পৃষ্ঠে এরূপ অনাবশ্যক বেত্রাঘাত কেন ? ক্ষীরোদ বাবু সত্যই বলিয়াছেন, "হিন্দুসমাজের গুণাগুণের কথা বলিতে অন্য সমাজের সহিত তুলনা করিবার প্রয়োজন সামান্য ছিল।" "নীতির মূলতত্ত্ব কি" সন্দর্ভটি অতি উপাদেয়। "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা" নামে নব্যভারতে মধ্যে মধ্যে যে সকল কবিতা বাহির হয়, তাহার সকল গুলিই যে কবিতা তাহা বলা যায় না। কাহারও জন্ম অথবা মৃত্যু হইলে তাহা সরকারীতে এতালা দেওয়া আত্মীয়বর্গের অবশ্যকর্ত্তব্যঃ— নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয়ও যেন সেইরূপ রেজেষ্ট্রী খাতা খুলিয়া বসিয়া আছেন, ছোটবড় যে-কোন কবির কে কোথায় মরিতেছে বা জন্মিতেছে,- তৎসংবাদ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার খাতায় উঠিতেছে ! "খুকুমণি", ও "স্মরণার্থ" শীর্ষক পদ্যদুটি ইহার এক একটি সুন্দর উদাহরণ ! অবশ্য, কাহারও শোক কিংবা হর্ষ প্রকাশে বাধা দিবার আমাদের অধিকার নাই; কিন্তু এই শ্রেণীর কবিতার উৎপাতে বঙ্গগীতিকাব্য-পল্বল যে নিতান্তই পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে,- এ কথা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই।

——o——

গৃহলক্ষ্মী।

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে, হে নারি,
কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি'
আপন চরণপ্রান্তে, তুমি মুগ্ধচিতে
মগ্ন আছ আপনার গৃহের সঙ্গীতে।
স্তবে তব নাহি কাণ, তাই স্তব করি,
তাই আমি ভক্ত তব। অনিন্দ্য সুন্দরি,
ভুবন তোমারে পূজে, জেনেও জাননা;
ভক্ত-দাসীসম তুমি কর আরাধনা
খ্যাতিহীন প্রিয়জনে। রাজ-মহিমারে
পরশ-গৌরবে তব পার করিবারে
দ্বিগুণ মহিমান্বিত; সে সুন্দর করে
ধূলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে;—
সেই ত মহিমা তব, তোমার গরিমা,
সকল মাধুর্য্য চেয়ে তারি মধুরিমা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কব্‌রেজ মশা'য়।

—০—

কালাচাঁদ তার বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান, সবেধন নীলমণি, তায় আবার সে শেষ বয়সের ছেলে; আত্মীয়ের আদরে, কুটম্বের যত্নে, প্রতিবেশীর সোহাগে কালাচাঁদ দিন দিন কলায় কলায় পূরিতে লাগিল, দেখিয়া পিতা মাতার প্রফুল্ল হৃদ্‌পদ্ম নাচিয়া উঠিল।

কালাচাঁদ নামটী নিরর্থক নহে, শুনিয়াছি, নাকি ঐ নামের ভিতরে কি একটা গভীর বৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত আছে। কালাচাঁদের রং কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ ঘোর, কিন্তু ঠিক বার্ণিশ নহে, মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলেরই অনুরূপ! সুগোল মসৃণ মুখ খানি দেখিলে মনে হয়, কবির উপমা নিতান্ত অমূলক নহে। সত্যই যেন সে মুখ খানি দেখিয়া "কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে"।

কালাচাঁদ যখন হামা গুড়ি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে শিখিল, দাঁড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল, তখন বাস্তবিকই সে দৃশ্য অদ্ভুত মনে হইয়াছিল! কবির ভাষায় উপমা সহিত বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয়, যেন গুজরাটী হস্তিশাবক পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে মনুষ্য-শিশুরূপে বঙ্গভূমে ভ্রমিতেছে! ডারুইনের কল্যাণে বোধ হয়, শুঁড়টীর আর কোন কৈফিয়তই দিতে হইবে না।

কালাচাঁদের বাল্য-জীবন রহস্যসঙ্কুল—পঙ্কিল বলিতেছি না—আমরা তাহা ভেদ করিতে পারি নাই! চন্দ্রের কৃষ্ণ পক্ষের মত কালাচাঁদের সে জীবন পরিচ্ছেদ ঘোর অন্ধকারময়! তাহার শুক্ল পক্ষের জীবন আলোকই সাধারণে প্রকাশ! আমরা সেই অংশেরই আলোচনা করিব।

বিংশতি বর্ষীয় কালাচাঁদ কলিকাতায় উমেদার। পরের বাসায় থাকিয়া বিবিধ কষ্ট সহিয়া, বিস্তর হাঁটাহাটি করিয়া অনেক মুরব্বি ধরিয়া, কালাচাঁদ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না! এনট্রান্স পাশ, অন্ততঃ ইংরাজিতে

মোটামোটি জ্ঞান ভিন্ন কোন আফিসেই ঢুকিবার সুবিধা নাই, সুতরাং ম্লেচ্ছভাষা-বিদ্বেষী কালাচাঁদকে কলিকাতা সহরে চাকরীর চেষ্টায় ইস্তাফা করিতে হইল! কিন্তু পৃথিবীতে কিছুই বৃথা যায় না, সুতরাং কালাচাঁদের উমেদারীর ব্যর্থ চেষ্টার কালও নিতান্ত বৃথায় গেল না! নানা স্থানে ঘুরিয়া, নানা লোকের সহিত পরিচয় করিয়া, কালাচাঁদ নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল!

কালাচাঁদ কলিকাতায় যে বাসায় থাকিয়া উমেদারী করিত, তাহার নিকটে একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন, তাঁহার ঔষধালয়টী প্রকাণ্ড, ঔষধের কাটতিও যথেষ্ট! কালাচাঁদ অধিকাংশ সময়েই সেই ঔষধালয়ের কর্ম্মচারীদের নিকট উপস্থিত থাকিয়া তাম্রকূটের ধূম্রের সহিত, বিবিধ গল্প গলাধঃকরণ করিত! আর সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ প্রস্তুত এবং কার্য্যপ্রণালীও বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিত। এইরূপে কিছু দিন যায়, ক্রমে স্বয়ং কবিরাজ মহাশয়ের সহিত কালাচাঁদের পরিচয় হইল, পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় এবং ঘনিষ্ঠতা ক্রমে আত্মীয়তায় দাঁড়াইল! কালাচাঁদ সুবিধা পাইলেই আপনার অবস্থার কথা কবিরাজ মহাশয়কে শুনাইত। সহৃদয় কবিরাজ মহাশয়, ছলছলচক্ষুঃ কালাচাঁদের বিষণ্ণ মুখে, তাহার নিষ্ফল প্রয়াসের কথা বিশেষ সহানুভূতির সহিত শুনিতেন! স্নেহ পরবশ হইয়া তিনি স্বয়ংও কোথাও কোথাও কালাচাঁদের জন্য অনুরোধও করিতেন, কিন্তু কালাচাঁদের ভাগ্যক্রমে,—ভাল কি মন্দ বলিতে পারি না—এত চেষ্টা এত পরিশ্রম সকলই বিফল হইল! চাকরীর কর্ম্মভোগ বুঝি বিধাতা কালাচাঁদের কপালে লিখেন নাই! এইরূপে নিরাশার জলদজালে কালাচাঁদ অন্ধকার দেখিতেছিল, সহসা একটা বিদ্যুতের আলোয় সে আপনার গন্তব্য পথ দেখিতে পাইল! সহসা কালাচাঁদ এক দিন সময় বুঝিয়া, কবিরাজ মহাশয়কে ধরিয়া বসিল। "আপনি অনুগ্রহ না করিলে আমার আর উপায় নাই" ইত্যাদি কাতরোক্তিতে কবিরাজ মহাশয়কে সে বিচলিত করিয়া তুলিল। দয়ার্দ্রচিত্ত কবিরাজ মহাশয় হৃদয়ের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমার দ্বারা যাহা সম্ভব, তোমার জন্য আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" কবিরাজ মহাশয়ের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে কালাচাঁদ বলিল,

"আমাকে আপনার ছাত্র করিয়া লইতে হইবে।" কালাচাঁদকে ছাত্র! কবিরাজ মহাশয় ত আকাশ হইতে পড়িলেন! সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বৈদ্য-সন্তান না হইলে কবিরাজ মহাশয় কাহাকেও 'ছাত্র' রূপে গ্রহণ করেন না। তখন অতিমাত্র-বিস্মিত কবিরাজ মহাশয় কায়স্থকুলতিলক কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংস্কৃত কিছু জানা আছে কি?" কালাচাঁদের উত্তর "ফলেন পরিচিয়তে"! যদিও ব্যাপার বুঝিতে তাঁর বাকী রহিল না, তথাপি সত্যপ্রতিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় একটু হাঁসিয়া এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কালাচাঁদকে আর পায় কে? শুভ দিনে শুভক্ষণে কালাচাঁদ পাঠ আরম্ভ করিল। মাস কয়েক যাইতে না যাইতে কবিরাজ মহাশয় দেখিলেন, শাস্ত্র সম্বন্ধে, তা যে কোন শাস্ত্রই হোক না কেন, কথা উঠিলেই কালাচাঁদ পরম বিজ্ঞের মত তাহাতে টিপ্পনি কাটিত! ভাল মানুষ কবিরাজ মহাশয় এক দিন হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, "কালাচাঁদ আমাদের শাস্ত্র না পড়েই দেখ্‌ছি শাস্ত্রী হ'য়ে উঠেছে!" আর যাবে কোথা? কালাচাঁদ অমনি গল-লগ্নীকৃতবাসে গুরুদেবের চরণে প্রণত হইয়া বলিল, "উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে—তথাপি গুরুবাক্য অন্যথা হয় না! শ্রীমুখ হইতে আমার ভাগ্যে যে 'উপাধি' নির্গত হইয়াছে, তাহাই আমাকে অর্পিত হোক!" কবিরাজ মহাশয় হো হো হাঁসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তথাস্তু"। কালাচাঁদ এখন আর শুধু কালাচাঁদ নহে, শাস্ত্রী কালাচাঁদ! তখন হইতে কবিরাজ মহাশয়ের পরিচিত সকলেই তাহাকে "শাস্ত্রী" বলিয়া ডাকিতেন! আমরাও এখন হইতে কালাচাঁদকে "শাস্ত্রী" বলিব! এই মানহানির মোকর্দ্দমার দিনে মান বাড়াইয়া মান রাখাই ভাল!

* * * * *

কালাচাঁদ, কবিরাজ কালাচাঁদ শাস্ত্রিরূপে অচিরাৎ তাঁহার জন্মভূমিতে দেখা দিলেন! তথায় বৎসর দুয়ের মধ্যেই কিঞ্চিৎ অর্থ লাভের সঙ্গে সঙ্গে 'বৈদ্য'রূপে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন! কিন্তু 'চিকিৎসক' নামে—শত মারি ভবেৎ বৈদ্য, সহস্র মারি চিকিৎসক—এমনটী যেন কেহ মনে করিবেন না,—প্রকৃত চিকিৎসক নামে প্রখ্যাত হইতে দেশে বড় বিলম্ব বুঝিয়া, শাস্ত্রী কালাচাদ কলিকাতায় গিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করাই স্থির

করিলেন! বিশেষ অল্প দিন হইল, তাঁহার গুরুদেব কবিরাজ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন, এক্ষণে কলিকাতায় কিছু সুবিধা হইবে. এ ধারণাও তাঁর জন্মিয়াছিল। গুরুদেবের অবর্ত্তমানে নিরঙ্কুশ ভাবে বিদ্যা জাহিরের জন্য কালাচাদ কলিকাতায় আসিতেছেন, এ কথা ভাবিতেও পাপ স্পর্শে, কেবল গুরুদেবের 'গশারে' বসিতেই কালাচাদের কলিকাতায় আগমনের বাসনা।

কালাচাদের কয়েক জন আত্মীয় কলিকাতায় কাজ করিতেন, তাঁহারা একটী বাসা ভাড়া লইয়া মেস্ করিয়া থাকিতেন। বাসার নীচে, বাহিরের দিকের ঘরটী ছোট না হইলেও তাঁহাদের কোন ব্যবহারে আসিত না। কালাচাদ অতি সুলভে সেই ঘরটী ভাড়া করিয়া মেসের মেম্বরভুক্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ঘরটীর শ্রী যেন ফিরিয়া গেল। সম্মুখের দুই দরজায় সারসি বসিল, ভিতরের দেওয়াল পেনটিংয়ে সুশোভিত হইল, কড়িতে টানা পাখা ঝুলিল। আর আলমারি, গ্লাস কেস্, ঔষধের শিশি, তৈলের বোতল, মদকের জার প্রভৃতি শূন্য ঘরখানি পূর্ণ করিয়া দিল। গৃহ প্রবেশের পথে, সম্মুখের দেওয়ালে প্রকাণ্ড এক সাইনবোর্ড; তাহাতে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত "ধন্বন্তরী ভৈষজ্যালয়"। ভিষকাচার্য্য স্বয়ং স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ "— ——" কবিরাজের প্রিয় ও প্রধানতম ছাত্র কবিরাজ কালচাদ শাস্ত্রী। কলিকাতায় বসিতে না বসিতে টিকির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নানা ফন্দিও কালাচাদের উর্ব্বর মাথায় গজাইয়া উঠিয়াছিল। গুম্ফ শ্মশ্রুর রেখা জ্যামিতির 'বিন্দুর' মাত্রায় হইলেও কালাচাদ তাহা মুণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। দুষ্ট লোকে বলিত, এটা কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ কালাচাদের পক্ষে বাজে খরচ। এখন কালাচাদের বেশ হইল, গায়ে লংক্লথের চাদর, পরণে-৪৯,-"বাই"নহে—রেলি। চরণে তালতলা, অবশ্য চটি।

বাসার নিকটে ছ্যাকরা গাড়ির আড্ডা, গাড়োয়ানদের সহিত কালাচাদের কি বন্দোবস্ত জানি না, দুই এক খানি গাড়ি সর্ব্বদাই ভৈষজ্যালয়ের সম্মুখে অপেক্ষা করিত, কিন্তু ছুটো ভাড়া পাইলেই আবার চলিয়া যাইত। এদিকে সজ্জিত কালাচাদ ঔষধালয়ে সর্ব্বদাই এমন ব্যস্ত ভাবে থাকিতেন যে, আগন্তুক তাঁহাকে দেখিলেই মনে করিত কবিরাজ মহাশয় এখনই বুঝি

ঐ গাড়ীতে কোন 'কলে' যাইবেন। তা 'কল' থাক বা না থাক, ফল হোক আর নাই হোক, কালাচাঁদের গাড়ী চড়ার কামাই ছিল না। করধৃত ইংরাজি সংবাদপত্রে নয়ননিবিষ্ট কালাচাঁদ ঔষধের বাক্স সম্মুখে রাখিয়া কলিকাতার নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেন, আর গাড়ী হইতে নামিয়া ত্রস্তগতিতে ঔষধালয়ের প্রবেশ দ্বারে বিলম্বিত শ্লেটে লিখিত নামের দুই চারিটা কাটিয়া দিতেন! গোটাকত নূতন নাম সংযুক্ত হইত! এই প্রকারে কালাচাঁদের কাজ না থাকিলেও অবসরমাত্র ছিল না! গাড়ী হইতে নামিয়াই অপরাহ্নে পুঞ্জীকৃত পুঁথির মধ্যে বসিয়া কালাচাঁদ দুই তিনটী ছাত্রকে পাঠ দিতেন! যদিও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি কালাচাঁদের ভক্তি বড় প্রবলা, এবং বাছিয়া বাছিয়া "বড় লোক ঘেঁষা" পণ্ডিতকে তিনি মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রণামীও প্রদান করিতেন, তথাপি ছাত্রদের পাঠ দিবার সময় পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রবেশ নিষেধ ছিল! কারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বড়ই গোলযোগ করেন, তাহাতে পঠনক্রিয়ার ঐকান্তিক ব্যাঘাত জন্মে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছাড়া কয়েক জন নবযুবককেও কালাচাঁদ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাহারাও প্রতিদানে গৌরকার্য্য করিতে করিতে গল্পচ্ছলে পাড়ায় পাড়ায় শাস্ত্রী কবিরাজের সুচিকিৎসা, পাণ্ডিত্য ও দয়া দাক্ষিণ্যের অশেষ সুখ্যাতি করিয়া বেড়াইত। বাস্তবিক শাস্ত্রীর দয়া দাক্ষিণ্য নিতান্ত "অসামান্য" ছিল না। প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত দাতব্য ঔষধ বিতরণ ত ছিলই, তাহার উপর স্থান বিশেষে অবস্থা বুঝিয়া কেবল ডাকমাশুল অর্থাৎ গাড়ী ভাড়ার ১।৹ পাঁচ সিকা, কি ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র লইয়াই কবিরাজ মহাশয় Single fairএ double journey— দুই বারও রোগীর গৃহে গমন করিতেন।

*　　*　　*　　*　　*

নব বর্ষে কবিরাজ শাস্ত্রী মহাশয়ের অমূল্য-বিতরণের জন্য পত্রিকা বাহির হইল। তাহাতে অপূর্ব্ব ঔষধ ও তৈলাদির বিজ্ঞাপন! পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই সর্ব্বরোগ-(রোগী নয়) সংহারিণী মহাশক্তি সালসার কথা! আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া, রোগিবৃন্দকে অভয় দিবার জন্য অভয়া মহাশক্তির প্রসাদে এই সুধা শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। শাস্ত্রীর

মেছের কেহ কেহ কিন্তু বলিতেন---ও শুধু অনন্তমূল আর "পটাস" বিশেষে প্রস্তুত! তা সে কথা ছাড়িয়া দাও এ সব ত নিন্দকের রটনা। তার পর "বিশল্য করণী"র কথা। সর্ব্বপ্রকার অম্ল ও শূল নিবারিণী (ব্যাকরণ দোষ ধরিবেন না, এসব শাস্ত্রীর আর্ষপ্রয়োগ) বটিকা ও প্রলেপ! এ বিজ্ঞাপনেরও একটু নমুনা দি। "যে বিশল্যকরণী রাবণের শক্তিশেলে মৃত্যুমুখে পতিত লক্ষ্মণকে জীবন দান করিয়াছিল, এ সেই বিশল্যকরণী! কলিতে শক্তি-শেল স্বরূপ অম্লশূল হইতে মনুষ্যগণকে রক্ষা করিতে শাস্ত্রী স্বয়ং বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ গন্ধমাদন আলোড়িত করিয়া এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন।" ইহা ছাড়া এই কল্পতরু পুস্তকে নবজ্বর, পুরাতন জ্বর, হিষ্টিরিয়া, বাত, প্রভৃতি যাবতীয় পীড়া অমোঘ ঔষধের বিজ্ঞাপন ত আছেই!

কিন্তু সব চেয়ে বিজ্ঞাপনের বাহার "পারিজাত রস তৈলের"! ঐ তৈলের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয় অপারগ হইয়া লিখিয়াছেন, আকাশমণ্ডলের তারকা রাশি, সমুদ্র তীরের বালুকা, হিমালয়ের উপলখণ্ড গণনা করা বরং সম্ভব, তথাপি ইহার গুণের সংখ্যা করা যায় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতার দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া যে পারিজাত,--একটী মাত্র পারিজাত আনিয়া মহিষীর মন রাখিয়াছিলেন, এ সেই অমরবাঞ্ছিত পারিজাত পুষ্পের সার ভাগের তরল অংশের রাসায়নিক সংযোগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, দার্শনিক মতে প্রস্তুত! গ্রাহক, তোমায় কিন্তু ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না, স্বর্গে উঠিবার কষ্টও সহিতে হইবে না, সুদর্শন চক্রের সাহায্য লইতে হইবে না, কেবল একটীমাত্র রৌপ্য চক্রের বিনিময়ে এ অমূল্য তৈল সংগ্রহ কর! ঘরে বসিয়া এহেন সুলভে গৃহিণীর মনস্তুষ্টি করিতে বিরত হইও না, কেননা, শাস্ত্রে বলে, "তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট!"

তুমি কেরাণী, আপিসের বড় সাহেব যদি তোমার প্রতি সহসা ক্ষিপ্ত হন, তবে তাঁহার সবুট গৌর চরণে আর সরিষার তৈল মর্দ্দনের প্রয়োজন হইবে না, এক শিশি--শুধু এক শিশিমাত্র পারিজাত তৈল তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেই তিনি 'জল' হইয়া যাইবেন, তখন তুমি অনায়াসেই সেই সুখের সাগরে হাবুডুবু খাইতে পারিবে। হে গ্রাহক, ইহার তুল্য তৈল

কখনও আবিষ্কার হয় নাই,' কি সৌরভে, কি গৌরবে কে এর তুলনা হবে! ইহার দ্বিতীয় নাই---"নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দ নামে!"

এই তৈলের প্রশংসা পত্রের সংখ্যা করা যায় না। 'কল্পনা' গ্রামের পঞ্চায়তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অসত্যবাদী মণ্ডল স্বহস্তে লিখিয়াছেন "শাস্ত্রী মহাশয়, আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, জানি না। বাস্তবিকই আপনার পারিজাত রসের অশেষ গুণ, ইহা যে কেবল মানব জাতির শরীরের ও মনের স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, তাহা নহে, ইহা দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধনাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। সম্প্রতি আমার একটী গোবৎস দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়াছিল, কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই, শেষে আমার দুই বৎসরের কন্যাটি তাহার স্বাভাবিক উপস্থিত বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে একটু পারিজাত রস গোঁজে দিবামাত্র, কোথা হইতে হাম্বা হাম্বা রবে গোবৎসটি সেই গোঁজের নিকট আসিয়া, অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দড়িগাছটি আপনি গলায় দিল। কি স্বাভাবিক আকর্ষণ! আপনার কথা ঠিক জলন্ত সত্য! কবিরাজ মহাশয়, আপনি প্রকৃতই কলির ধন্বন্তরী, যথার্থই মর্ত্তের অশ্বিনীকুমার যুগল! মহাদেব আপনার মঙ্গল করুণ।"

এমন একখানি নয়, দুই খানি নয়, শত শত প্রশংসা পত্র! কেবল বাঙ্গালী নয়, হিন্দু নয়, মেটেবুরুজের নবাবসৌধ-সন্নিকটস্থ পশ্চিম-দেশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান এমন কি, সুদূর চুণাগলির বিশিষ্ট ইংরাজ মহিলাগণও এ তৈল ব্যবহারে মুগ্ধ। কিন্তু কি দুর্ব্বিপাক---যেমন কুসুমের কীট, চন্দ্রের কলঙ্ক আলোকের ছায়া চিরসঙ্গী তেমনই এ পারিজাত রসেও ভেল সঙ্গী বাহির হইল। ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার জন্য হোক আর না হোক দুষ্টের দমন জন্য শাস্ত্রী মহাশয় জালিয়াতদের নামে দুই নম্বর নালিশও করিয়াছিলেন কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের কেমন সহৃদয়তা ও পরদুঃখকাতরতা, এই মোকদ্দমার আসামী পক্ষের সমস্ত ব্যয় এমন কি তাহাদের অর্থদণ্ডের ভারটাও তিনি স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। এদিকে আবার শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্ম এতই নিষ্কাম যে তাঁহার এ দানের কথা পরম আত্মীয়দিগকেও তিনি জানিতে দেন নাই। নিজের উকীলকেও নহে! কিন্তু এ সংসারে যাহার উপকার করা যায় সেই নাকি অকৃতজ্ঞতা দেখায়, উপকারী বন্ধুর নিন্দা করিয়া বেড়ায়, তাই বুঝি

কালাচাঁদের এই মহত্ত্ব বিকৃত ভাবে রূপান্তরিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে।

তা যাই হোক, কালাচাঁদ এই প্রকার উদারতা, সহৃদয়তা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই সুদূর মফঃস্বলেও সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর মফঃস্বল হইতে "কল" আসিতে আরম্ভ হইল। দুষ্ট লোক বলে জেলায় জেলায় শাস্ত্রীর দালাল ঘুরিয়া বেড়ায়! তা সে কথায় কর্ণপাত না করাই ভাল। এখন শাস্ত্রীর মফঃস্বলের চিকিৎসা-প্রণালীর একটু আলোচনা করা যাক্! যশোহরের কোন পল্লী-গ্রামে এক ধনী গোপনন্দন পুরাতন জটিল পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন, স্থানীয় কবিরাজের চিকিৎসায় শীঘ্র সুফল ফলিতেছিল না, কি সুযোগে কালাচাঁদ এ সংবাদ অবগত হইয়া রোগী "ক্রবণ" করিয়া সশরীর তথায় উপনীত হইলেন! রোগীর গৃহে পৌঁছিয়াই শাস্ত্রী অতি যত্নের সহিত স্থানীয় কবিরাজের মুখে তাঁহার কৃত ব্যবস্থার বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন! সেই ব্যবস্থার মধ্যে "পঞ্চকোল" ছিল। পঞ্চকোলের নাম শ্রবণ মাত্রেই শাস্ত্রী গম্ভীর ভাবে,

"পঞ্চকোলেন কোলেন
ভুক্তা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ"

শ্লোক আওড়াইয়া বলিলেন এ ব্যবস্থাটা অবশ্য শাস্ত্রোক্ত বটে, কিন্তু কি জানেন কবিরাজ মশায়, সকল সময় কেবল পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিলে চলে না, তা আপনার দোষই বা দিব, প্রথম প্রথম ও রোগটা আমাদেরও ছিল, হা, হা, বুঝেছেন কিনা, সকল বিষয়েই কিঞ্চিৎ, ওর নাম কি, বুদ্ধি বিবেচনার দরকার, হা, হা, হাঁ, কইরে আমার বাক্সটা নিয়ে আয় ত! তার পর কালাচাঁদ হোমিপ্যাথিক গ্লোবিউলের মত কয়টা বটিকা বাহির করিয়া বলিলেন যে, যে ঔষধ ব্যবহার হইতেছিল, তাহা সহসা বন্ধ করার প্রয়োজন নাই, তবে সেই ঔষধ সেবনের এক এক ঘণ্টা পরে এই বটিকার এক একটী সেবনীয়। একের পৃষ্ঠে শূন্যের ন্যায় এই বটিকা পূর্ব্ব ঔষধের কার্য্যকারিতা, দশ গুণ বৃদ্ধি করিবে। গ্রাম্য কবিরাজ মহাশয়

শাস্ত্রীর অভিনব শাস্ত্রজ্ঞান এবং চিকিৎসা প্রণালী দর্শনে অবাক হইতে-ছিলেন, এমন সময় শাস্ত্রী মহাশয় আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "এক্ষণে পথ্যাদি সম্বন্ধে আপনি কি বিবেচনা করেন? উত্তরে মাগুর মৎস্যের ঝোলের কথা শুনিয়া শাস্ত্রী "আরে রাম রাম কবিরাজ মহাশয় বলেন কি, মদ্গুর মৎস্য কি এ অবস্থায় দেওয়া যাইতে পারে"—বলিয়া 'তারস্বরে' গ্রাম্য কবিরাজের ভীতির এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বিস্ময়ের মাত্রা অতিমাত্র বৃদ্ধি করিয়া শ্লোক আয়োড়াইতে লাগিলেন,

রোহিতে মোহিতঃ পিতঃ
মদ্গুরে মদ্গুরো প্রিয়ঃ
শকুলে আকুলা ভার্য্যা
কবজী মম জীবনঃ—

শুনিলেন কবিরাজ মহাশয়, শাস্ত্রের বচন ত শুনিলেন? এ ক্ষেত্রে, কবজী কিনা কৈ মৎস্যের ঝোলই প্রশস্ত!"

ইহার পর হইতে এ অঞ্চলে সাধারন লোকের মুখে "কব্‌রেজ ত কল্-কাতার কালাচাঁদ",— একটা প্রবাদের মত হইয়া পড়িল! সুযোগ ও সময় বুঝিয়া কলিকাতার গুণগ্রাহী সংবাদপত্র-'মধুকর' গুন্ গুন্ রবে কালাচাঁদের গুণগানে মন দিলেন। আর এইরূপে দিনে দিনে শাস্ত্রীর যশোসৌরভে দশদিক আমোদিত হইতে লাগিল!

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

ফা হিয়ান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

অজ্ঞানকে জ্ঞানদান করা, অসভ্যকে সভ্যতা-সোপানে উত্তোলন করা, আত্মসুখ তুচ্ছ করিয়া পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করা,—ইহাতে এমন এক উগ্র উত্তেজনা নিহিত আছে যে, আধুনিক খৃষ্টিয়ানগণ তদ্দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কত দেশে কত বেশে মানবসমাজের কল্যাণ-কামনায় ধাবিত হইয়াছেন। এক সময়ে আমাদের দেশের বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণও এইরূপে উত্তেজিত হইয়া পবিত্র প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন;—তাহার ইতিহাস অতীতের স্বপ্নসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে! খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার বহুপূর্ব্বে ভারতীয় বৌদ্ধমত এসিয়া খণ্ডের জলে স্থলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে অন্যান্য দেশের ন্যায় মহাচীন সাম্রাজ্যেও বৌদ্ধশিক্ষা প্রচলিত হয়। তাহার সহিত সাম্রাজ্যলাভের লোভের গন্ধ মিশ্রিত না থাকায়, তদুপলক্ষে যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা হয় নাই; নিতান্ত শনৈঃ শনৈঃ "সূত্র বিনয় ও অভিধর্ম্মের" শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার ফল অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধমত তিরোহিত হইলেও, অদ্যাপি তিব্বতে চীনে, শ্যামে জাপানে, ব্রহ্মে সিংহলে শাক্য সিংহের শিক্ষা সমাদরলাভ করিতেছে।

শাক্য মতাবলম্বিগণ আপনাদিগকে "শাক্য পুত্র" বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অটল বিশ্বাস, অবিচলিত শ্রদ্ধা ও অদম্য অধ্যবসায় ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে চিরদিন সমাদর লাভ করিবে। এই বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক চৈনিক শাক্যপুত্র জ্ঞান ধর্ম্ম ও

পুণ্যসঞ্চয় কামনায় ভারতবর্ষাভিমুখে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থে বৌদ্ধশিক্ষার বিস্তৃত বিবরণের সঙ্গে ভারতবর্ষের পুরাকাহিনী সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের কৃপায় এই সকল তীর্থযাত্রাকাহিনী ক্রমশঃ সভ্যসমাজে প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা তীর্থযাত্রী নামে কথিত, তন্মধ্যে ফা হিয়ান ও হিয়াঙ্গ থ্‌সঙ্গের নামমাত্রই বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত; কিন্তু তাঁহাদের কথাও নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় না।

বঙ্গসাহিত্য ক্রমশঃ যেরূপ বিপুলতা লাভ করিতেছে, তাহার উন্নতি কল্পে ধনাঢ্য-সম্প্রদায় ক্রমশঃ যেরূপ উৎসাহদান করিতেছেন এবং তাহাকে জ্ঞান গৌরবে সমুন্নত করিবার জন্য সুশিক্ষিত সেবকদল যেরূপ আগ্রহে অগ্রসর হইতেছেন,— তাহাতে আশা হয়, শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশের পুরাকাহিনী সমস্তই সংকলিত হইবে। এই সংকলন কার্য্যে এখন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের গ্রন্থমাত্রই আমাদের প্রধান সম্বল; তদবলম্বনে ফা হিয়ানের জীবনকাহিনী সংকলিত হইল।

যে সকল চৈনিক বৌদ্ধাচার্য্য ভারতবর্ষে তীর্থযাত্রা করেন, তন্মধ্যে ফা হিয়ানকেই ইতিহাসপাঠকগণের পথপ্রদর্শক বলিতে হইবে। তাঁহার ভ্রমণকাহিনী ভারতবর্ষের বিলুপ্ত ইতিহাসের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত করিয়াছে। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতভ্রমণে বহির্গত হন; তৎকালে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে কাহার না কৌতূহল হয়?

ফা হিয়ান জন্ম গ্রহণ করিবার বহুপূর্ব্বে চীন দেশে বৌদ্ধমত প্রচারিত হয়।* মহাচীন সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইলেও, একালের

---

* Buddhist books began to be imported into China during the closing period of the first century of our era.—*Dr. Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I. Introduction.*

ন্যায় সেকালেও সহজে চীন সাম্রাজ্যে উপনীত হইবার উপায় ছিল না। চীনের পশ্চিমাঞ্চলে মরুভূমি, পূর্ব্বাঞ্চল সমুদ্রবেষ্টিত;— সমুদ্রপথে গমনাগমন করা ভিন্ন স্থলপথে সেদেশে ধর্ম্মপ্রচারে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদনিবাসী শ্রেষ্ঠী ও নাবিকগণ সমুদ্রযাত্রায় পারদর্শী বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এখন হিন্দু সমুদ্রযাত্রার নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকে এ কথায় আস্থাস্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারত ও প্রশান্ত সমুদ্রবেষ্টিত সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের পুরাতন ইতিহাসে, ধাতু ও প্রস্তরখোদিত প্রাচীন লিপিতে, দেব মন্দির ও দেবমূর্ত্তির গঠনকৌশলে, ভাষা সাহিত্য ও লোকাচারে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই যে ভারতীয় নাবিকবর্গ নানা দিগ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তাহাও বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব নাই। এই সমুদ্রযাত্রার কাহিনীর সহিত, বঙ্গোপসাগর-তীরস্থ পুরাতন তাম্রলিপ্তির ইতিহাস চির-সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাম্রলিপ্ত হইতে তিনটি বিভিন্ন জলপথে ভারতীয় অর্ণবযান ধাবিত হইত;— পূর্ব্বপথে আরাকান বন্দরের নিকট দিয়া, পশ্চিম পথে কলিঙ্গোপকূলের নিকট দিয়া সিংহল স্পর্শ করিয়া, ও দক্ষিণ পথে মহাসমুদ্রের মধ্য দিয়া কামলঙ্কা অতিক্রম করিয়া বহুসংখ্যক অর্ণবপোত সুমাত্রার সুবিস্তৃত বন্দরে সমবেত হইত। এই বন্দর তৎকালে "শ্রীভোজ" নামে পরিচিত ছিল;— তথায় অদ্যাপি অনেক পুরাকাহিনীর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীভোজ হইতে পোত সকল উত্তরাস্যে অগ্রসর হইয়া আনামের উপকূল অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্যের ক্যান্টন নগরে উপনীত হইত, এবং পূর্ব্বাস্যে অগ্রসর হইয়া দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিত। এই পুরাতন বাণিজ্যপথেই দ্বীপে দ্বীপে বৌদ্ধমত প্রচারিত হয়, এবং চৈনিক বাণিজ্যের সঙ্গে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশলাভ করে। তৎকালে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলেও সমুদ্রযাত্রার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিন্ধু ও গুর্জ্জর হইতে অর্ণবপোত পারস্যে আরবে ও মিশরে ধাবিত হইত, মালাবর উপকূল হইতে সিংহলে এবং সিংহল হইতে আরবে বাণিজ্য ভাণ্ডার বহন করিত। স্থলপথে গান্ধার ইরাণ তুরাণ অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগরতীর পর্য্যন্ত বাণিজ্যভাণ্ডার

বাহিত হইত। এই পুরাতন বণিজ্যপথের নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশে ও সমস্ত দ্বীপেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী বাণিজ্যবিস্তারের সুপরিচিত পথ অবলম্বন করিয়াই যে বৌদ্ধ প্রচারকবর্গ নানা দিগ্দেশে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের বর্ত্তমান প্রণালী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পুরাতন প্রণালীর বহুবিষয়ে পার্থক্য ছিল। যোগযুক্ত মুক্তপ্রাণ সংসারাশক্তিশূন্য শাক্যপুত্রগণ কেবলমাত্র মানবহিতার্থেই প্রচারব্রত গ্রহণ করিতেন, তাহার সহিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের বাণিজ্য বা রাজ্যবিস্তারের গুপ্ত সংকল্প সংযুক্ত রহিত না! বৌদ্ধসন্ন্যাসীর ভক্তি বিশ্বাস ও অধ্যবসায়, তাঁহার প্রশান্ত বদনজ্যোতিঃ ও জ্ঞানোজ্জ্বল স্নিগ্ধ দৃষ্টি, এবং সর্ব্বহিংসা বিরহিত সাম্য মৈত্রীর শান্ত সৌম্য বেশ সংস্কই তাহার প্রতি লোকচিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইত। জীবনগত পবিত্রাচার এবং চরিত্রগত সাধু ব্যবহারেই বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধমতের সঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্রও সর্ব্বত্র অধীত হইতে আরম্ভ করে। তত্রূপনাঙ্ক যাহাদের ভাষা ও সাহিত্য ছিল না, তাহারা ভাষা ও সাহিত্য পাইয়াছে, যাহাদের ভাষা ও সহিত্য ছিল তাহারা ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদে স্বদেশের সাহিত্যের উন্নতিসাধনে সক্ষম হইয়াছে। এই পুরাতন বাণিজ্যপথের কোন্ কোন্ স্থলে ভাষা ও সাহিত্য ছিল না, এবং কোন্ কোন্ স্থলে ভাষা ও সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্য সংশ্রবে সমুন্নত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভাষা ও সাহিত্য ছিল না— কেবল কথোপকথনের রীতিই প্রচলিত ছিল, তথায় ক খ গ ঘ প্রচলিত হইয়া সংস্কৃতের আদর্শে লিখিত সাহিত্য সমুদ্ভূত হইয়াছে। চীন সম্রাজ্যে ভাষা ও সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, তথায় চৈনিক ভাষায় ভারতীয় বহুগ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে।

ফা হিয়ান জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই এইরূপে মহাচীনে সংস্কৃত ও পালি ভাষার চর্চ্চা প্রচলিত হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধশাস্ত্রাদি অনুবাদিত হইয়া লোক সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে জন সাধারণের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারিত হইলেও, পণ্ডিতসমাজের কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইত না। ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতীয় বিপুল সাহিত্য অধ্যয়ন করা ও

তদুপলক্ষে পুণ্যতীর্থ পরিভ্রমণ করিবার আশা বহুসংখ্যক চৈনিক শাক্যপুত্রের হৃদয়ে প্রবল উত্তেজনা উপস্থিত করিয়াছিল। ফা হিয়ান তরুণ জীবনে এই উত্তেজনা লাভ করিয়া ভারতভ্রমণে বহির্গত হইবার সময়ে সন্ধান পাইয়া আরও কতিপয় চৈনিক যুবক তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই স্বদেশে বৌদ্ধশিক্ষায় সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

তৎকালে ভারতীয় বৌদ্ধমত মহাযান ও হীনযান নামক দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এবং সমগ্র বৌদ্ধাচার অষ্টাদশ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধের বাদ প্রতিবাদে যেরূপ কলহ বিবাদের সৃষ্টি হইত, মহাযানীর সহিত হীনযানীর বাদ প্রতিবাদও সেইরূপ গৃহবিবাদের সূচনা করিয়াছিল। মহাচীনের শাক্যপুত্রগণ ইহা অবগত ছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের নিকট সাগরমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জ অপেক্ষা মধ্যএসিয়ার সুসভ্য জনপদ বৌদ্ধশিক্ষার সমুন্নত ক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত ছিল। তাঁহারা তজ্জন্য সমুদ্র পথ পরিত্যাগ করিয়া মরুগিরি অতিক্রম পূর্ব্বক মধ্যএসিয়ার পথেই ভারতবর্ষে অগ্রসর হইতে কৃতসংকল্প হন।

সে দিনের কথা স্মরণ করিতেও বিস্ময়ে রোমাঞ্চ হয়! মরুস্থলে পথ নাই, লোকালয় নাই, জলস্পর্শের আশা নাই—কেবল অনন্তবিস্তৃত বালুকান্তরের পর বালুকান্তর! সে বালুকা সমুদ্রে উপনীত হইলে মনে হয় বুঝি জীবনব্যাপী দীর্ঘযাত্রাতেও সে পথের অবসান হইবে না। তাহার উপর দিয়া যখন প্রবল বেগে প্রভঞ্জন প্রবাহিত হয়, তখন ধূলিপটলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া কঙ্করকণা তীরবেগে সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ হইতে থাকে;—সে প্রচণ্ড পীড়নে সে সকল পূর্ব্বযাত্রী মরুমধ্যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ধূলিবিলুণ্ঠিত জীর্ণকঙ্কালরাশি সে পথের ও একালের সুমার্জ্জিত রাজপথের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতে পারে! কোনরূপে মরুস্থল অতিক্রম করিলেও সম্মুখে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত আসিয়া পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। তাহার সর্ব্বত্র ঘন বন,—শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্য; সেখানে বৃক্ষলতার অস্তিত্ব নাই, সেখানে কেবল তুষার স্তূপের উপর তুষার-স্তূপ। কোথায়ও দুরারোহ শৈলশৃঙ্গ, কোথায়ও বা দুরতিক্রমনীয় গিরিনদী;

কখন কটুকষায় বন্যফল কখন বা নিরম্বু উপবাস;— এইরূপে কেবল জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যসঞ্চয়ার্থ যাঁহারা সেকালের কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া ভারতভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তুলনায় একালের সুসজ্জিত পোতবিহারী উত্তরকেন্দ্রান্বেষী যশস্বিবর্গের যশঃ মলিন বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ইহা কেবল আমাদেরই ধারণা নহে; পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গও এ কথার আলোচনা করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন।*

বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে পালিভাষায় লিখিত সুবিস্তৃত বৌদ্ধসাহিত্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল;— টীকা টিপ্পনী সংযুক্ত হইয়া সে সাহিত্য ক্রমশঃ বিপুলতা লাভ করিয়াছিল। সে সকল অধ্যয়ন করিতে হইলে সবিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা অভ্যাস করিতে হইত। বৌদ্ধগণ তজ্জন্য সকল দেশেই বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল।

এক সময়ে বৌদ্ধবিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে মধ্য এসিয়া, গান্ধার প্রভৃতি প্রতীচ্য বিদ্যালয় যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর বিদ্যাশিক্ষার ইতিহাসে যে বিদ্যালয় সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ বলিয়া অদ্যাপি পরিচিত রহিয়াছে, তাহা মগধের অন্তর্গত "নালন্দে" সংস্থাপিত হইয়াছিল। মগধান্তর্গত নৈরঞ্জনানদীতীরস্থ বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমচ্ছায়ায় শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করেন; তন্নিকটস্থ গৃধ্রকূট পর্ব্বত, বোধিদ্রুম ও মগধের রাজধানী রাজগৃহ ও পাটলিপুত্র, শাক্যসিংহের জন্মভূমি কপিলাবাস্তু,

* Never did more devoted pilgrims leave their native country to encounter the perils of travel in foreign and distant lands: never did disciples more ardently desire to gaze on the sacred vestiges of their religion; never did men endure greater sufferings by desert, mountain and sea than these simple-minded earnest Buddhist priests.—— *Dr. Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I. Introduction.*

প্রচারক্ষেত্রে বারাণসী, বৈশালী, মহানির্ব্বাণক্ষেত্রে কুশিনগরের শালবন বৌদ্ধতীর্থের মধ্যে সুপরিচিত,—নালন্দের বৌদ্ধ বিদ্যালয়ও এই শ্রেণীর মহাতীর্থের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তথায় সহস্র অধ্যাপকের পাদমূলে বসিয়া দশ সহস্র শিষ্য নিয়ত বিদ্যাভ্যাস করিত; বিদ্যালয়ের সুগঠিত হর্ম্ম্যরাজি ও অভ্রভেদী উচ্চচূড়া নালন্দকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শোভাময় স্থান বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল। কত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন জাতির বৌদ্ধছাত্র যে এই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। এই বিদ্যালয়ের নাম ও খ্যাতি অন্যান্য দেশের ন্যায় মহাচীন সাম্রাজ্যেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তথায় অধ্যয়ন করিবার জন্য আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক; কাহারও এরূপ আগ্রহ হইলে অন্য লোকে তাহাকে তীর্থযাত্রার সহায়তা করিত। এরূপ অযাচিত সহায়তালাভ না করিলে তৎকালে দূরদেশগমন করা সহজ হইত না। ফা হিয়ান এইরূপ সহায়তার ভরসায় অধ্যবসায় ও উচ্চলক্ষ্য সম্বল করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ "ফ্য-ক্যু-কি" নামক চৈনিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; প্রায় শতবর্ষ হইল ইউরোপীয়গণ এই গ্রন্থের সন্ধান লাভ করেন; এক্ষণে ইহা ইউরোপের সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

গীতিকা।*

পার্শ্বস্থিত উদ্যানে বিকসিত সুন্দর পুষ্প পথিকমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করে—দুইদণ্ড নয়ন ভরিয়া দেখিবার সাধ জাগাইয়া তুলে। কাব্যোদ্যানে গীতিকা একটি সুন্দর পুষ্প,—বহিরাবরণ, গঠনপ্রকৃতি, সাজসজ্জা সকলই নয়নরঞ্জক।

* গীতিকাব্য। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরি-প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

কিন্তু কাননে নয়নপ্রীতিকর পলাশ পুষ্পও ত বিকসিত হয়, আবার সুবাসিত গোলাপের সৌন্দর্য্যও চিত্ত বিনোদন করে। গীতিকা কোন্ শ্রেণীর পুষ্প ?

পথপ্রান্ত হইতে গীতিকার সৌন্দর্য্য, সৌরভ পরীক্ষা করিতেছিলাম। মনে হইল গীতিকা যেন দর্শনমধুর একটি পুষ্পগুচ্ছ—কোনটি সুবাসে হৃদয় আমোদিত করিতেছে, কোনটি যেন অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত অবস্থায় তৃষিত হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে, আবার কোনটি যেন এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই।

ভূমিকায়

"ভিখারীর ক্ষুধাসম, দাসের গীতিকা
দৈন্যের সম্বল,
শুধু অশ্রুজল"—

এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম বুঝি গীতিকা-পুষ্পগুচ্ছের প্রতি-পুষ্প অশ্রু-নীহারসিক্ত দেখিব। দু'একটি পুষ্প অশ্রুসিক্ত সন্দেহ নাই। 'বিদায়গীতি'তে এখনও অশ্রুকণা লিপ্ত রহিয়াছে, আর "মর্ম্মধ্বনি" হইতে যেন অশ্রুধারা ক্রমাগত ক্ষরিত হইতেছে :—

"সে গিয়েছে; রেখে গেছে তীরের শ্মশানে
জঞ্জাল ভাটার;
তদবধি কূলে কূলে ফিরিতেছি একা,
এল না জোয়ার!"

অধিকাংশ পুষ্পগুলিতে কিন্তু অশ্রুকণা নাই "কলালক্ষ্মী" যেন মলয় পবনে ললিত নৃত্য করিতেছে

"লহ বন্দন, বিচিত্রা অভিসারিকা,
সাজাও সকরে জীর্ণ চিত্রশালিকা,
কাব্যকুঞ্জে আন শত শুকসারিকা,
ভর, ভর গীতি-সৌরভে!"

"অর্জ্জুনোর্ব্বশী" ভাষা ও ছন্দগৌরবে যেন মস্তকোত্তলন করিয়া রহিয়াছে :—

"চিত্রসেনমুখে শুনি আপনার বাঞ্ছিত বার্ত্তা,
মদভরে তরঙ্গিয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা

প্রসাধনে রত, স্বর্গে, স্বর্গপুরে অতুল্যা রূপসী;
ঝলকিত পুলকিত পূর্ণিমার পরিপূর্ণ শশী
অলক্ষ্যে করিতেছিল, কক্ষমাঝে কটাক্ষ ক্ষেপণ,
অসম্বৃতা উর্ব্বশী যথন !"

"অপূর্ব্ব প্রতিদানে" প্রেমের উৎস যেন উথলিয়া উঠিতেছে :—

"কি আর দেখিছ চেয়ে ?----পূর্ব্বাচলমূলে
লগ্ন রথ অরুণ সারথি;
জাগে সুপ্ত গ্রামখানি, দেউলে দেউলে
শুন বাজে মঙ্গল আরতি।
যাবে কি মলিনমুখে ? তবে ধর ত্বরা,—
কোনদিন করিনি যা দান,-
অধর দিতেছে আঁকি; লও প্রাণভরা
প্রণয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।"

"কবির প্রতি নারী"— যেন তাহাতে প্রীতি আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু "প্রেমের ইতিহাস"-পুষ্প সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইল,- তাহার পত্রে পত্রে যেন কবিত্বের ছটা :—

"বঁধুর বংশী বাজিল মধুর কাননে;
ব্যাকুল তৃষ্ণা ভাতিল আননে আননে;
শিথিল-বসন, ভূষণবিহীন,
ছুটিল যাত্রী, মন উদাসীন;
কোকিল কোকিলা মাতিল বিহ্বল কূজনে;
অলস আবেশ বহিল স্বপনে বিজনে।

উথলিল রূপ-উৎস চমকে ঝলকে
তরুণ করুণ নয়নে আননে অলকে।
অরুণবরণ অমল কোমল
সরস কপোল, অধরযুগল
কাঁপিতে লাগিল দরশ-পরশ-পুলকে।

আপনারে যেন প্রথম জানিল পলকে !"

গীতিকার ৯১টি কবিতার মধ্যে ৪৭টি চতুর্দ্দশপদ পয়ারছন্দে। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক না হইলে গীতিকা বোধ হয় আরও মনোরম হইত।

যাহা হউক, গীতিকার সৌরভে "পথিক" হৃদয় তৃপ্ত। "প্রথম কবিতা"য় গীতিকা যেন নববধূর মত লুকাইয়া থাকিতে চায়

"এখনি উঠিবে খর রবি
জাগিবে ধরণী সচেতনে
এই বেলা চল্ ফিরে, সখি,
লুকাইয়া পড়িগে নিজনে।"

আবার "রচনার তৃপ্তি"তে প্রকাশ

"কবির কামনাস্বপ্ন ফিরে হাহাকার করি,
শুনি' বিশ্ব করে পরিহাস;
তারে, হেথা ম্লানমুখে, তুমি তুক তুক বুকে
টানিছ সোহাগভরে ফেলি দীর্ঘশ্বাস!"

যেন কেবল অন্তঃপুরবাসিনীরাই গীতিকাকে আশ্রয় দিবেন। পথিক-মতে, গীতিকার বিজনে লুকাইবার, বা বহির্বাটিবাসীদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার আবশ্যকতা নাই। গীতিকার সৌরভে সকলেই তুষ্ট হইবেন।

কিন্তু গোলাপেরও কণ্টক আছে,— সে প্রকৃতির নিয়ম। সেইজন্য বোধ হয় গীতিকা-পুষ্পগুচ্ছেও কণ্টক।

তিনটি কবিতায় গীতিকার কবি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুকরণে যুক্তাক্ষর দ্ব্যক্ষর গণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিয়ম রক্ষা করেন নাই। রবিবাবুর মতে, কথার আদ্যক্ষর যুক্তাক্ষর হইলে তাহা একাক্ষর বলিয়া ধর্ত্তব্য; আর স্বরবর্ণের মধ্যে 'ঐ' ও 'ঔ'-কারযুক্ত অক্ষরগুলি দ্ব্যক্ষর গণিত হইবে।

"প্রেমের ইতিহাস", "হে কল্যাণী" ও "বর্ষাগাথা"য় গীতিকার কবি যুক্তাক্ষর দ্ব্যক্ষর গণনা করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বোধ হয় আত্মবিস্মৃতি আসিয়া জুটিয়াছিল! প্রেমের ইতিহাসে

"বসন্ত পশিল শোভি অপূর্ব্ব বরণে"

"কোকিল কোকিলা গাহিল বিহ্বল কূজনে"

"বিলাস বিভ্রম জাগিল হৃদয়ে যেমনি"

এই তিন লাইনেই ছন্দভঙ্গ হইয়াছে। "বসন্ত" "বিহ্বল" ও "বিভ্রম" কোন্ দোষে যুক্তাক্ষরের সম্মান পায় নাই?

"হে কলালক্ষ্মী"র প্রায় অধিকাংশ লাইনের শেষ কথাগুলির যুক্তাক্ষরত্ব অগণিত রহিয়াছে!

"এস এ বঙ্গে অম্বর পথ রঞ্জিয়া"

'বঙ্গ' ও 'অম্বর' যদি যুক্তাক্ষরের মর্য্যাদা পাইল, তবে 'রঞ্জিয়া' কেন উপেক্ষিত হইল?

"চিরদিন তুমি জাগ্রত নব যৌবনে"

"মানস যৌব রাজ্যে তুমি গো ঈশ্বরী"

'যৌবন'এ তিনাক্ষর কিন্তু 'যৌব'ও তিনাক্ষর! আবার 'ঈশ্বরী'ও তিনাক্ষর!

"শোকে শ্লোকে কবিরা করিছে সাধনা"

কোন্ নিয়মে 'শ্লোক' তিনাক্ষরের মর্য্যাদা পাইল?

"বর্ষাগাথা"র ছন্দ বর্ষাসলিলের মত একেবারে পঙ্কিল—কোন্ ছন্দে যে ইহা লিখিত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না

"আহল বর্ষা সাজিয়া মর্ত্ত্যে"

"নীল শৈলশৃঙ্গে নীলাঙ্গ কলাপী"

"আকাশে বাতাসে ভূলোকে মিলে"

'বর্ষা'য় তিনাক্ষর গণনা বুঝিলাম, 'শৃঙ্গ' ও 'নীলাঙ্গ'য় বুঝি যুক্তাক্ষর নাই? আর 'ভূলোকে মিলে'র মধ্যে একটি যুক্তাক্ষর বোধ হয় অজানিতভাবে লুক্কায়িত আছে!

'পানে নিসর্গ শিহরে'

'পেথম ধরি বিহরে'

'পৃথ্বী শস্যশালিনী'

'হাসিছে তৃণ লতিকা'

এই দ্বিতীয় লাইনগুলিতে নয় অক্ষর না অষ্ট অক্ষর? বর্ষাগাথার ছন্দ নিতান্তই পঙ্কিল।

গীতিকা সযত্নে মুদ্রিত হইলেও, ইহাতে কতিপয় মুদ্রাঙ্কনঘটিত ভ্রম আছে। (৪৮ ও ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

যাহা হউক, এই সব কণ্টক সত্ত্বেও গীতিকা-পুষ্পগুচ্ছ পথিকের চিত্তবিনোদক।

পথিক।

শান্তি।

ভাদ্র মাস। দুইদিন অবিরাম বারিপাতের পর আজ আকাশ একটু নির্ম্মল হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় বিনয়দের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছি। শুক্ল ত্রয়োদশীর চন্দ্রকরে তাহাদের ক্ষুদ্র আঙ্গিনাখানি ভরিয়া গিয়াছিল! সবুজ ঘাসগুলি তখনও শুকায় নাই, তাহার উপর চাঁদের আলো পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিকশিত হইতেছিল।

পল্লীগ্রামে ভাদ্রমাসে কাহিনী শুনিবার প্রথা আছে। বিনয় বলিল "চল, ভাই, বাহিরে জ্যোৎস্নায় বসিয়া একটা ভাল গল্প বলিবে চল!"—গল্প করিতে ওস্তাদ্ বলিয়া বন্ধুবর্গের মধ্যে আমার যথেষ্ট খোস্নাম ছিল। সুনামটী রক্ষা করিবার জন্য আমিও গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম:——

"মিষ্টার চাটার্জ্জি হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার,—গোঁড়া ব্রাহ্ম! আমি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম না হইলেও অন্তরে অন্তরে ব্রাহ্মমত পোষণ ও পালন করিতাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কোন একটী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়! পরিচয় আলাপে এবং আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইল। তিনি আমাকে সচ্চরিত্র যুবাপুরুষ দেখিয়া পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। শুধু তিনি নয়,---- মিসেস্ চাটার্য্যি ও মিস্ চাটার্জ্জিরাও আমাকে ভালবাসিতেন। প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার তাঁদের ওখানে যাওয়াই চাই, না গেলে মিসেস্ চাটার্জ্জি, বিশেষতঃ মিস্ চাটার্জ্জি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন!

একবার কোন কারণে কয়েক মাস সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠিয়াছিল না। অনেক দিন পর সেদিন গিয়াছিলাম। কার্ড পাঠাইয়া ড্রয়িংরুমে বসিয়া আছি! পাছদিক হইতে মিস্ চাটার্জ্জি আসিয়া আমার চক্ষুঃদুটী দুই হাতে সজোরে টিপিয়া ধরিয়া বলিল "বল ত কে? নাম না বল্‌তে পারলে কিন্তু ছাড়্‌ব না!"

আমি হাসিয়া বলিলাম——

"আমি তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার!"

"যাও, যাও, তুমি ভারী দুষ্টু—" বলিয়া মিস্ চাটার্জ্জি আমার চক্ষুঃ ছাড়িয়া দিল!

মিস্ শক্তি চাটার্জ্জি, মিষ্টার চাটার্জ্জির একমাত্র কন্যা। শক্তি, সুন্দরী ও শিক্ষিতা। সপ্তদশ বৎসরেরও অবিবাহিতা!

নিকটে একখানা শোফা ছিল,— শক্তি শোফাখানি আমার চেয়ারের কাছে আরও টানিয়া আনিয়া বসিল। স্লিপার হইতে ষ্টকিং-মণ্ডিত চরণ দুইখানি খসাইয়া লইয়া সম্মুখের টেবিলের উপর তুলিয়া দিল।

আমি বলিলাম, "শক্তি, একটা বিষয়ে তুমি বড় অন্যায় কর। এই যে জুতা মোজা দিয়ে পা'দুখানিকে ধূলি হইতে রক্ষা কর---- এটা বড় ভাল নয়। আমাদের ন্যায় ভক্তদিগকে যদি তোমার পদধূলিটুকু হইতেও বঞ্চিত কর, তবে আর তাহাদের আশার কি থাকিল?——

"যদি না ধূলা লাগিবে তব পায়ে,
পায়ের ধূলা পাইব কি উপায়ে?"

আজ তোমায় ছাড়িতেছি না, তোমার চরণের এক কণা ধূলি আজ ভিক্ষা করিয়া লইব। তোমার পবিত্র স্মৃতিস্বরূপ তাহাই বক্ষে ধরিয়া এই জীবন কাটাইব;--- হয়ত এ জন্মে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না!'

আমার চক্ষুঃ অশ্রুপূর্ণ!

শক্তি কাতর নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল "শিশির, আজ তোমার মুখে এ কথা কেন? তুমি এতদিন আমাদের এখানে আস নাই বা কেন?"

"সেই কথা খুলিয়া বলিবার জন্য, তোমার নিকট শেষ বিদায় লইবার জন্যই আসিয়াছি। শুন :—

গোলকচন্দ্র সরকার আমাদের গ্রামের একজন ধনবান ব্যক্তি। তাঁহার নিকট আমার পিতা দুই সহস্র টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে টাকা সুদে আসলে পাঁচ হাজারে পরিণত হয়। এই দেনার দায়ে আমাদের যৎসামান্য ভূসম্পত্তি ও ভদ্রাসনটুকু পর্য্যন্ত নিলাম হইবার উপক্রম হওয়ায়, আমরা পথের কাঙ্গাল হইতে চলিয়াছিলাম।

বিধাতা আছেন। আমাদের রক্ষার উপায় তিনি করিলেন। গোলক সরকারের একটা কুৎসিত, অপদার্থ ও বয়োস্থা অনূঢ়া কন্যা ছিল। নানাস্থলে চেষ্টা করিয়া সরকার মহাশয় কন্যাটীকে কাহারও গলগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না! অবশেষে আমার সহিত কন্যার বিবাহ প্রস্তাব পিতার নিকট উপস্থিত করিলেন। বিবাহ স্থির হইলে উক্ত ঋণের দায় হইতে পিতাকে অব্যাহতি দিবারও প্রলোভন দেখাইলেন। আমি এ বিবাহে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিলাম। কিন্তু পিতামাতার নির্ব্বন্ধাতিশয় অনুরোধ, অনুনয় ও কাতরোক্তিতে আমি আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইলাম। শক্তি! আমার কাছে অত ঘিসিয়া বসিলে কেন? তোমাকে এখন স্পর্শ করিলেও যে আমি পাপভাক্ হইব! তোমার মুখখানি নয়ন ভরিয়া দেখিবারও যে আর আমার অধিকার নাই----- আমি বিবাহিত! সেই দিন হইতেই তোমার সহিত আমার দেহের সকল সম্বন্ধ ফুরাইয়াছে। এ দেহ বিক্রয় করিয়া আমি পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছি। কিন্তু মনঃ আমার.--- তাহাত বিক্রয় করি নাই! শক্তি, তাহাদ্বারা সমস্ত জীবন তোমারই পূজা, তোমারই আরাধনা, ধ্যান ধারণায় কাটাইব! রক্ত-শোণিত এ পূজার পুষ্প; তোমার কল্যাণ-কামনাই এ পূজার বর-প্রার্থনা, তোমার কমলচরণ দুইখানিই এ পূজার প্রতিমা! তোমাকেই পূজা, আবার তোমার জন্য তোমারই চরণে বরভিক্ষা----- এ অতি অভিনব নিগূঢ় ধর্ম্মমর্ম্ম! শক্তি, আজি হইতে আমি শাক্ত!"

শক্তি শোফায় মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছিল। পাশের ঘর হইতে মিষ্টার চাটার্জ্জি আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি উঠিয়া গেলাম!

মিষ্টার চাটার্জ্জি বলিতে লাগিলেন :--- "শিশির, আমি পাশের ঘর হইতে

তোমার সমস্ত কথা শুনিয়াছি। এই বিবাহ ব্যাপারে তোমার উপর কত দূর অন্যায় ব্যবহার হইয়াছে, ভাবিয়া আমি প্রতি মুহূর্ত্তে শিহরিয়া উঠিতেছি'! তুমি যদি স্বীকার কর, তবে আইনের দ্বারা এ বিবাহ আমি অসিদ্ধ প্রমাণ করিয়া তাহা হইতে তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারি। শক্তিই তোমার উপযুক্ত। কি বল?"

আমি ধীরে ধীরে মিষ্টার চাটার্য্যির পদস্পর্শ করিয়া বলিলাম "ক্ষমা করিবেন। আপনি এমন উপদেশ দিবেন না। আমার মতে, জন্ম ও মৃত্যুর ন্যায় বিবাহও মানুষের একটীমাত্র; তাহা ঘটনা-চক্রে সুখকর হউক বা অশান্তিকর হউক—তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অন্য বিবাহের চেষ্টাই—আপনাদের আইনের চক্ষে না হউক, ঈশ্বরের চক্ষে অসিদ্ধ;—তাহা বিবাহ নয়,—ব্যাভিচার! সতীত্ব কি কেবল রমণীগণেরই একচেটিয়া, আমাদের জন্যও কি এ পবিত্র নৈতিক ধর্ম্ম সৃষ্ট হয় নাই? দাম্পত্য-জীবনই কি সংসারের একমাত্র সাধন? সাহিত্য-চর্চ্চা, পরোপকার, আত্মত্যাগ, কায়-মনোবাক্য শুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়তা—এগুলিও কি মানবের সুপবিত্র সাধনা-বলীর অন্তর্ভূত নহে? এরূপ উপদেশ যিনি দিবেন, তিনি আমার শত্রু। আজ হইতে আপনার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর কোনদিন পদার্পণ করিব না বলিয়া আমি সে কক্ষ পরিত্যা।—"

হঠাৎ বিনয় আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল "এ কথা সত্যি নাকি? তোমার জীবনে কি এমন ঘটনা ঘটিয়াছে?"

আমি বলিলাম "তুব্ পাগল এ যে কাহিনী বলছি! ভুলেই ভুল?"

কেন লুকাই।

প্রিয়তম ! মম মনে,
ছিল না ত সংগোপনে,
এতদিন কোন কিছু কখন।
আপনি সকলি সখে,
বলেছি তোমায় ডেকে,
রাখি নাই কোন কথা লুকোন।

এই কথা শুধু মোরে,
শুধা'য়োনা কৃপা ক'রে,
এ বারতা জানিবারে চে'য়োনা।
না, না থাক মম সাথ,
এ দুঃখ-বারতা নাথ,
রাখ কথা বিতরিও করুণা।

শুনিলে যে এই কথা,
বাজিবে বড়ই ব্যথা,
তাই ত লুকায়ে তাহা রেখেছি।
না, না নাথ, কাজ নাই
শুনো না,—দেখগো তাই,
তাহা এ নয়ন জলে ঢেকেছি !

আমার মাথায় আজ,
পড়েছে পড়ুক বাজ,
আমি ত নয়নজলে সহিব।
এ ভীষণ ক্ষত তায়
যদি সখে, নাহি যায়
কি ক্ষতি, না হয় প্রাণ ত্যজিব।

মিছা বল শুধু তবে,
তোমায় (ও) করি কি হবে,
ক্ষত চিত,—না না আমি লুকা'ব,
ই খসিলে যদি
.খ, তুষ্ট হ'ন বিধি,
(ন বল ত্রুটি হৃদি খসা'ব?

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ দেব।

সুন্দর।

(অনূদিত)

শৈশবে দেখিয়াছিনু তারে,
প্রীতিমাখা কোমল-মূরতি;
নিরমল স্নিগ্ধ উষা সম,
বসন্তের শিশির যেমতি।
চম্পক চামেলি যূথী বেলা
সাথী তার সারা দিবসের;
সদা ফুল্ল সরল শোভন,
সেই মত জীবন তাদের।

পুনঃ আমি দেখেছিনু তারে
মুকুলিত যৌবন-উষায়;
বিমল মাধুরীরাশি যবে,
ফুটেছিল অনন্ত শোভায়;
সঙ্গীত-মাখান তার বাণী,
শোভিত সে কৌমুদী-বরণা

প্রিয়তম হৃদয়ের রাণী,
নিখিল এ বিশ্বের বাসনা।

সময়ের অচিন্ত্য শাসনে,
কবে যে সে রম
মুকুল সে হইল পুষ্প
পুষ্প পুনঃ ফলে সুশোভি
স্নেহময়ী শোভনা জননী
শিশু কোলে দেখিলাম
সেই দিন আমার নয়নে
ভাতিল সে অমরা-বিভায়।

শেষ দেখা দেখেছিনু তারে
যে দিন সে ছাড়িল এ ধরা,
স্বরগের জ্যোতিঃ তার মুখে
দেববলে তার বুক ভরা।
অভাব ছিল না তার কোন
কোন ভয় অশান্তি-দহন—
আহা! তারে সব বার চেয়ে,
লেগেছিল "সুন্দর" তখন॥

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী।

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, চৈতন্য দেবের তিরোভাবের পর রচিত হইয়াছে। উহা ভাগবত গ্রন্থের একরূপ অনুবাদ। রঘুনাথ নামক এক ব্যক্তি, প্রেমতরঙ্গিণীর রচয়িতা। রঘুনাথ, অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভাগবতে

পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ভাগবতাচার্য্য উপাধিলাভ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাগবতাচার্য্য উপাধিভূষিত কয়েক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের গুরুর নাম গদাধর শিরোমণি। রঘুনাথ গদাধরকে কোন স্থানে জান গুরু, পণ্ডিত শিরোমণি, ধীর শিরোমণি, পণ্ডিত মুকুটমণি বলিয়াছেন। জান শব্দের অর্থ জ্ঞানী। এই গ্রন্থে পয়ার ত্রিপদী ব্যতীত অন্য ছন্দের ব্যবহার হয় নাই। তখন পয়ার ছন্দের নামকরণ হইয়াছে, যথা:—

"শ্রীভাগবত আচার্য্যের পয়ার রচনা। সুখে যেন ভাগবত বুঝে মূর্খজনা॥"

তখন ত্রিপদী ছন্দের দীর্ঘছন্দ নাম ছিল, ত্রিপদী নাম হয় নাই। সমুদায় গ্রন্থ খানি, মল্লার, বসন্ত, শ্রী, কেদার, ললিত প্রভৃতি ২৬টি রাগে গীত হইত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ভাগবতসার ও প্রেমতরঙ্গিণীর পরস্পর তুলনা করিলে প্রেমতরঙ্গিণীর শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণবিজয় খানি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। চৈতন্যদেবের জন্মের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে উহার রচনা পরিসমাপ্ত হয়। চৈতন্যদেব, স্বমুখে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহার রচনা নিতান্ত প্রাঞ্জল ও প্রাচীনত্বের লক্ষণে লক্ষিত। ভাগবতসারের রচনা মধুর ও সম্মার্জ্জিত, কিন্তু প্রেমতরঙ্গিণীর ভাষা মধুরতর। সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে ভাগবতের ন্যায় মধুর গ্রন্থ বিরল। উহার ললিত শব্দবিন্যাসপূর্ণ মনোহর শ্লোকাবলী পাঠ করিলে পাঠকগণের মনে উদাত্তভাবের সঞ্চার হয়। যাঁহারা ভাগবত পাঠে কৃতার্থ হইয়াছেন, প্রেমতরঙ্গিণী পাঠে তাঁহাদের শ্রমের বৈফল্য হইবে না। এই গ্রন্থ, ভাগবতের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ না হউক, ভাবার্থের অনুবাদ বটে। ভাগবতের কঠিন কঠিন দার্শনিক অংশও রঘুনাথ অসাধারণ নৈপুণ্যের সহ সাধারণের বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন। এতাদৃশ গ্রন্থ যে, কি জন্য জনসমাজে প্রচলিত নয়, তাহা বুঝা যায় না। ইহা কীটদষ্ট অবস্থায় অস্তিত্ব বিসর্জ্জন করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী বহুমূল্যরত্ন নষ্ট হইবে। আমরা প্রথমতঃ ইহার ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিয়া কতিপয় সুন্দর স্থান উদ্ধৃত করিব।

(ক) অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকের ন্যায় এই গ্রন্থে 'ও' স্থানে 'হোঁ' ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা:—

"স্থানে হোঁ সেইরূপ দেখ বিদ্যমান।"

(খ) জানেন, করেন প্রভৃতির 'ন' স্থানে 'ন্ত' ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা:—
"যদুবংশে কংসভয় জানেন্ত আপনে। যোগ নিদ্রা পাঠাঞা দিলেন্ত নারায়ণে॥"

(গ) প্রথম পুরুষের স্থানে উত্তম পুরুষের ব্যবহার, যথা:—

শুনিয়া আসিব কংশ তোমার সাক্ষাৎ।

(ঘ) 'এই'র স্থানে 'ই'র ব্যবহার, যথা:—

ইরূপ সম্বর তুমি না কর বিদিত।

(ঙ) সদৃশ অর্থে সমসর শব্দের ব্যবহার। এই সমসর শব্দ হইতে সোঁসর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

পুত্রবর মাঙ্গিলে আমার সমসর।

(চ) 'ইয়া' প্রত্যয়ের স্থানে 'ইঞা'র এবং 'হইতে' স্থানে 'হনে' ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা:—

খসিঞা ছাঞাল তার গেল হাতে হনে॥

(ছ) 'কেন' স্থানে 'কেহ্নে'র ব্যবহার, যথা:—

আমারে মারিতে কেহ্নে করিস্ যুগতি।

(জ) 'সবাই'র স্থানে 'সমাই' ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা:—

সমাই মিলিঞা গিয়া সে ব্রাহ্মণে মারি।

(ঝ) 'তে' বিভক্তির স্থানে 'ত'র ব্যবহার। যথা:—

স্নান করি অঙ্গেত পহিল আভরণ॥

প্রাচীন কবিদের রচনা দেশভেদে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভব। "কেন" পদটী বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কথোপকথন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়। যে প্রদেশে 'কেন' কথাটী যেরূপ উচ্চারিত হয়, সেই প্রদেশের পুস্তকে হয়ত সেইরূপ লিখিত আছে, সুতরাং কবি কোন্ কথাটী লিখিয়াছিলেন, তাহা জানা সহজ নয়। অধিকাংশ স্থানের পুস্তকে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই কবির উক্তি বলিয়া, ধরিয়া লইলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

এই গ্রন্থে অনেক নূতন নূতন শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। দুটী একটীকে রক্ষা করিলে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার উপকার হইতে পারে।

(ক) উচ্চৈঃস্বরে ভাট্টিমা পঢ়িল ভাটগণ।

(খ) তবে যত গোয়াল আছিল বলিআর।

(গ) চৌদিকে কমলদল মধ্যে কর্ণিকার।
সেইরূপে শোভে ব্রজশিশু পাটোয়ার॥

(ঘ) বাহে বাহে ধরিঞা কুমারী একমেলি।
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ গায় উচ্চ করি॥

(ঙ) মাহুতে দিল টুঞা চলয়ে ধাঞা ধাঞা॥

(চ) বড় বড় ঘোড়াশালা আঞারি আঞারি॥

(ছ) টোণ বাণ গাণ্ডীব কাচিঞা শরাসনে।
অর্জ্জুন চলিল বনে মৃগয়া কারণে॥

(জ) ফলকে ফলকে চলে নানাবর্ণ ঘোড়া॥

মধ্যে মধ্যে অমিল পদের ব্যবহার হইয়াছে। গ্রন্থখানি গীত হইত। গীতে ধ্বনির সাম্য থাকিলেই শ্রুতিমধুর হয়, অক্ষর সাম্যের তত প্রয়োজন হয় না।

[ক] যশোদার কন্যা তবে তুলি নিল কোলে।
পুনরপি সেহি মনে গেলা মধুপুরে॥

[খ] কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার যে লীলা।
তোমার অসীম গুণ দিতে নাহি সীমা॥

দুই এক স্থানে অবিকল সংস্কৃত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা :-

করিঞা নিতান্ত রতি ভজন্তি সদায়॥

সুন্দর ভাব প্রকাশক ভাষা, যথা :-

আগুয়ানি পাছুযানি তোলনি পাড়নি।
দুই বীরে মহাযুদ্ধে কেহ নাহি জিনি॥

গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপে হইয়াছে। যথা :-

ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ॥ শ্রীমদ্‌ভাগবতাচার্য্য প্রেম ভক্তি বিবৃদ্ধয়ে। গীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতং॥ সিন্ধোড়ারাগেণ গীয়তে॥

নমো নমো গুরুর চরণে নমস্কার। যাহার কৃপায়ে খণ্ডে ভব অন্ধকার॥
নমো নমো গণপতি বিঘ্ন বিনাশন। নমো বেদব্যাস সত্যবতীর নন্দন॥
নমো ব্যাসসুত শুক মহা যোগেশ্বর। মুনীন্দ্রবন্দিত পদ লীলা কলেবর॥

শুক মুনির চরণে মোর নমস্কার। যাহার কৃপায় ভাগবত উপাদান॥
দেব দ্বিজ চরণের করিঞা প্রণতি। কৃষ্ণগুণ পাঞ্চালী রচিব যথা মতি॥
নমো নমো নারায়ণ চরণে প্রণাম। ব্রহ্মাণ্ড কোটির স্থিতি প্রলয় নিদান॥
পুরাণপুরুষ হরি অনাদি নিধন। লীলা অবতার করে ভকত কারণ॥
চরণ পঙ্কজে তার করিয়া প্রণাম। কথাচ্ছলে ভাগবত করিব বাখান॥

নারায়ণের বন্দনা—

জয় জয় জগত নিবাস হৃষীকেশ। জয় জয় ভক্তকুল নলিন দিনেশ॥
জয় জয় ব্রহ্মাদি-বন্দিত-পাদপদ্ম। জয় জয় দিব্য অবতার নবচ্ছদ্ম॥
জয় জয় মুনীন্দ্র মানস সুখানন্দ। জয় জয় কমলা লালিত পাদপদ্ম॥
জয় জয় গুণনিধি প্রসন্ন-হৃদয়। জয় জয় শ্রীনিবাস প্রভু কৃপাময়॥
জয় জয় মহাভয় দুরিত ভঞ্জন। জয় জয় পরচণ্ড পাষণ্ড খণ্ডন॥
জয় জয় ভকতবৎসল রসময়। জয় জয় ভকত তারণ ··· ··· ॥
জয় জয় যদুকুল কমল ভাস্কর। জয় জয় বিপুলিল কঞ্জ শশধর॥
জয় জয় অসুর কুঞ্জর মত্ত সিংহ। জয় ব্রজবধূ মুখ সরোরুহ ভৃঙ্গ॥
জয় জয় যোগেন্দ্র মানস পরহংস। জয় ভক্ত ভব পথ পরিশ্রমধ্বংস॥
জয় জয় জগত মঙ্গল গুণ নাম। জয় জয় শ্রুতিবাণী অগোচর ধাম॥
জয় জয় জগত-নিবাস লক্ষ্মীকান্ত। জয় জয় নিজজন বৎসল নিতান্ত॥
জয় জয় মহাদিব্য মৎস্য অবতার। জয় মহাকূর্ম্ম ক্ষীর জলধি বিহার॥
জয় যজ্ঞ-অবতার বরাহ মূরতি। জয় নর সিংহ দিব্য অনন্ত শকতি॥
জয় দিব্য পরাক্রম অদ্ভুত বামন। জয় ভৃগুপতি ক্ষেত্রিকুল বিনাশন॥
জয় রঘুনন্দন শ্রীরাম অবতার। জয় হলধর রাম বিপক্ষ বিদার॥
জয় বৌদ্ধ অবতার অসুর মোহন। জয় কল্কিরূপ ম্লেচ্ছকুল বিনাশন॥
জয় পূর্ণ ব্রহ্মকৃষ্ণ বিচিত্র বিহার। জয় জগন্নাথ নীলাচল অবতার॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্য মূরতি। প্রেম ভক্তি দাতা প্রেম ভকতের গতি॥

বসুদেবের স্তব—

জানিলোঁ নিশ্চিতে তুমি সাক্ষাতে ঈশ্বর। পরম পুরুষ তুমি প্রকৃতির পর॥
সর্ব্ব বুদ্ধি সাক্ষী তুমি আনন্দ স্বরূপ। বিশুদ্ধবিজ্ঞান ঘন পূর্ণব্রহ্মরূপ॥
অতুল শকতি তুমি পুরুষ পুরাণ। মায়ায়ে আপনি কর বিশ্ব নিরমাণ॥

জগতের হয়ে তবে উতপত্তি ধ্বংস। তোমার বিনাশ কভো নহে পরহংস ॥
জগতে প্রবেশ করি আছ নিরন্তর। তহু পরবেশ নাহি তাহার ভিতর ॥
পঞ্চভূত আদি যত কারণ বিশেষ। বিশ্ব নিরমিঞা যেন বিশ্বে পরবেশ ॥
বিশ্ব সহে তার যেন নাহি অনুবন্ধ। এহিরূপ প্রভু তুমি নিত্য পরানন্দ ॥
বিশ্ব নিরমিঞা আছে জগত নিবাস। বুদ্ধি মন চিত্ত তুমি কর পরকাশ ॥
সেহি মন বুদ্ধে তোমা লইতে না পারি। সর্ব্বসম প্রভু তুমি সর্ব্ব অধিকারী ॥
অসত্য জগতে তুমি আছ তবে মানি। এমত নিশ্চয় যার তত্ত্ব নাহি জানি ॥
পণ্ডিত না হয়ে সেই না বুঝে বিচার। জগতের ভিন্ন তুমি জগতের সার ॥
নিরাকার ব্রহ্ম তুমি নির্গুণ বিকার। তহু তোমা হতে সৃষ্টি পালন সংহার ॥
সত্বগুণে শুক্লবর্ণ ধরি কলেবর। জগত পালন তুমি কর মহেশ্বর ॥
রজোগুণে রক্তবর্ণ ধরি সৃষ্টিকর। তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ ধরিঞা সংহার ॥
এখনে করিবে তুমি লোক পরিত্রাণ। মোর ঘরে অবতার কৈলে ভগবান্ ॥

ব্রহ্ম স্তবের কিয়দংশ—

স্তুতিযোগ্য প্রভু তুমি নবঘনশ্যাম। বিজলী উজ্জ্বল পীতবাস পরিধান ॥
নব গুঞ্জ অবতংশ শ্রবণ ভূষণ। শিখণ্ড মণ্ডিত কেশ প্রসন্ন বদন ॥
আজানুলম্বিত বনমালা-বিললিত। বেণুবেত্র বিষান কবল বিরাজিত ॥
অমল কমল দল চরণ যুগল। নমো নমোনন্দ গোপসুত মনোহর ॥
এহি দিব্য রূপ দেব আনন্দ নিবাস। মোকে অনুগ্রহ যাতে হইল প্রকাশ ॥
যে যেরূপে ভকতে দেখিতে ইচ্ছা করে। সেহিরূপ ধর তুমি নানা অবতারে ॥
পঞ্চভূত বিরাজিত শুদ্ধ সত্বময়। তথাপি ইহার তত্ত্ব কেহ না বুঝয় ॥
মুঞি ব্রহ্মা হয়ে চিত্ত করি নিরোধন। মহিমা জানিতে কিছু না হোলোঁ ভাজন॥
কি পুন সাক্ষাতে সুখ অনুভব রূপ। জানিব তোমার প্রভু তোমার স্বরূপ ॥
তোমা না জানিলে নহে জীব পরিত্রাণ। সবে তাতে আছে এক উপায় মহান্॥
জ্ঞানযোগে যতনে তেজিঞা দূরতরে। কেবল তোমার কথা শ্রুতিযুগে ধরে॥
সাধু মুখে মুখরিত সাধু সন্নিধানে। তন্ব মন বচনে তোমার কথা শুনে ॥
সবে জিয়ে হরিকথা করিঞা জীবনে। যথা তথা থাকি মাত্র করুক শ্রবণে ॥
সেহি জন সবে প্রভু তোমামাত্র পায়। তিনলোকে তার কেহো অন্ত নাহি পায়॥

তোমার ভকতি সর্ব্ব কল্যাণস্রাবিনী। তাহা পরিহরি যেবা তত্ত্ব নাহি জানি॥
তত্ত্ব জ্ঞান হেতু করে নানা তপ ক্লেশ। সবে তার ক্লেশমাত্র হয়ে অবশেষ॥
ক্ষুদ্র ধান্য তেজি যেন তণ্ডুলের আশে। সেহো যেন বড় বড় ধান্য লৈঞা বসে॥
সবে তার পরিশ্রম কিছু নহে আর। তোমাবিনে জ্ঞান যোগে ক্লেশমাত্র সার॥
পূরবে সাধিল জ্ঞান যোগে যোগিগণে। জ্ঞান পথ সিদ্ধি নৈল যোগপথ নহে॥
তবে তারা বিচারিঞা মনে কৈল সার। ভক্তি যোগ বিনা কভো নাহিব নিস্তার॥

অক্রূরের গোকুল গমন। দীর্ঘছন্দ।

রজনী বঞ্চিঞা ঘরে অক্রূর প্রভাত কালে গোকুলে চলিলা হরষিতে।
রথে করি আরোহণ এহি চিন্তে মনে মন মোর ভাগ্য হৈল আচম্বিতে॥
শুন শুন নর পতি অক্রূর মহামতি পথে পথে এহি চিন্তে মনে।
মুঞি কুন তপ কৈনু মহাজনে দান দিনু আজি কৃষ্ণ দেখিব নয়ানে॥
এহি কি ঘটিল মোর প্রভু দরশন হৈব মোর মুই বড় অধম মন্দমতি।
যেন বেদ অধিকার শূদ্রে নাহি ব্যবহার যেন মুই হীন অধোগতি॥
তবে বোলে অক্রূর অমঙ্গল গেল দূর আজি মোর জনম সফলে।
যোগী ধ্যান করে যার মুঞি হৈমু নমস্কার সে প্রভুর চরণ কমলে॥
কংশ অনুগ্রহ কৈল গোকুলে পাঠাঞা দিল পাদ পদ্ম দেখিমু নয়ানে।
যার নখমণি জ্যোতি পাঞা হৈল দিব্য গতি পার হৈল মহা মহা জনে॥
ব্রহ্মা আদি ভব সুরে ধ্যানে যার পূজা করে লক্ষ্মী দেবী করয়ে চিন্তনে।
এমত দুর্লভপদ বনে বনে উপগত গোপী কুচ কুঙ্কুম মণ্ডলে॥
ঝলিত কপোল দেশ কুটিল অলক কেশ নব গুঞ্জা বিমল লোচন।
নিশ্চয়ে দেখিব আজি শ্রীমুখ মণ্ডল সেহি প্রদক্ষিণ করে মৃগগণ॥

শ্রুতিস্তবের কিয়দংশ—

জয় জয় হে প্রভু অজিত ছিদ মায়া জীবের আনন্দ হরে গুণময়ী হৈঞা॥
সর্ব্ব শক্তি ধর তুমি আনন্দ বিলাস তোমা হনে সর্ব জীব শক্তি পরকাশ॥
সর্ব্বেশ্বর ধন্য তুমি সভার ঈশ্বর স্বতন্ত্র না হয়ে জীব জড় কলেবর॥
যখন প্রকৃতি সঙ্গে বিহর আপনে তখনে তোমার গুণ গায়ে শ্রুতিগণে॥
দেখি শুনি যত কিছু শ্রবণ নয়নে ব্রহ্ম করি মানে সব মহা যোগিগণে॥
যদি বল শ্রুতিগণে নানা দেব ভজে শশিসূর্য্য পুরন্দর প্রজাপতি পূজে॥

বহু মুখে শ্রুতিগণ নানা মূর্ত্তিভেদে সর্ব্বময় প্রভু তুমি সর্ব্বভাবে সেবে ॥
যথা তথা কর যদি পদ আরোপণ এ গাছ পাথর কিবা গিরি আরোহণ ॥
তছু তুমি বিনা নাথ না বলিব আন এহিরূপে সর্ব্বময় তুমি ভগবান্ ॥
এহি সে কারণে নাথ মহা মুনিগণে তোমার পবিত্র কথা সুধা সিন্ধু পানে।
অশেষ দুষ্কৃতি হরি লভিল মুকুতি এহি গুণনিধি তুমি ভকতের গতি ॥
গুণময়ী মায়ামৃগী নটন পণ্ডিত পরমপুরুষ তুমি ত্রিগুণ বর্জ্জিত ॥
কথামাত্র শ্রবণে সকল পাপ হরে ভক্তি করি যেবা ভজে কি কহিব তারে॥
তত্বজ্ঞান যোগে যার শোধিত অন্তর ভকতি করিঞা ভজে চরণ যুগল ॥
অখিল পরমানন্দ পদ সুখময় কি পুন কহিব তার কুন গতি হয় ॥
তোমার পাদারবিন্দ ভক্তি হীন জন। চম্মের মোষক যেম বিফল জীবন ॥
যদি বোল সুখ ভোগ করে নিরবধি। ভক্তি হীন জনেব না হয় কুন সিদ্ধি ॥
যার অনুগ্রহে সৃষ্টি করে সুরগণে। ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করে বিবিধ বিধানে ॥
ব্রহ্মাণ্ড সৃজিঞা কর ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ। প্রলয়ে সকল তুমি থাক অবশেষ ॥
কর্ত্তা কার্য্য কারণের পর সত্যময়। তোমা বিনা নাথ কার কিছু সিদ্ধ নয় ॥
ভকত জনের তুমি সর্ব্বত্র কল্যাণ। না ভজিলে কভো তার নহে পরিত্রাণ ॥
ইত্যাদি

কবি, হরিবংশও রচনা করিয়াছিলেন, যথা :—
হরিবংশে কহিলাঙ করিঞা বিস্তার। ভাগবতে কহি সার করিঞা উদ্ধার ॥

কবির রচিত হরিবংশ দেখি নাই। কবি, হরিবংশ রচনা করিয়া ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের বত্রিশ উপমহন্তের মধ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য একজন। চৈতন্য ভাগবতে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার গুরু গদাধর পণ্ডিত, চৈতন্যের শক্তি প্রসিদ্ধ গদাধর। যে রঘুনাথ পণ্ডিত, অশ্বমেধ পঞ্চালিকা রচনা করেন, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি কিনা জানিতে পারি নাই। অশ্বমেধ পঞ্চালিকাকারের সময় মুকুন্দদেব উৎকলের রাজা ছিলেন। রঘুনাথ তাঁহার রাজ্য নাশ দেখিয়াছিলেন। পণ্ডিত গদাধর দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন; তাঁহার শিষ্য রঘুনাথের সহ উৎকলাধিপ মুকুন্দদেবের সাক্ষাৎ হওয়া বিচিত্র নয়। এই কারণে বোধ হয়, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রচয়িতা ও অশ্বমেধ পঞ্চালিকা রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি হইবেন।

প্রেমতরঙ্গিণীর মুদ্রণ আবশ্যক। যে হস্তলিখিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহা ১১৯০ সালে লিখিত।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

গাথা।

পীযূষ-সিঞ্চিত-সমীরণ-চঞ্চল
কাঞ্চন-অঞ্চল দোলে রে।
বিবুধ-বন্দিত বিধু-বিনিন্দিত
চরণে জনমম ভোলে রে।
চম্পক-অঙ্গুলি-সকরুণ-পরশে
বীণা পঞ্চমে বোলে রে;
জ্যোতিষ-দরশন-বেদ গণিত কবি-
-তা শোভে কোমল কোলে রে।
শুভ্র-রজত-গিরি-কিরণ-বিকীরণে
অন্ধ নয়ন-যুগ খোলে রে;
মাতিল ত্রিভুবন বাক্য-বিধায়িনী
বাণী-জয়-রব রোলে রে।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

প্রদীপ।

অগ্রহায়ণ ১৩০৭।

এই সংখ্যায় 'প্রদীপের' তৃতীয় বর্ষ সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা সময়ে সময়ে 'প্রদীপের' ভ্রমক্রটির উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া প্রদীপ-পরিচালক মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। নানা কারণে 'প্রদীপ' বঙ্গ সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইবে,— ভালকে আরও ভাল করিবার জন্যই আমরা সমালোচনা করিয়া থাকি; কর্ত্তব্যের অনুরোধে চিরদিনই তাহা করিতে হইবে। সুতরাং উদ্দেশ্য বুঝিয়া সকলেই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন বলিয়া ভরসা আছে। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা 'তাড়না' বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। এই সংখ্যায় 'রামসিং' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। ভারতবর্ষের শিল্পীদিগের জীবন ও কারুকার্য্য সম্বন্ধে বঙ্গ সাহিত্য এখনও নিতান্ত নীরবে কালযাপন করিতেছে। রামসিংহের ন্যায় শিল্পী সকল দেশেই গৌরব লাভ করিতে পারিতেন; কেবল এ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াই রামসিং অজ্ঞাত ও অশ্রুতপূর্ব্ব নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। প্রদীপ তাঁহার প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত করিয়া প্রতিভার সমাদর রক্ষা করিয়াছেন। অনেকদিনের পর বঙ্গ সাহিত্যে পুনরায় 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' সংকলনের চেষ্টা করিয়া শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার সকলের নিকটেই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। যে সকল প্রবাদ লোকপরম্পরায় ব্যবহৃত হইয়া সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাহাদের মূলানুসন্ধান করা প্রয়োজন— এ বিষয়ে বহু জনের চেষ্টা থাকা প্রার্থনীয়। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের 'রস্কিন' নামক কলা-সমালোচনাত্মক গদ্য প্রবন্ধ এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে,— এই শ্রেণীর সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ, লেখক পাঠক উভয়কেই সমুন্নত করে।

অন্তঃপুর।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

অন্তঃপুর-সম্পাদিকা বনলতা দেবীর অকাল মৃত্যুতে 'অন্তঃপুর' তরুণ জীবনে বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছে। নূতন সম্পাদিকা নবোৎসাহে পত্রিকাপরিচালনে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। এই সংখ্যায় শ্রীমতী কুলবালা দেবীর 'অলঙ্কার' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি রচনাকৌশলে ও বিষয়বিন্যাস-নৈপুণ্যে মহিলালিখিত গদ্য প্রবন্ধের মধ্যে উচ্চাসন লাভের যোগ্য হইয়াছে। অলঙ্করণ-স্পৃহা স্বাভাবিক হইলেও দিনে দিনে উহা অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সমগ্র অন্তঃপুর আক্রমণ করিয়া ফেলিয়াছে—বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকেই মহিলা-মণ্ডলীর দৃষ্টি ধাবিত হইয়াছে। প্রবন্ধ অপেক্ষা সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারায় এই সংক্রামক ব্যাধির অতিবিস্তার নিরস্ত করিতে পারিলে দরিদ্র স্বামিকুলের পক্ষে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর ঘটিত,—কিন্তু যেমন দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমরা এবিষয়ে নিতান্ত নিরুপায়।

সাহিত্য।

অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

"১৩০৪ সালের ভূকম্প" প্রবন্ধটি সুলিখিত। লেখক মহাশয় সর্ব্বশেষে আশঙ্কার আভাস দিয়া বলিতেছেন, "তাই বোধ হয়, পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামের ভাগ্যে এখনও অনেক বিপত্তি লিখিত আছে।" শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের 'তৈমুরলঙ্গ' পাঠ করিয়া আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছি; রামপ্রাণ বাবু সর্ব্বপ্রথমে আমাদের কাছেই ধরা দিয়াছিলেন,—তাঁহার রচনার সাফল্য দেখিলে আমাদের গৌরব-ভাবোদ্রেক স্বাভাবিক! 'আশা-হত' হেমেন্দ্র বাবুর হোমিওপ্যাথিক মাত্রার একটি গল্প। বলাবাহুল্য, আশা-হত পড়িয়া পাঠকেরও আশা-হত হইবার ভরসা আছে; এই হিসাবে ইহার নামকরণ অব্যর্থ হইয়াছে! হেমেন্দ্র বাবু সুলেখক,—'অন্ধ' প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার সুলেখা-সংযুক্ত গল্প আর দুই-একটি কি দেখিতে পাইব না? "উদয় ও অস্তে সূর্য্যমণ্ডল বড় দেখায় কেন?" বহুপূর্ব্বে সাধনায় ও ইতিপূর্ব্বে প্রদীপে বিজ্ঞতর ব্যক্তির দ্বারা এ সম্বন্ধের যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে! আর কেন? "সম্পাদকের পত্নী" সহযোগী

সাহিত্য হইতে সংগৃহীত। কোন সম্পাদক-পত্নী স্বয়ং লিখিতেছেন, "রমণীর পক্ষে সম্পাদককে বিবাহ করা বড় অবিবেচনার কার্য্য।" লেখিকা সম্পাদক-দিগের গার্হস্থ্য জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে "সম্পাদকদিগের পক্ষে অকৃতদার থাকাই বিধেয়।"—ইহা ত গেল সম্পাদকপত্নীর কথা; সম্পাদকের মতটাও জানা দরকার। সংগ্রাহক মহাশয় নিজে কিছু বলিতে সাহস পান নাই, কারণ "তিনি সম্পাদক নহেন, তাঁহার সম্পাদক হইবার যোগ্যতা যেমন অল্প, সম্ভাবনাও সেইরূপ সুদূরপরাহত!" আমাদের যখন সম্পাদক হইবার যৎকিঞ্চিৎ যোগ্যতা আছে, তখন একেবারে নীরব থাকা শোভন হয় না! আমরাও সম্পাদকপত্নীকে অনুমোদন করিয়া বলিতেছি—"সম্পাদকদিগের পক্ষে অকৃতদার থাকাই বিধেয়!" 'যাত্রাপথে' শীর্ষক বিদেশী গল্পটি ১৩০২ সালের আষাঢ় সংখ্যার সাহিত্যে একবার অনুবাদিত হইয়াছিল! সাহিত্যের 'কবিতাকুঞ্জের' সকল ফুলগুলিও প্রত্যগ্র নহে; বাসী ফুলও সম্পাদক মহাশয় পাঠকদের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া, নূতন বলিয়া চালাইয়া দেন! "হৃদয়ের আলো" কবিতাটি ১৩০৪ সালের শ্রাবণ মাসে একবার আমাদের হৃদয় আলো করিয়াছিল! তিন বৎসর পরে আবার তাহার এই দ্বিতীয় সংস্করণ! এক যুবতী দুইবার জবাই করার জন্য এই সাহিত্যের দরবারেই 'দাসীকে' অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এ স্থলে একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িয়া যায়:——"রাজার ছেলেটা অতি নিষ্ঠুর, একদিন সে একটি মাকড়সা বধ করে! রাজা পণ্ডিতের কাছে বিধি-প্রার্থী হইলেন। পণ্ডিত মহাশয় অশেষশাস্ত্রসাগর মন্থন পূর্ব্বক শ্লোকাবলী আওড়াইয়া প্রমাণ করিলেন, মাকড়সা-বধ ব্রাহ্মণ বধের তুল্য, এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্য দুই লক্ষ টাকার একখানি ফর্দ্দ দাখিল করিলেন। ঘটনাক্রমে কিছু দিন পরে পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রটীও একটী মাকড়সার প্রাণ সংহার করিল! কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কোন ব্যবস্থাই হইল না;—রাজা সে কথা পণ্ডিতকে স্মরণ করিয়া দিলেন। পণ্ডিত বলিলেন, "ভাল দেখেছেন রাজা মশা'য়, মাকড় মাল্লে আবার কি হয়? মাকড় মাল্লে ধুকড় হয়!" যে প্রবন্ধ সাহিত্যে বাহির হইয়াছে, তাহা পুনরায় সাহিত্যেই প্রকাশ করাকে অবশ্য অজ্ঞানকৃত অপরাধ বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই! আশা করি,

সাহিত্য এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

ভারতী।

অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের একটী সুমধুর গান। উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

"তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!
তব নন্দন-গন্ধ-মোদিত
ফেরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো!
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল-মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত-ছন্দে!
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো!"

"লুসার্ণ ও দার্জ্জিলিং", "নৈষধ চরিত" ও "বীরভদ্র মর্দ্দরাজ" প্রবন্ধগুলি সুখ-পাঠ্য! এ সংখ্যার ভারতী পাঠ করিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

আরতি

তোমারি আরতি মাগো, তোমারি আরতি—
বন্দনার গান,
জগতের প্রতি তন্ত্রী আনন্দে ঝঙ্কারে
প্রতি পল নিশি দিনমান !—
সাগরের মর্ম্ম ভেদি' উঠে সেই ভীষণ উদ্গার,
পবনের কণ্ঠ হ'তে ছুটে যেই বিষম ফুৎকার,
দিগন্তের প্রান্ত হ'তে টুটে যেই বজ্রের হুঙ্কার
গগন বিদারী :
তোমারি আরতি মাতঃ—আরতি তোমারি।

তোমারি আরতি মাগো, তোমারি আরতি—
বন্দনার গান,
স্বর্ণ প্রভাতে উঠে, ধূসর সন্ধ্যায়
প্রতি পল নিশি দিনমান !—
নবীন প্রত্যূষে সেই তারে তীরে উদাত্ত ওঙ্কার,
ফুলে ফুলে মত্ত সেই মধুপের মদির-ঝঙ্কার,
মানবের কোলাহল দিন-ব্যাপী—আশার, শঙ্কার,
বিহগ-কাকলি :
তোমারি আরতি মাতঃ—তোমারি সকলি।

তোমারি আরতি মাগো, তোমারি আরতি—
বন্দনার গান,
জাগ্রত জগৎ গাহে সুষুপ্ত প্রকৃতি
প্রতি পল নিশি দিনমান !—
কম্প্রবক্ষে স্তব্ধ রাত্রে গাহে গান আকাশের তারা,

গিরি হ'তে নেমে আসে, নির্ঝরের সঙ্গীতের
তরঙ্গ আছাড়ে শির সাধনায় মত্ত আত্মহারা-
উর্জ্জঃ কল কল :
তোমারি আরতি মাতঃ—তোমারি সকল !

তোমারি আরতি মাগো, তোমারি আরতি —
বন্দনার গান,
জগতের যত কবি গাহে সবে মিলি'
প্রতি পল নিশি দিনমান !—
কম্বুকণ্ঠ অম্বুনাদ নিনাদে সে গম্ভীর মহান,
তরু উঠে মর্ম্মরিয়া, ঝিল্লী গাহে তন্দ্রাময় গান,
কোকিল কুহরি উঠে, পাপিয়ার সকরুণ তান
বনে বনে বনে :
তোমারি আরতি মাতঃ—তোমারি চরণে।

তোমারি আরতি মাগো, তোমারি আরতি—
বন্দনার গান,
সাধকের ভক্তচিত্তে অত্যুগ্র আগ্রহে
প্রতি পল নিশি দিনমান।—
তোমারে করিয়া কেন্দ্র উঠে তা'র মরমের ভাষা,
তোমারে করিয়া কেন্দ্র ফুটে তা'র হৃদয়ের আশা,
তোমারি সাধনে তা'র অবিরাম আকুল পিপাসা
ভীম দুর্নিবার :
তোমারি আরতি মাতঃ—আরতি তোমারি।

তোমারি আরতি মাগো, তোমারি আরতি —
বন্দনার গান,
সেবকের মুগ্ধ বক্ষে করিছে সংঘাত
প্রতি পল নিশি দিনমান !—
তোমারই বিশ্বরূপ ভূতলে, গগনে, সমীরণে,

তোমারি আত্মার ছায়া জগতের প্রতি স্থলে জলে,
অণুতে অণুতে তুমি আপনারে রেখেছ গোপনে
জননি ভারতি,---
তোমারি আরতি তাই---তোমারি আরতি!

তোমারি আরতি মাগো, তোমারি আরতি---
বন্দনার গান,
স্বতঃই উঠিছে কণ্ঠে উদ্দাম আবেগে
প্রতি পল নিশি দিনমান!---
অনাদি অব্যয় তুমি বাগীশ্বরি---বিশ্বমূলাধার,
তোমারে আশ্রয় করি চলিয়াছে বিরাট সংসার
সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম, ইতিহাস তোমারি প্রচার,
কবিতার রাণী,
হৃদয়ে হৃদয়ে নাচে তব রাজধানী!

তোমারি আরতি মাগো, তোমারি আরতি---
বন্দনার গান,
ক্ষুদ্র কণ্ঠ ক্ষুদ্র চিত্ত গাহিছে উৎসাহে
প্রতি পল নিশি দিনমান!---
সাধনার শক্তি দাও, কর্ণে দাও আশার আহ্বান:
"দুষ্প্রাপ্য নহে গো বৎস কীর্ত্তি যশঃ খ্যাতি ও সম্মান---
হস্তে আজি বাঁধ' 'রাখি' কালি তুমি পাবে শিরস্ত্রাণ,
সিংহাসন পরে,
আপনার প্রতিভার উদ্যমের বরে!"

---o---

ফা হিয়ান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবন-কাহিনী।

চীনদেশের শান্সী প্রদেশে ফা হিয়ানের জন্ম হয়। তিনি শৈশবে কুঙ্গ নামে পরিচিত ছিলেন। তৎকালে বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথা সকল দেশেই সমাদর লাভ করিয়াছিল। যাঁহারা সাংসারিক প্রতিবন্ধকের জন্য বা কোন অনিবার্য্য কারণে স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা পুত্রগণকে সন্ন্যাসী করিয়া পুণ্যসঞ্চয় কামনায় শৈশবেই তাহাদিগকে বৌদ্ধমঠে প্রেরণ করিতেন। তথায় দীক্ষার পর পূর্ব্ব নামোপাধি পরিত্যক্ত হইয়া নূতন নামোপাধি প্রদত্ত হইত;— নবীন সন্ন্যাসী অতঃপর সেই নামে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন।

কুঙ্গের বয়ক্রম যখন তিন বৎসর, তিনি সেই সময়ে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৌদ্ধমঠে বাস করিতে আরম্ভ করেন; তদুপলক্ষে তাঁহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ফা হিয়ান নাম ও শাক্যপুত্র উপাধি প্রদত্ত হয়। চীন ভাষায় শাক্যপুত্র শব্দ সংকুচিত হইয়া সী শব্দে পরিণত হইয়াছিল। ফা হিয়ানের বৌদ্ধাশ্রমের পূর্ণ নাম—— সী ফা হিয়ান।

ফা হিয়ান একরূপ আজন্ম সন্ন্যাসী। বৌদ্ধমঠে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়া, নিয়ত বৌদ্ধধর্ম্মের মতবিশ্বাস ও ক্রিয়া কলাপের সংস্রবে পরিবর্দ্ধিত ও সন্ন্যাসাশ্রমের অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম পালনে অভ্যস্ত হইয়া, ফা হিয়ান বাল্যজীবনেই অধ্যাপকবর্গের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফা হিয়ানের জ্ঞানানুরাগ প্রবল হইতে লাগিল। তৎকালে বিনয়পিটকের যে সকল গ্রন্থ চীন দেশে প্রচলিত ছিল, তাহাতে ফা হিয়ানের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ভারতভ্রমণ করিয়া বিনয়পিটকের সমগ্র সাহিত্য সংগ্রহ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ধর্ম্মজীবন কেবল আত্মোন্নতি সাধনের জন্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইত না। তাঁহারা লোকালয়ের অভ্যন্তরে বাস করিয়া জনসাধারণের জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা ও সদাচারের উন্নতি সাধনের জন্য যথা সাধ্য যত্ন করিতেন এবং সময়ে সময়ে প্রকাশ্য স্থানে সমবেত জন সাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের ধর্ম্মসাধনের সহায়তা করিতেন। ফা হিয়ান স্বয়ং বিনয়-পিটক অধ্যয়নের জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন স্বদেশে তাহার সমগ্র গ্রন্থ ও টীকা আনয়ন করিবার জন্যও সেইরূপ কৃতসংকল্প হন। এখন কোন দূরদেশে গমন করিয়া তদ্দেশের প্রচলিত সাহিত্য স্বদেশে আনয়ন করা নিতান্ত সহজ কথা;--- তাহাতে তদ্দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে হয় না, সময় ও শ্রম নষ্ট করিতে হয় না; কেবল অর্থব্যয় করিয়া মুদ্রিত পুস্তকরাশি ক্রয় করিয়া আনিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সেকালে এ সকল সুবিধা ছিল না;--- পুস্তক সংগ্রহের জন্য স্বয়ং ভাষাশিক্ষা করিয়া পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া লইতে হইত। কেবল মরুগিরি উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হওয়াই কত আয়াস সাধ্য ব্যাপার; তাহার উপর ভাষাশিক্ষা গ্রন্থাধ্যয়ন ও গ্রন্থ সংকলনের গুরুতর শ্রমের কথা স্মরণ করিলে,--- ফা হিয়ানের সংকল্পে সকলকেই বিস্মিত হইতে হইবে। সেকালে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় ছিল না; বৌদ্ধ শ্রমণগণ সর্ব্বদা সকল দেশেই এইরূপ অধ্যবসায় ও জনহিতাকাঙ্খার পরিচয় প্রদান করিতেন। পরিমিতাহার, পরিমিতাচার ও পরিমিত বিশ্রামের পর যাহা কিছু সময় সমস্তই ধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হইত। পরসেবা, ধর্ম্মপ্রচার, ও জ্ঞানবিস্তার ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিচিত ছিল;--- সুতরাং ফা হিয়ানের সাধু সংকল্প বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল।

ফা হিয়ানের সাধু সংকল্পে হুইকিং, টাওচিং, হুইইং, হুইউ প্রভৃতি কতিপয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারত যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রায় তিনশত বৎসর হইতে এইরূপ তীর্থ যাত্রা প্রচলিত হইয়াছিল। বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের নিকট সম্প্রতি যে দুইখানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে চীনভাষায় পুরাতন তীর্থযাত্রীর নাম খোদিত আছে। চৈনিক তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে বুদ্ধগয়ায় একটি চৈনিক মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথমাবস্থায় পুণ্যভূমি দর্শনের অনুরাগই প্রবল ছিল;

সুতরাং সে সকল পুরাতন তীর্থযাত্রীর কোন তীর্থভ্রমণ কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উত্তর কালে পুণ্যসঞ্চয় কামনার সহিত জ্ঞানানুরাগ মিশ্রিত হইয়াছিল। তজ্জন্য ফা হিয়ানের সমসাময়িক বহু সংখ্যক চৈনিক সন্ন্যাসী ভারতভ্রমণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে মধ্য-এসিয়ার পথে অগ্রসর হওয়া সহজ নহে বলিয়াই অনেকে নিরস্ত হইতেন; ফা হিয়ানের উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া একদল নবীন সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন।

মধ্য এসিয়ার বিচিত্র ইতিহাস বহুবিস্ময়ের আধার। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত মধ্য এসিয়ার বহু জনপদের ইতিহাস একসূত্রে গ্রথিত। একদা এই সকল দেশে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে শিল্প বিজ্ঞান জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চা কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। মহাচীনের পশ্চিম সীমা হইতে কাস্পিয়ান হ্রদের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ এক সময়ে বহুরাজ্যে ও রাজধানীতে সুশোভিত ছিল। তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা হইতে ভূমধ্যসাগরতীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ সেইরূপ বহুরাজ্য ও বহুরাজধানীতে পরিপূর্ণ ছিল। এই দ্বিধা বিভক্ত বিস্তীর্ণ জনপদে অতি পুরাকাল হইতে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে বাণিজ্যে পুরাকালের প্রসিদ্ধ রাজ্যমাত্রেই সমুন্নত হইয়াছিল। এই বাণিজ্যপথের আধিপত্যলাভের জন্য এক জাতির পর অন্য জাতি সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং এই সকল জনপদে কখন চীন, কখন তাতার, কখন তুরান, কখন ইরান, কখন বা গ্রীসীয় যবন অধিকার বিস্তার করিয়া কিয়ংকালের জন্য সুখসৌভাগ্য উপভোগ করিয়াছে। এই সকল বিপ্লবে রাজ্য ও রাজধানী নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে;--- আজ যেখানে দুর্ভেদ্য দুর্গ, কাল সেখানে বিজন বন; আজ যেখানে দুর্গম গহন, কাল সেখানে বিচিত্র রাজধানী জল বুদ্বুদবৎ উত্থিত ও পতিত হইয়াছে। এই সকল বিপ্লবের মধ্যেও ভারতীয় বাণিজ্য স্রোত শুষ্ক হয় নাই কেন, আজ কাল তাহা ক্রমশঃ আলোচিত হইতেছে। রাজ্যের জন্য কেহ রাজ্যাক্রমণ করিত না; বাণিজ্য পথের আধিপত্যলাভের জন্যই লালায়িত হইত; সুতরাং বাণিজ্য স্রোত রক্ষা করাই সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যে বাণিজ্য

প্রবাহের সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষাও সভ্যতা বহুবিপ্লবের মধ্যেও অব্যাহত গতিতে দেশে দেশে প্রবাহিত হইত।

ফা হিয়ান খৃষ্টীয় ৩৯৯ অব্দে তীর্থযাত্রা করেন। তখন চীনের সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমায় এইরূপ একটি রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইতেছিল,— তজ্জন্য সে পথে নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তৎকালে বৌদ্ধশ্রমণের সন্ন্যাসবেশ সকল দেশেই সমাদর লাভ করিত বলিয়া ফা হিয়ান ও তাঁহার সহযাত্রিগণ সাহস করিয়া মঠ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

অতঃপর ফা হিয়ানের জীবন কাহিনী তাঁহার তীর্থভ্রমণ কাহিনীর সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল। তিনি বহুক্লেশে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া পুণ্যতীর্থ পর্য্যটন ও ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের তীর্থভ্রমণের পর সমুদ্র পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার সঙ্গে বহুগ্রন্থ চীনদেশে উপনীত হয়। যে সকল গ্রন্থ এখন ভারতবর্ষেও দুষ্প্রাপ্য তাহা চীন যাপান তিব্বৎ ব্রহ্ম ও সিংহলে অনুসন্ধান করিয়া ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হইবার ইহাই প্রধান কারণ। যাঁহারা ভারতবর্ষে তীর্থযাত্রা করিতেন, তাঁহারাই কিয়ৎপরিমাণে গ্রন্থসংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন। তথায় এই সকল গ্রন্থ পুণ্যভূমি হইতে আনীত বলিয়া জনসাধারণের নিকট সবিশেষ সমাদর লাভ করিত। তাহারা অদ্যাপি এই সকল পুরাতন গ্রন্থের পূজা করিয়া থাকে।

ভারতীয় ধর্ম্ম পুস্তকরাশির অনুবাদ সম্পাদন করিতেই ফা হিয়ানের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি এই কার্য্যে শেষ পর্য্যন্ত যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এই কার্য্যে একজন ভারতবাসী বৌদ্ধ ফা হিয়ানের সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে ধর্ম্ম প্রচারার্থ চীন দেশে অবস্থিতি করিতেন। ফা হিয়ান তাঁহাকে শাক্য বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই বৌদ্ধাচার্য্যের নাম---- বুদ্ধভদ্র। কত দেশে এইরূপ ভারতনিবাসী বৌদ্ধসন্ন্যাসী ধর্ম্মপ্রচারে ও ধর্ম্মগ্রন্থানুবাদে কত জাতির কিরূপ সহায়তা সাধন করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস বর্ত্তমান থাকিলেও সেকালের বহুবৃত্তান্ত অবগত হইবার সুবিধা হইত। যাঁহারা এইরূপে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতা সুরক্ষিত করিয়া জন্মভূমির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন,

ইতিহাসের অভাবে ভারতবর্ষের সাহিত্য সেবকগণ তাঁহাদের পুণ্যনামের স্মৃতি সমাদর রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ফাহিয়ান এইরূপে আজন্ম-সন্ন্যাসব্রতউদযাপন করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ফা হিয়ান স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মধ্যভারতে উপনীত হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল;--- ইহাতেই তাঁহার ভ্রমণক্লেশের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তিনি ত্রিশটি বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং এই দীর্ঘযাত্রার সহস্র পরিশ্রমে কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত না হইয়া, বৃদ্ধবয়সে শাস্ত্রানুবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন,--- ইহাতেই তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ও স্বদেশ বাৎসল্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ফা হিয়ানের স্বদেশের লোকে নানাকারণে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিয়াছেন;--- আমরা ভারতবাসী হইয়াও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যাত্রারম্ভ।

ফা হিয়ান ও তাঁহার সহযাত্রী বৌদ্ধশ্রমণগণ খৃষ্টিয় ৪০০ অব্দে চীনদেশের অন্তর্গত চাঙ্গন নামক স্থান হইতে তীর্থ-যাত্রা করেন। পথে বর্ষাকালে বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা চীনসীমান্তস্থিত চাঙ্গীয়ে নামক দুর্গদ্বারে উপনীত হইলে, দেখিতে পাইলেন যে,— রাজপথ অবরুদ্ধ। তৎকালে সীমান্তসমর সম্পূর্ণ নিরস্ত না হওয়ায় রাজা তীর্থযাত্রিগণকে তথায় অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। এই স্থানে আরও কতিপয় তীর্থযাত্রী ফা হিয়ানের দলভুক্ত হইলেন। বর্ষাকাল অতীত হইবা-মাত্র যাত্রিদল রাজকর্ম্মচারিবর্গের সহায়তায় টুনওয়াঙ্গ নামক প্রান্তদুর্গে

উপনীত হইয়া তথা হইতে চীন সাম্রাজ্যসীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া মরু মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই মরুস্থল নতোন্নত বালুকাস্তরে সমাচ্ছন্ন,--- তাহার উপর নিরন্তর উষ্ণবায়ু প্রবাহিত। যে দিকে যতদূর দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, মরুস্তর ধূ ধূ করিতেছে,--- পথ নাই, পথের চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই; কেবল স্থানে স্থানে অস্থিরাশি পথপ্রদর্শনার্থ ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে! তীর্থযাত্রিগণ সপ্তদশ দিবস এই দুর্গম মরুমধ্যে অগ্রসর হইবার পর লোকালয়ের দর্শনলাভ করিলেন। তাঁহারা যে রাজ্যে উপনীত হইলেন তাহার নাম— সেনসেন। চীনসাম্রাজ্য অতিক্রম করিবার পর ইহাই সর্ব্বপ্রথম পররাজ্য।

এ রাজ্য বন্ধুর ও অনুর্ব্বর। জনসাধারণ চীনরাজ্যের লোকের ন্যায় বসনভূষণ ব্যবহার করিত এবং ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলন করিত। এখানে চারি সহস্র হীনযান-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহারা এবং বৌদ্ধমতাবলম্বিমাত্রেই ভারতীয় গ্রন্থাদির আলোচনা করিতেন। এই মরুপ্রান্তনিহিত অনুর্ব্বর দূরদেশে কি সূত্রে ভারতীয় বৌদ্ধমত ও ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রবেশলাভ করিয়াছিল, ফা হিয়ান তাহার কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। আধুনিক রুষীয় পরিব্রাজকগণ এই দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন। ইহার আধুনিক নাম— লিওলান।

এই স্থান হইতে প্রচলিত ভাষার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়; কোন্ দেশে কিরূপ ভাষা সচরাচর কথোপকথনে ব্যবহৃত হইত, ফা হিয়ান তাহার কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। লিখিত ভাষায় যে ভারতীয় ভাষাই ব্যবহৃত হইত, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বন্ধুর রাজ্য হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে পঞ্চদশ দিবস পর্য্যটন করিয়া তীর্থযাত্রিগণ উকি নামক দেশে উপনীত হন।

উকি দেশ নানা সময়ে নানা নামে কথিত হইত। পরবর্ত্তী তীর্থযাত্রিগণ ইহাকে উকিনী অথবা অগ্নি দেশ বলিয়া গিয়াছেন। ইহা টেঙ্গিস্ হ্রদের নিকটস্থ কারসহর নামক স্থান। ফা হিয়ান এই রাজ্যের বর্ণনায় কেবল এইমাত্র লিখিয়া গিয়াছেন যে,— "এখানে হীনযান-সম্প্রদায়ভুক্ত চারি সহস্র

সন্ন্যাসী বাস করিতেন ; তাঁহাদের আচার ব্যবহার চীন দেশের সন্ন্যাসীদিগের অজ্ঞাত বলিয়া বিশেষ অসুবিধা ঘটিত। তিনি রাজার অনুরোধে দুই মাস কয়েকদিবস অবস্থিতি করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে গমন করেন। তাঁহার সহযাত্রি-বর্গের মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিদেশের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন।" হিয়াঙ্গ থ্‌সাঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে এই দেশের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি এ দেশে পদার্পণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন ;—"এখানে বহু সংখ্যক নদী মিলিত হওয়ায় লোকে পয়ঃপ্রণালীযোগে ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করে। এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গোধূম খর্জ্জুর দ্রাক্ষা প্রভৃতি শস্য ও ফল উৎপন্ন হয়। বায়ু সুখকর ও কোমল। লোক-চরিত্র সরল। লিখিত অক্ষর প্রায় ভারতীয় অক্ষরের অনুরূপ। লোকে কার্পাস বা পশমী বস্ত্র ব্যবহার করে, মস্তকে উষ্ণীষ ব্যবহার করে না। বাণিজ্যে স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। এ দেশের ইতিহাস নাই ;—রাজবিধি সুগঠিত হয় নাই ; রাজা সাহসী হইলেও সমরকুশল বলিয়া বোধ হয় না।"

অগ্নি রাজ্য হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে একমাস পাঁচ দিবস নানাক্লেশে পথ পর্য্যটন করিয়া ফা হিয়ান খোটানে উপনীত হন। তিনি খোটানে আসিয়া ভারতীয় সভ্যতার প্রথম আভাস প্রাপ্ত হন। এই রাজ্য তৎকালে সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং জনসাধারণ বৌদ্ধমতেরই সমাদর করিত। সন্ন্যাসিগণ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ;—তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব ছিল। অধিবাসিগণ গৃহদ্বারে মন্দিরচূড়ার ন্যায় অত্যুচ্চ প্রাসাদচূড়া নির্ম্মাণ করিত,—তাহাতে নগরশোভা সবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। এই স্থানে ফা হিয়ান গোমতী নামক বিখ্যাত সংঘারামে আতিথ্য লাভ করেন। তথাকার পুরো-হিতগণ ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া নীরবে আহার করিতেন। ফা হিয়ান ও তাঁহার সহযাত্রিগণ এইস্থানে তিনমাস কয়েকদিবস অতিবাহিত করেন। খোটানের রথযাত্রা দেখিবার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন ;— এই রথযাত্রার বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের রথযাত্রা যে বৌদ্ধপর্ব্বের অনুকরণ মাত্র, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহার অনেক প্রমাণের উল্লেখ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধশিক্ষা তিব্বোহিত

হইবার সময়ে অনেক বৌদ্ধমত বৌদ্ধাচার বৌদ্ধপর্ব্ব ও বৌদ্ধপূজা এ দেশের হিন্দুমত ও হিন্দু যাত্রামহোৎসবের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। খোটানে বহুদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল; তাহার নিদর্শন কালক্রমে মরুভূমির বালুকাস্তূপে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন পুনরায় লোকলোচনের সম্মুখীন হইতেছে। এই দেশে বৌদ্ধমূর্ত্তি, বৌদ্ধমঠ ও বৌদ্ধ বিদ্যালয়ের অভাব ছিল না। এখানে রাজানুকম্পায় অশীতি বৎসরের পরিশ্রমে নবসংঘারাম নামক একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল;— তাহার কড়িকাঠ, স্তম্ভরাজি, দ্বার ও গবাক্ষপার্শ্ব স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। চীন দেশের অনেক তীর্থযাত্রী খোটানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন সাম্রাজ্যের মহারাণীর প্রেরিত রাজদূত সন্ন্যাসী সঙ্গ ইউন্ খোটানে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়,— খোটানরাজ স্বর্ণমুকুট পরিধান করিতেন; জনসাধারণ মৃত দেহের অগ্নিসংস্কার করিত। এই দেশ বহুপুরাতন নহে।

সঙ্গ ইউন্ খোটানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,— "খোটান রাজ্য সংগঠিত হইবার ১৬৫ বৎসর পরে রাজপুত্র বিজয়সম্ভব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে জনৈক বিদেশীয় বণিক্ বৈরোচন নামক বৌদ্ধভিক্ষুকে খোটানে রাখিয়া যান। বৈরোচনের চেষ্টায় রাজা ও প্রজাবর্গ বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হয়।" ভারতবর্ষের লোকেই যে খোটানের রাজ্য সংস্থাপন ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলনের মূল, তাহা অন্যান্য কারণেও সত্য বলিয়া বোধ হয়। খোটানের নিকটবর্ত্তী মরুস্থল হইতে যে সকল মুদ্রা ও পুরাতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা দুইটি ঐতিহাসিকতথ্য লাভ করা যায়। মুদ্রাগুলির কতক পালি কতক গ্রীক কতক চীন অক্ষরে খোদিত; এবং গ্রন্থগুলি কাগজে মুদ্রিত— হস্তলিখিত নহে! অল্‌বেরুণীর "ইণ্ডিকায়" দেখিতে পাওয়া যায়,— মধ্যএসিয়া হইতেই কাগজ প্রস্তুতের কৌশল সমগ্র মোসলমান রাজ্যে প্রচারিত হয়। এই দেশের অক্ষর পালি গ্রীক ও চীনের অক্ষরের মিশ্রণোদ্ভূত বলিয়াই বোধ হয়।

খোটানের রথযাত্রা শেষ হইবার পর সাঙ সাউ নামক ফা হিয়ানের সহযাত্রী কাবুলাভিমুখে প্রস্থান করেন; অন্যান্য সহযাত্রী সঙ্গে ফা হিয়ান

ইয়ারকন্দের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পঞ্চবিংশতি দিবস পর্য্যটনের পর ফা হিয়ান ইয়ারকন্দে উপনীত হন। তথায় রাজা প্রজা সকলেই বৌদ্ধ মতাবলম্বী ও পুরোহিতগণ মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এখানে একপক্ষ বিশ্রাম করিয়া ফা হিয়ান সুঙ্গলিঙ্গ পর্ব্বতে আরোহণ করেন। পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া পঞ্চবিংশতি দিবস পর্য্যটনের পর তীর্থযাত্রিগণ কিয়েশা দেশে উপনীত হন। এই দেশ বহু পুরাতন। রাজা পঞ্চবর্ষা পরিষৎ নামক মহোৎসব করিতেন; তদুপলক্ষে বহুদেশের বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী সমবেত হইত। এই দেশ পার্ব্বত্য ও শীতপ্রধান—শস্যের মধ্যে কেবল গোধূম উৎপন্ন হয়। এই স্থানের পর হইতেই বৃক্ষ লতাদি বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া পরিচিত। ইহার পরই উত্তরভারত—তথায় গমন করিবার সময়ে তীর্থযাত্রিগণকে চির-তুষারাবৃত পর্ব্বতচূড়া অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা ও পূর্ব্বসীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা কালক্রমে বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। উত্তরকালে সিন্ধুনদই ভারতসীমারূপে সুপরিচিত হয়। কিন্তু মহাচীনের তীর্থযাত্রিগণের ভ্রমণ কাহিনীতে অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সিন্ধুর পশ্চিমস্থ আফ-গানিস্থান বেলুচিস্থান ও তুর্কিস্থানের কিয়দংশকেও উত্তর ভারতের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্থান পার্ব্বত্য শীতপ্রধান রাজ্য—তথায় বহু সংখ্যক গ্রাম নগর বিদ্যমান ছিল। বলা বাহুল্য যে উত্তর ভারতের সকল সভ্যজনপদেই বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; এবং তদ্দেশের পণ্ডিতবর্গ অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কালক্রমে ইস্লামের ধর্ম্ম বৌদ্ধমতকে তিরোহিত করিবার পরেও কিয়ৎকাল এই সকল রাজ্যে ভারতবর্ষের রীতি নীতি প্রচলিত ছিল;—এক্ষণে সর্ব্বত্রই মোসলমান ধর্ম্ম ও মোসলমান আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

দোলযাত্রা ও য়ুরোপীয় উৎসব।

আমাদের দেশে দোলযাত্রার মত দ্বিতীয় উৎসব নাই। দোলোৎসবের বিশেষত্ব এই যে— ঐ সময়ে পরিচিত অপরিচিত পথিকগণ সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের এই উৎসবের মত য়ুরোপে অনেকগুলি উৎসব আছে - সে সকল উৎসবও পরিচিত অপরিচিত পথিক বৃন্দ লইয়া।

প্যারিসে "মিকারিম" উৎসব আমাদের দোলযাত্রার প্রায় সমসাময়িক। অনেক বিষয়ে সে উৎসব আমাদের দোলযাত্রার মত হইলেও, উভয়ের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ আমাদের উৎসব দিবাভাগে, প্যারিসের উৎসব রাত্রিকালে, আমাদের দেশে অপরিচিত-সম্ভাষণ প্রায় পুরুষে পুরুষে, সেখানে স্ত্রী পুরুষে। আমরা শাস্ত্রোক্ত আবীর পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ম্যাজেন্টা প্রভৃতি অপকারক বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, য়ুরোপ-বাসীরা কখন অপকারক দ্রব্য প্রয়োগ করে না। কেবল প্যারিসে নহে, য়ুরোপের সর্ব্বত্রই এইরূপ উৎসবে কঁফেটি (Confetti) ব্যবহৃত হয়। কঁফেটি নানাবর্ণের কাগজ চূর্ণ— কাহারও গাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষণিকের জন্য সে ব্যক্তি বহুরূপী মূর্ত্তি ধারণ করে বটে, কিন্তু পরক্ষণে পবনসংযোগে বা আপনা হইতেই তাহা ভূমিতে পতিত হয়। য়ুরোপীয় উৎসবদিনে পথিক ইচ্ছামত বস্ত্র পরিধান করিয়া গমনাগমন করিতে পারে কঁফেটিতে তাহার কোনও অপকার করিতে পারে না; এ দেশে দোলযাত্রার দিনে পথিক সভয়ে গমনাগমন করে; পরিধানে শুভ্র বস্ত্র মাত্র থাকিলেও ম্যাজেন্টা প্রভৃতি তাহা চিরতরে ব্যবহার-অযোগ্য করিয়া দিতে পারে!

য়ুরোপে উৎসবদিনে কঁফেটি প্রয়োগে উভয় পক্ষই আমোদিত হয়, এখানে নিতান্ত পরিচিত না হইলে আমোদ উভয় পক্ষব্যাপী হয় না। দোলযাত্রার দিন শ্রবণপথে কত কটূক্তি প্রবেশ করে, নয়ন পথে কত বল প্রয়োগ পতিত হয়, য়ুরোপে এরূপ কখন সম্ভবপর হয় না। য়ুরোপে বারমাস

জাতিবিচার নাই, এদেশে মনে হয় যেন কেবল দোলযাত্রার দিন জাতিবিচার থাকে না, কারণ অন্যসময়ে যাহাকে স্পর্শ করিতে লোকে সঙ্কুচিত হয়, এদিন সেই ব্যক্তিকে আবীর মণ্ডিত করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

উৎসব অন্তে, এ দেশে যেন এক অত্যাচারের চিহ্ন রহিয়া যায়; য়ুরোপে উৎসব রজনী প্রভাত হইলে, পথিকগণের গাত্রে কোন নিশান থাকে না বটে, কিন্তু রাজপথগুলি অতি সুন্দর দেখায়। নানাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার কাগজখণ্ড রাজপথগুলি আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, নগরের যেন নূতন শোভা সমুৎপন্ন হয়। যখন তুষারপাতে সমস্ত নগর শুভ্রবর্ণ ধারণ করে, সেই সময়ে এরূপ উৎসব উপস্থিত হইলে, তুষার কঁফেটি সংযোগে নগরের যে অপরূপ শোভা হয় তাহা বর্ণনাতীত।

প্যারিসের "নিকারিস" উৎসবের মত অষ্ট্যাণ নগরে এক উৎসব হয়, তাহার নাম পুষ্পযুদ্ধ। এ উৎসবে কঁফেটির পরিবর্ত্তে পুষ্প ব্যবহৃত হয়। পথিকগণ অজস্র পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা অভ্যর্থিত হইতে হইতে গমনাগমন করে। সে দৃশ্য দেখিতে অতি সুন্দর শকটমাত্রে পুষ্পরাশি আবৃত—ইতস্ততঃ পুষ্পরাশি নিক্ষিপ্ত প্রতিনিক্ষিপ্ত, হর্ষরোল গগনভেদিয়া সমুত্থিত। এই "পুষ্পযুদ্ধ" উৎসব কেবল অষ্ট্যাণে নহে, বোর্ণমাউথ প্রভৃতি অন্যান্য নগরেও হইয়া থাকে।

য়ুরোপ হইতে আমরা অনেক বিষয় অনুকরণ করিয়াছি ও করিতেছি। য়ুরোপের উৎসব অনুকরণ করিয়া, আমরা দোলোৎসবের সময় অপকারক অশাস্ত্রীয় দ্রব্য নিচয়ের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারি না কি?

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ দেব।

বাঙ্গালা কাব্য

ও

পদ্মানামক কাব্যগ্রন্থ।

কল্লোলিনী, মৃদু কলরবে, সাগর পানে ধাবিত হইতেছে; সৈকতভূমির সম্প্রসারণে, স্থানে স্থানে, সঙ্কীর্ণদেহা, স্বল্পতোয়া হইলেও, সে গতি অবিরাম রহিয়াছে। সময়ে যে সৌন্দর্য্যরাশি, যে সৌধাবলি, যে তরুরাজি, যে তটবিহারিণী প্রফুল্লতার মূর্ত্তি বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইত, কালপরিবর্ত্তনে, সে সৌন্দর্য্যময় দৃশ্যাবলির স্থানে, ধ্বংসাবশেষ কালিমাময় ছায়াপাত করিতেছে, তথাপি সে গতির বিরতি নাই, সকল অবস্থায় সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। অবস্থা ভেদে সে প্রবাহের সাময়িক হ্রাসবৃদ্ধি থাকিলেও, উহা বিরতিবিহীন;— উহা মানবাত্যাচারের স্পর্শবহির্ভূত। স্রোতস্বিনী, প্রভূত বালুকারাশির চাপে, অদৃশ্য হইয়াছে, তথাপি অন্তঃসলিলা; — সে স্তূপাকার বালুকারাশির অভ্যন্তরে, তাহার প্রবাহ অবিরাম চলিতেছে; সে প্রকৃতির গতির রোধ হয় না, কেন না সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় প্রকৃতি গতিশালিনী। অন্ধকারেও ফুল ফুটে, শৈবালজড়িত, কর্দ্দমময় সরোবরও কুমুদ কহ্লারিণীর শোভায় প্রভাসিত হয়। সৌভাগ্যের হাসি সুন্দর; দুঃখের অশ্রুরও মূল্য আছে। অনেক সময়ে, সৌভাগ্যের হাসি অপেক্ষা শোকের বিগলিত অশ্রুর প্রভাব অধিক। দুঃখে যত ভাবের গাঢ়তা, সুখে তাহা নাই; হাসি লঘু কান্না ভারী; সৌন্দর্য্য উভয়েই আছে। তুলনা করিলে, উদ্গত শোকাশ্রুর মোহিনী শক্তি প্রবলতর, শোকাশ্রু হৃদয়াবেগ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করে। মুক্তহৃদয়ের উচ্ছ্বাস অপেক্ষা রুদ্ধশ্বাস নিপীড়িতের অন্তঃক্ষুব্ধভাব গাম্ভীর্য্যের প্রভাব অধিকতর অনুভূত হয়। তাই বলিতেছিলাম, সুন্দর শ্যামল বনরাজির মধ্য দিয়া, সুশোভন দৃশ্যাবলি রেখাঙ্কিততীরা হইয়া, প্রবাহিত হইলেও, সাগরাভিসারিণীর গতির বিরাম নাই; এবার সৌধশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া, পর্ব্বতের [illegible] মানবচক্ষের অগোচরে, না মরু প্রদেশে

অভ্যন্তর বাহিনী হইয়া চলিলেও, সেই অবিরাম গতি প্রকৃতি সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ গতিশালিনী।

ভারত ভাগ্যপরিবর্ত্তনের দৃশ্যস্থল, হিন্দুসন্তান ভাগ্যনিগ্রহের মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত। হিন্দুর অদৃষ্টনেমি, ঘুরিতে ঘুরিতে, তাহাকে নিম্নতম দেশে উপনীত করিয়াছে, আর সে চক্রের আবর্ত্তনে, হিন্দুর কখন উর্দ্ধগতি হইবে কি না, জানি না, আশাপথ পরিষ্কার দেখিতে পাই না। বহু শতাব্দির এ ভাগ্য-নিগ্রহের, এ ভাগ্যবির্য্যয়ের মধ্য দিয়াও, এ রোগ শোক, দুঃখ, দারিদ্র, এ অতীত গৌরবের স্মৃতি ও উপস্থিত হীনতার অনুভূতি, এ পরনিগ্রহ, এ মর্ম্মপীড়া, এ রক্তাক্তহৃদয়, এ ঘোর তমসাচ্ছন্ন শ্মশানক্ষেত্রের অভ্যন্তর দিয়াও, সেই আর্য্যহৃদয় প্রবাহিত হইতেছে, হিন্দুর আদি কবি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, বেদগান করিয়া গিয়াছেন, হিন্দুসন্তান পূর্ব্বপুরুষের সকল হারাইয়া থাকিলেও, হিন্দুর মন সেই কবিকল্পনা, সেই কাব্যানুরাগ হইতে বিরত হয় নাই; হিন্দুর হৃদয়ে কবিত্ব স্রোত, এ মরুর নিম্নস্তর বাহিয়া, এখনও প্রবাহিত হইতেছে। হিন্দুসন্তান, বাহ্যিক জীবনের অগৌরব হইতে মুখ লুকাইবার জন্যই বুঝি, বাহ্যিক জীবনের গ্লানি ও যাতনা ভুলিবার জন্যই বোধ হয়, অন্তরাভিমুখে তাকাইয়া শান্তির স্থান অনুসন্ধান করিয়াছেন, করিতেছেন, তাই বাহিরে জড়ত্বপ্রাপ্ত হইলেও, অন্তঃস্রোত প্রবহমান রহিয়াছে। বাহিরে বালুকারাশির মধ্যে নৈরাশ্যের ছবি অঙ্কিত দেখিলেও, ফল্গু যে অন্তঃসলিলা, হিন্দুসন্তানের, অন্ততঃ বঙ্গীয় যুবকের, কাব্যানুরাগে, কবিকল্পনায় তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। হিন্দুসন্তানের আভ্যন্তরীন প্রবাহের বিরতি নাই; সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও, অনবরুদ্ধ গতিতে চলিয়া আসিতেছে। এত অধঃপতনের মধ্যেও বাঙ্গলা কাব্যের গতি ও উন্নতি আলোচনা করিলে, প্রতীতি হইবে, হিন্দুর, বঙ্গ সন্তানের জীবনালোক একেবারে নিভিয়া যায় নাই। এই দেখিয়াই বোধ হয়, সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সাহিত্যালোচনাই, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধনই বাঙ্গালীর সভ্যজগতে গৌরবলাভের একমাত্র উপায়"। অবশ্য বলিয়াছিলেন, সভ্যজগতে স্বাধীন জাতিসমূহের উন্নতির বা গৌরব লাভের পথ যাহা উন্মুক্ত আছে, বাঙ্গালীর পক্ষে হিন্দুসন্তানের পক্ষে তাহা রুদ্ধ দেখিয়া।

তথাপি, জাতীয় জীবনের অবস্থাভেদে, কাব্যের প্রকৃতিভেদ ঘটিয়া থাকে; অবস্থাভেদে কবিত্বের পথ সঙ্কীর্ণতা বা প্রশস্ততা প্রাপ্ত হয়। কবির কথা কখন শক্তিসঞ্চারিণী, কখন নির্জ্জনাশ্রুর পরিচায়ক; কখন গৌরবজ্ঞানের স্ফূর্তিময়ী ভাষা, কখন নিরুৎসাহ নির্জ্জীবতার দুর্ব্বল বাক্যস্ফুরণ, বা নৈরাশ্যের হাহাকার রব। কখন কবিবাক্য আমাদিগকে উৎসাহ ও উদ্যমশীলতায় উপনীত করে, কখন কবির নীরব ক্রন্দনের সঙ্গে কাঁদিয়া আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে হয়। সকল অবস্থায়ই, সকল ভাবেই কবিত্ব আছে; তবে কোথায়ও কবিত্ব তৈলপ্রদীপের স্তিমিতালোক, জীবনের ক্ষীণপ্রভা প্রকাশক; কোথাও কবিত্ব বৈদ্যুতিক আলোকে দিক প্রকাশিত করে, জীবন্ত ভাব বিরাজমান হয়; কখন কবিত্বে দুন্দুভিধ্বনি, জয়োল্লাসব্যঞ্জক, কখন তাহাতে মৃদু বায়ু সঞ্চালনে বৃক্ষপত্রের শর্ শর্ শব্দ, হুতাশের দীর্ঘশ্বাস-জ্ঞাপক। "Ye mariners of England"—ইত্যাকার গীতি গাইবার বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে কিছু নাই, কখনও থাকিয়া থাকিলেও তাহা বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিহিত, এবং বাঙ্গালীর কোমল শরীরে অস্ত্রাঘাত সহিবে না বলিয়া, ইংরেজরাজ যে যুদ্ধবিগ্রহের ভার সম্পূর্ণ নিজহস্তে লইয়াছেন সে রাজানুগ্রহের ফলে, কখনও কিছু হইবারও আশা নাই। বীরত্বের গান, জয়োল্লাসের গান গাইবার বাঙ্গালীর কিছুই নাই, কিছুই হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়না, তাই বাঙ্গালী কবি, পলাশীর যুদ্ধে, ইংরেজসৈনিক-মুখে, "রুল ব্রীট্যানিয়া" গাইয়া, জাতীয় জয়োল্লাসের গীতি গাইবার সাধ মিটাইয়াছেন। ইহার বৈপরীত্যেও কবিত্ব নাই তাহা নহে। "পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে"—ইহাও কবির উক্তি; তবে একে উৎসাহ, অন্যে নিরাশা; একে জীবন, অন্যে মৃতকল্পতা। কান্নায় কবিত্ব থাকলেও, কাঁদিতে কে চায়, জয়ের উল্লাসে নৃত্য করিতে পারিলে, রোদনে মনোবেদনার উপশমকে অনুসন্ধান করে। তবে সকলই ভাগ্যাধীন, ভাগ্য কাঁদাইলে কাঁদিতে হয় হাসাইলে হাসি সম্ভব। শৌর্য্যে, বীর্য্যে মনুষ্যত্ব বিকাশ, তেজঃপুঞ্জ বিকাশিত করিয়া গৌরবাগরি আরোহণ, ভাগ্যে না থাকিলে স্বাধীনতাসম্ভূত, বলবীর্য্যসমাহিত মহত্ব লইয়া জাতীয় মন উল্লাসিত,

উত্তেজিত, এবং স্বগৌরবরক্ষণে উদ্যমশীল করিবার আশয়ে কবির প্রয়াস, অবস্থাগতিকে অসম্ভব হইলে, যাহা সম্ভব তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বনের ফুল, গাছের পাখী, প্রণয়ের স্মৃতি, প্রেমালাপন, বাঙ্গালী কবি নির্ব্বিবাদে তাঁহার কবিতার বিষয় করিতে পারেন, স্বাধীনতার গীত, বীরত্বের গীত, তাঁহার গাইবার অধিকার নাই। স্বাধীনতার গান বঙ্গের কবি এক দিন গাইয়া নীরব হইয়াছেন, কেননা এরূপ গান বাঙ্গালী জীবনের উপযোগী নহে। জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায়, অতীত গৌরবের দুঃখস্মৃতি লইয়া নবগৌরব লাভে বা পূর্ব্বগৌরবের পুনরুদ্ধারে জাতীয় উদ্যমবিহীনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে পারেন, অশ্রুবিজড়িত কবিত্বে জাতীয় সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু তাহাও নীরবে, উচ্চ রবে কাঁদিবার অধিকার তাঁহার নাই।

হিন্দুসন্তান পিতৃপুরুষগণের সকল গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিলেও কবিত্বে, সাহিত্যে পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে যে সমর্থ, বঙ্গের হিন্দুসন্তানগণ তাঁহাদের সাহিত্যচর্চ্চা ও কাব্যানুরাগ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতেছেন। বলিয়াছি বাঙ্গলাকাব্যের গতি ও উন্নতি আলোচনা করিলে, ইহা প্রতীয়মান হইবে যে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ অনুসরণ করিলে, সাহিত্যে বঙ্গীয় হিন্দুর গৌরব সভ্যজগতে সংস্থাপিত হইতে পারিবে। অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় এ পথ অধিকতর উন্মুক্ত করিয়াছে, অথবা সে শিক্ষার অভাবে এ উন্নতি লক্ষিত হইত না। কিন্তু আলোক একেবারে নির্ব্বাপিত হইলে, তাহা সহজে পুনরুদ্দীপিত হইত না, নদী শুষ্ক মরুতে পরিণত হইলে, সে খাতে জলপ্রবাহ শীঘ্র সম্ভাবিত হইত কি না সন্দেহ স্থল। হিন্দুর হৃতে চণ্ডী দেবভাষায় ক্রীড়া করিতেছিলেন, চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে নিম্নগাঙ্গেয় প্রদেশবাসিগণের মাতৃভাষায় অবতরণ করেন, কেন্দুবিল্বের বৈষ্ণব কবি তরলিত সংস্কৃতে গোবিন্দনামমৃত বিতরিত করিয়া গেলে, তাঁহার মৈথিলী ও স্বস্থানজাত শিষ্যদ্বয় বাঙ্গলা কাব্যের সূচনা করেন। তদবধি আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা কাব্যের প্রকৃতি একইরূপ হইয়া আসিতেছিল ও বাঙ্গালী কবির বিষয় ও ভাষা এবং তাঁহার ভাবগতি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত; কাশীরাম, কৃত্তিবাস প্রভৃতির উল্লিখিত কা

পণ্ডিতের আবাসে যেরূপ অধীত হইত, পণ্যবিক্রেতার পণ্যশালায়ও তাহাদের সেইরূপ সমাদর ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গীয় আধুনিক কবিগণের অভ্যুত্থান হইতে বাঙ্গলা কাব্যের সে প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, পদ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র— ইঁহাদের কাব্য শিক্ষিতের জন্য, অশিক্ষিতের এই সকল কাব্যে অধিকার নাই। আবার রবিকবি এবং তাঁহার গ্রহ উপগ্রহগণ এই আধুনিক কাব্যেও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, ইঁহাদের কল্পনার পথ স্বতন্ত্র, সে পথ অনুসরণ করা শিক্ষিতের পক্ষেও দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী এখন উদরান্নের জন্য ব্যতিব্যস্ত, চিন্তা করিয়া কাব্যরসামৃতের স্বাদগ্রহণের অবসর তাহার কম; জীবনদাসত্ব হইতে দুই এক ঘণ্টা কাড়িয়া লইয়া বিশ্রামতোষিণীর আশ্রয়গ্রহণের অভিলাষ, এ বিশ্রামলাভের চেষ্টা আয়াসে পরিণত হয় এরূপ ইচ্ছা নহে। অথচ নবযুগের কবিগণ হয়ত তাঁহাদের পাঠকবর্গকেও তাঁহাদের ন্যায় কল্পনা প্রিয় করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদের কবিকল্পনার পথ অনুসরণ করাইয়া সে কল্পনার ফল উপভোগ করাইতে প্রয়াসী। এ বিরোধও হয়ত জাতীয় ভাগ্য; কবি-কল্পনা অসংযত ভাবে দৌড়িতে চায়, পাঠক সে গতির সঙ্গে সঙ্গে পাদ বিক্ষেপে অসমর্থ বলিয়া, জাতীয় ভাগ্যে সে কল্পনার ফলের সম্পূর্ণ উপভোগ হইতে পারিতেছে না। দোষ হয়ত কবিরও নয়, পাঠকেরও নয়, দোষ জাতীয় ভাগ্যের। অল্প কথায়, অধিকতর পরিষ্কার কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যদিও এই নবযুগের কাব্য পাঠ করিয়া, লেখকগণের চিন্তা-শীলতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহাদের ভাবগাঢ়তার উপলব্ধি জন্মে, তথাপি অনেক স্থলে, ভাবোদ্ধার, লেখকের প্রকৃত বা সম্পূর্ণ মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করা, সহজ নহে; অন্ততঃ, সে ভাব অধিকার করিতে, যে চিন্তা ও অবসরের প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালী জাতির এখন নাই। ইহা প্রাঞ্জলতার অভাব বলিয়া, এই শ্রেণীর কাব্যে দোষারোপ করা যায় কি না, বলিতে পারি না; বলিতে পারি না, যেরূপ চিন্তা, যেরূপ ভাব সার্ব্বজনীন নহে, সেই রূপ চিন্তা ও ভাব, আজকালকার বাঙ্গলা কাব্যে, অধিক পরিমাণে, প্রবেশলাভ করায়, কবির ভাবার্থে প্রবেশ করা পাঠকের পক্ষে এত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে কি না। যাহাই হউক, এই কুসুমাবলীর, এই রত্নরাজির

পূর্ণ সৌন্দর্য্য এখনও অনুভূত করিতে না পারিলেও, আমরা সমাদরে ইহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, এ কুসুমনিচয়, এ রত্নহার যে বাঙ্গলা সাহিত্যের কলেবর সুশোভিত করিতেছে, তদ্বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত "পদ্মা" এই নবযুগের কাব্য'। ইহা বলিলেই, বোধ হয়, এই গ্রন্থের এক রূপ সাধারণ সমালোচনা করা হইল, কেননা নবযুগের কাব্যেরকসাধারণ প্রকৃতি আমরা নির্ব্বাচিত করিয়াছি। এই গ্রন্থের কিয়ৎ পরিস্পন্দে, বিশেষ সমালোচনাও আমাদের উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে, এই কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষ করিয়াই, আমরা অন্য যুগৎকথা দুই একটীর সামান্য ভাবে অবতারণা করিয়াছি। বলিয়াছি, এ নব-যুগের কাব্য পাঠ করিতে গেলে, পাঠককেও কল্পনাপ্রিয় হইতে হয়; কল্পনার অনুসরণ না করিলে; এ শ্রেণীর কাব্যের সর্ব্বত্র অর্থোদ্ধার হইয়া উঠে না। গ্রন্থের নাম পদ্মা। গ্রন্থের এরূপ নামকরণ হইয়াছে কেন, গ্রন্থকার, তাঁহার পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে, কুত্রাপি তাহার আভাস দেন নাই। পদ্মা শব্দের প্রথম অর্থ লক্ষ্মী। কবি গনীর সন্তান, লক্ষ্মীর বরপুত্র। বুঝি বা লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ মিটাইবার জন্যই; বুঝি বা কমলা ও বীণাপাণি, আপনাদের চিরোবিরোধ ভুলিয়া তাঁহাতে যে একাসনে আসীনা হইয়াছেন তাহাই দেখাইবার জন্য, কবি তাঁহার কাব্যের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে এই নামকরণেও কবিত্ব আছে, কল্পনার খেলা আছে; দেখা যাইতেছে, গ্রন্থের আখ্যাও পাঠককে কল্পনার অনুসরণ করাইয়া, আমাদের উল্লিখিত নবযুগের কাব্যের লক্ষণবিশেষ প্রতিপন্ন করিতেছে। আমরা আরও একটু এইরূপ কল্পনার অনুসরণ করিব। পদ্মা শব্দের দ্বিতীয় অর্থ পদ্মচারিণী লতা। কবির মন সুরভি, সৌন্দর্য্য ও কোমলতার অনু-সন্ধানে কিরূপ ভ্রমণ করিয়াছে, কবি গ্রন্থের সংজ্ঞায়, এক কথায়, তাহাই যদি দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে সে অর্থেও কাব্যাখ্যা কল্পনাপ্রসূত; কল্পনার সৌন্দর্য্য প্রকাশক। পদ্মা নামে যে সুবৃহৎ একটী নদী আছে, বঙ্গদেশে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কবি তাঁহার চিন্তা স্রোতের আভাস দিবার জন্য, এই নদীর নামে তাঁহার চিন্তাপ্রসূত কাব্যকে অভিহিত করিয়াছেন; ইহাও অসম্ভব নহে। গ্রন্থকার সাধারণ গদ্যে; তাঁহার ভাবের

কোন ভূমিকা লিখেন নাই, কিন্তু কবির ভাবে, কবির ভাষায়, তিনি যে গ্রন্থ সূচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত এই অর্থের সঙ্গতি আছে। গ্রন্থারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

অয়ি নদি, একবার হেরি রূপ তব;
আর বার এ মানস-স্রোতে, অভিনব
হেরি উর্ম্মিলীলা! দু'টি ধারা মুগ্ধপ্রায়,
কি দুর্লভ লক্ষ্য পানে ছুটিছ তৃষায়!

ইহাতে সকলই কবির ভাব, ভাবনিমগ্নতার পরিচয়। কাব্যের আখ্যা লইয়া আমরা অধিকদূর কল্পনার অনুসরণ করিয়াছি দেখিয়া হয়ত কেহ কেহ মনে করিবেন আমরা নূতন কাব্যের অস্পষ্টতা দোষ লইয়া ব্যঙ্গ করিবার জন্যই এরূপ করিয়াছি। যাঁহারা এই অস্পষ্টতাকে নূতন কাব্যের বিশেষ দোষ বলিয়া পরিগণিত করেন তাঁহারা আমাদের সমালোচনার এরূপ অর্থ করিতে পারেন, কিন্তু এই প্রাঞ্জলতার অভাব সম্বন্ধে আমরা যে মতান্তর প্রকাশ করিয়াছি তাহা গ্রহণ করিলে আমাদের সমালোচনায় উপহাস আছে মনে করিবার কোন কারণ নাই।

"পদ্ম" পঞ্চাধিক অর্দ্ধশত ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহ। ইহার প্রত্যেক কবিতার সমালোচনা সম্ভবপর নহে। তবে গ্রন্থকার যে ভারতীর স্বপত্নীতনয় নহেন, তিনি যেমন লক্ষ্মীর বরপুত্র, তেমনই সরস্বতীরও বরপুত্র বটেন; তাহাই দেখাইবার জন্য স্থানে স্থানে এক একটী কবিতা লইয়া, আমরা আমাদের বিশেষ সমালোচনার কার্য্য সম্পাদন করিব, তথাপি এ কল্পনার খনিতে এ ভাবরত্নাকরে প্রবেশ করিলে; ঐ চি-র উৎসের নয়নপ্রীতিকর শোভাবলোকন করিলে; তাহা সহসা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। পদ্মার সকল কবিতাতেই কবির অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় আছে। কবির ভাবনিমগ্নতার গভীরতা দেখিয়া, অন্তরে গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। তাঁহার কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে; বোধ হয় যেন কোন ভাবসাগরের উর্ম্মিমালার মধ্য দিয়া গমন করিতেছি। পদ্মার প্রথম কবিতা "ক্ষীণ দীপালোকে"। ইহাও কবির ভাষায়, কবির ভাবে, গ্রন্থের সূচনা; কবির উদ্বোধন। কল্পনা প্রণোদিত কবি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, সীমা-

নিয়মিত পার্থিব জীবনের অতৃপ্তির বিষণ্ণতা; অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতি; ভবিষ্যতের শান্তিপ্রদ আশা; চতুঃত্রিংশৎ ছত্রের এই কবিতায়, এ সকলই প্রকটিত আছে। অনেক গ্রন্থের প্রথমে গ্রন্থকারের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকে, "পদ্মা"-র কবিও তাঁহার গ্রন্থের প্রথমে তাঁহার প্রতিকৃতি সংযোগ করিতে পারিতেন, তাঁহার গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ, বাহ্য বন্ধন, সকলই সুন্দর; তিনি তাঁহার গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের সহিত বাহ্য শোভার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, চিত্রকর বা দৃশ্যমুদ্রাকরের (ফটোগ্রাফারের) সহায়তা অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতিকৃতি সংযোগ করিতে ইচ্ছা করিলেই, বাহ্য সৌন্দর্য্যের সে পূর্ণতা সম্পাদন করিতে তিনি অসমর্থ হইতেন না। কিন্তু তিনি কবি, তিনি চিন্তাশীল, তিনি যে প্রকৃতিতে পরিচিত হইতে প্রয়াসী, তাঁহার "ক্ষীণ দীপালোকে"-এ তাঁহার পাঠকগণ তাহা সম্পূর্ণ অনুভূত করিতে পারিবে জানিয়া, তাঁহার সে আভ্যন্তরীণ মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি হইতে পাঠকের মন অকিঞ্চিৎকর বহির্মূর্ত্তির দিকে আকৃষ্ট করা সঙ্গত মনে করেন নাই। "ক্ষীণ দীপালোকে"-এ এবং অংশত তাহার পরবর্ত্তিনী কবিতা "অসীমে সাঁতার"-এ, আমরা কবিকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারি।

"পদ্মার" তৃতীয় কবিতা "বঙ্গভাষা", কবির মাতৃভাষার দীনতার কথা :—

"আহা, দীনা বঙ্গভাষা!
ভাঙ্গে নাই যেন তন্দ্রা-অলস,
মুছেনি শীতের কুহেলি-তমস,
কোমল উষার অরুণ-পরশ
ইঙ্গিয়া আনিছে আশা;
আহা, দীনা বঙ্গভাষা!"

ভাবে বিভোর চিত্ত যে কোন ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া ভাষার অপ্রাচুর্য্য অনুভূত করিবেই। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর ন্যায় ভাবপ্রধান কবি ভাষা ব্যবহারে তৃপ্তিলাভ করিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। তিনি প্রাচ্য শিক্ষা প্রাপ্ত, প্রাচ্য সাহিত্যে অধীত নবভাবে উৎপ্রাণিত নবীন কবি, তাঁহার নিকট তাঁহার মাতৃভাষা দীনা, অসম্পূর্ণা বলিয়া যে প্রতীত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে! তবে যতদূর বুঝি, ভাবময়

হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম এই খানে তাঁহার দীনতার কথা আসিলে, কবির চিন্তার ধারাবাহিকত্ব রক্ষা হইত, তাহার স্বাভাবিকত্বের অধিকতর উপলব্ধি জন্মিত। আবার "মায়ের আহ্বান"—এর অর্থ করিতে গেলেও ইহা কবির আত্মপরিচয়ের, তাঁহার উদ্বোধনের অংশীভূত বলিয়া প্রতীতি হয়। জানি না "মায়ের আহ্বান" কি সাধারণতঃ মোহমুগ্ধের জ্ঞানোন্মেষ, পাপনিরতের বিবেকের উদয়, আত্মবিস্মৃতের আত্মজ্ঞানের সঞ্চার, না কবির নিজ জীবনের কথা। আমরা ইহা কবির আত্মসমালোচনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি; তাঁহার জীবনে আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল, এ কবিতায় সেই মোহাবসান সূচিত হইয়াছে। তিনি যে "মহার্ঘ বৈভব", যে "দুর্লভ কবিত্ব" লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, হয়ত তিনি তাহা বিস্মৃত হইয়া, তাহার অবহেলা করিতেছিলেন, তিনি ধনীসন্তান, জগতে মনোরম ভোগ-বিলাস তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য, তিনি দুগ্ধফেণ-শয্যায় শয়ন করিয়া আরামে জীবনাতিবাহিত করিবেন মনে করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে যে স্বর্গীয় অমূল্য রত্ন নিহিত আছে তাহার অনাদর করিতেছিলেন, সহসা সে মোহ ভঙ্গ হইয়া দিব্য জ্ঞান জন্মিলে, পূর্ব্বাঙ্কিত জীবনপথ পঙ্কিল কালিমাময় মনে করিতে লাগিলেন, আত্মজ্ঞান ... ম্না" "সুরভিত বায়ু",

"কুসুমিত রম্য ... প করিতে কৃতসঙ্কল্প

হইলেন; অপর ... দার পর, সে শক্তি

পরিচালনে গো ... প্রবেশ করিলেন।

ইহাই যদি তাঁ ... কে" এবং "অসীমে

সাঁতার" শীর্ষ ... দান করিয়াছেন এ

কবিতাও তা ... । তিনেতেই কবির

হৃদয়-সৌন্দর্য ... ভাবমাতয়ারা চিত্ত যেন

মূর্ত্তিধারণ ক ... তারা দেখিস্ কি আর"

শীর্ষক, গ্রন্থের ... র কথায়, স্বদেশবাসিদিগের

নিশ্চেষ্টতার ... ায়ের আহ্বান"-এর পর

"বঙ্গভাষা"-র ... করিতে পারিতেন কবি

মাতৃভাষার দীনতার চিন্তা হইতে স্বভাবতঃই মাতৃভূমির দীনতার চিন্তায় অগ্রসর হইয়াছেন। জানিনা কবি রচনার সময়ানুসারে তাঁহার কবিতাগুলি পর পর গ্রন্থিবদ্ধ করিয়াছেন কি না? জানিনা "মায়ের আহ্বান"-এ রচনার সময় "বঙ্গভাষা"-র রচনার সময়ের পরবর্ত্তী কি না?

আমরা, প্রথম হইতে এক এক করিয়া কবিতাগুলি লইয়া, কবির চিন্তার ধারাবাহিকতার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু, বোধ হয়, ইহা সম্ভবপর নহে। কবির কল্পনা, কখন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইতে, কি ভাবে, অন্য কোন্ বিষয়ের আলোচনায় প্রসারিত হয়, তাহা সম্ভবতঃ কবি নিজেই ঠিক করিতে পারেন না; সমালোচকের পক্ষে সে ক্রমিকতা নির্ণয় করা অবশ্য অসাধ্য। সুতরাং, আমরা, স্থানে স্থানে আর দুই চারিটি কবিতা লইয়া, আর দুই চারি কথা বলিয়া, এ বিশেষ সমালোচনার শেষ করিব। আশা করি আমরা যতটুকু সমালোচনা করিতে সমর্থ হইলাম, তাহা হইতেই "উৎসাহ"-এর পাঠকগণ কবির কল্পনাশক্তির, তাঁহার ভাবনিমগ্নতার সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। "পদ্মা"-র কবিতাগুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে, সকলেই দেখিতে পাইবেন, কবির কল্পনা, কবির ভাব পাঠককেও কেমন [illegible] পাদিত করিয়া তুলে:—

"তোরা দেখি [illegible] পর অধঃপতনের
কারা কাঁদিয়াছে [illegible] নিমগ্ন, নিশ্চেষ্ট
হিন্দুস্থানকে, [illegible] দৃষ্টান্ত দেখাইয়া,
তাহাদের নিজ [illegible] চেষ্টা করিয়া, মৃত
দেহে প্রাণ সঞ্চা [illegible] এ গীত বঙ্গের
কবি এক দিন গা [illegible] না। এরূপ গীত
পরাধীন হিন্দুস্থানের [illegible] াইয়াছিলেন:—

প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখহে ধাইছে অকুতোভয়ে।—

"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

"মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপূজিতা
চির বীর্য্যবতী, বীর প্রসবিতা,
অসম্ভবযৌবনা যুনানীমণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলী,
সাগর ছেঁচিয়া, মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়॥

"আরব্য, মিসর পারশ তুরকী, —
তাতার, তিব্বত— অন্য কব কি?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

"বাজ্‌রে শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

নূতন কবি এই কথাই কিরূপ পরিবর্ত্তিত সুরে গাইতেছেন দেখুন:—

"তোরা দেখিস্ কি আর, অসার কৌতুকে,

কালের পানে, দীন নয়ানে !
উষার কিরণে হয়ে প্রতিভাত,
চারিদিকে সবে বলে সুপ্রভাত ;
তোদেরি এখনো পোহায় নি রাত,
দীর্ঘ শয়ানে !
তোরা দেখিস কি আর, ঘুমঘোরে চাহি',
কালের পানে,
ভগন প্রাণে !

"তোরা দেখিলি ত চেয়ে, গেল ওরা চলে ;
তোদিগে' ছলি', চরণে দলি' ।
কালের উন্নতি-স্রোতামুখে গিয়া
ওই যায় ওরা ভরা-পাল দিয়া ;
গর্ব্বেভরা প্রাণ উঠিছে ফুলিয়া
হর্ষে উছলি ।
তোরা তরঙ্গে ভরালি, ওরা তাই দেখে,
ঐ খল খলি
হাসে কেবলি !

*   *   *   *   *   *

"ওরে. কোন্ ভ্রান্তাশ্বাসে আছ রে বসিয়া ?
সময় লাগি, আছ কি তাকি' ?
সময় যে আরো লইছে অতলে !
কর্ম্মহীন অন্ধবিশ্বাসের বলে
হয় নি, হবে না কিছু এ ভূতলে ;
বুঝ নি তা কি ?
যাও, কার্য্যক্ষেত্র ওই, পড় দেখি মাঝে,—
যুঝ গে' লাগি,
সর্ব্বস্ব ত্যাগি !

"এ যদি না পার,— অদৃষ্টেরে দোষি', চল,
পাতাল খুঁজি,-যা আছে পুঁজি,—
কোথায় সে কোন শতস্তর তলে,
রবিশশিহীন ছন্ন রসাতলে,
ঘুমায়ে থাকি গে' নিরয় কবলে,
মাথাটি গুঁজি'!
তোরা দেখিস্ কি আর? আছে আরো বাকি
ডুবিতে বুঝি,
মরিতে বুঝি!"

ভারতসন্তানের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সুরই শোভা পায়, তাই সময় বুঝিয়া অবস্থা বুঝিয়া, কবি, এই বিষাদময় ক্ষীণ স্বরে, মর্ম্মের বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা "পদ্ম"-র কবির ভাবনিমগ্নতা, ভাবতন্ময়তার সহিত, তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও ধীরতার সহিত উদ্দীপনা সঙ্গত নহে, স্বাভাবিক নহে, তাই তিনি তাঁহার প্রকৃতি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ইহাও তাঁহার কবিত্বের বিশেষত্বের পরিচয়, তাঁহার শক্তির প্রকৃতত্বের প্রমাণ। তাঁহার শক্তি সত্য সত্যই "অমূল্য বৈভব", "দুর্লভ কবিত্ব"। যত্রসাধ্য কবিত্বই কেবল সময়ের প্রচলিত রুচির মুখাপেক্ষা করে। কবির এই বিশেষত্ব, তাঁহার কবিতাসমূহে, সর্ব্বত্র কতদূর রক্ষিত হইয়াছে, দেখিবার জন্য, আমরা, সূচিপত্র খুঁজিয়া বাছিয়া, 'দুর্গোৎসব', 'পূজার সময়', 'চৈতন্যের তিরোভাব', কয়েকটি কবিতা পড়িলাম। মনে করিয়াছিলাম হয়ত এইরূপ কবিতায় সাধারণ ভাব দেখিতে পাইব, কবির বিশেষত্বের অভাব লক্ষিত হইবে। কিন্তু আমাদের ভ্রান্ত আশা পূর্ণ হইল না দেখিয়া, আমরা নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিলাম। শিরোণাম দেখিয়া, সাধারণত্বের আশঙ্কা জন্মিয়া থাকিলেও, কবিতাগর্ভে কবির স্বর্গীয় কান্তি প্রতিভাত দেখিয়া অপরিসীম প্রীতি লাভ করিলাম। তাঁহার দুর্গোৎসব নির্জ্জন গৃহে, তমসাবরণে, ভক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাহামায়ার ধ্যানে তন্ময়তা; তাঁহার চৈতন্যের তিরোভাব প্রকৃতির মহিমাময় হৃদয়োন্মাদক সৌন্দর্য্যরাশি মধ্যে, সকল সৌন্দর্য্যের আলয় সেই জ্যোতির্ম্ময়ের চরণোদ্দেশে আত্মনিসর্জ্জন;— ভাবতন্ময়তার

চরম দৃষ্টান্তের। আবার পূজার সময়ে, কবি যদিও, বিরহিনীর নিকট প্রবাসাগত তাহার প্রিয়জনের সংবাদ বহন করিয়া, তাহাকে পুলকিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যদিও তিনি, বিদেশগত পুত্রের বিষন্ন হৃদয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সস্নেহ আশীর্ব্বাদসহ, গৃহে প্রত্যাগত পুত্র মুখ দর্শনে অগ্রসর হইতে আহূত করিতেছেন, তথাপি তাঁহার মূল লক্ষ্য, বঙ্গের রমণীগণের অকৃত্রিম পবিত্র সেই শারদীয় হৃদয়োচ্ছ্বাসের স্বর্গীয় ভাব। কবিতার শেষ কয়েক ছত্রে তাহাই প্রকটিত করিয়া, কবি সাধারণ ঘটনার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অনুধাবনশক্তির পরিচয় দিয়াছেন:—

"শরতের শুক্লপক্ষে নারীর উৎসব
শুধু, চিরদিন বঙ্গে! যায় সেন বুঝা,
দেবতার পানে উঠে প্রিয়প্রীতিপূজা!"

নবযুগের নবীন কবিগণ অনেকেই, ন্যূনাধিক পরিমাণে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণের পথানুসরণ করিয়াছেন। প্রতিভান্বিত, পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত এই বঙ্গীয় যুবকগণ, এই শ্রেণীর পাশ্চাত্যকবিগণের অনুকরণে, ক্ষুদ্র কবিতায় বঙ্গসাহিত্যে এক প্রকার নূতন সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিয়া, বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। এ ক্ষুদ্র কবিতার যুগ; এ যুগের কবিগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায়, পাঠকের কল্পনা প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়া পাঠককে কবিকল্পনানিহিত অব্যক্ত সৌন্দর্য্যের আস্বাদনে সমর্থ করিতে প্রয়াসী। আমরা এ কথার পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এই শ্রেণীর কবিতার আবার প্রকার ভেদ আছে, এ শ্রেণীর কবিতা বৈচিত্র্যময়:— কোথায়ও ভাবের অস্পষ্টতা, পাঠককে কল্পনার সাহায্যে অর্থোদ্ধার করিতে হয়; সে অর্থেরও ব্যক্তিভেদে অবস্থাভেদে প্রভেদ সম্ভবপর; যেমন 'মায়ের আহ্বান'-এ; কোথায়ও ভাব বচনাতীত, কেবল কল্পনার সাহায্যে, চিন্তার বলেই তাহার উপলব্ধি সম্ভব, যেমন 'চৈতন্যের তিরোভাব'-এ প্রকৃতির সে শান্ত, সৌম্য মহিমান্বিত মূর্ত্তির সহিত প্রকৃতির সে চন্দ্রকর প্রভাসিত প্রফুল্ল মুখে গাম্ভীর্য্যের ভাবের সহিত চৈতন্যের চিত্তভাবের অভেদত্ব কল্পনায় অনুভূত ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত করা যায় না। 'চৈতন্যের তিরোভাব'-লেখক তাঁহার কবিতার

চৈতন্যের সে তন্ময় ভাবের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকের কল্পনার সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবিতায় সৌন্দর্য্যের যেন কিছু লাঘব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সচরাচর এই প্রকারের কবিতায় কবিগণ ঘটনা নিচয়ের বর্ণনা করিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এবং তদন্তর্বর্ত্তী প্রচ্ছন্ন ভাবসৌন্দর্য্য পাঠকের কল্পনার জন্য রাখিয়া দেন। এই শ্রেণীর আর এক প্রকারের কবিতায়, কবিগণ, অতি সাধারণ সাধারণ ঘটনা অতি সরল ভাষায় সাধারণ ভাবে বর্ণনা করিতে করিতে পাঠককে হঠাৎ, দুই এক কথায়, তাহাও অতি সাদা কথায়, কল্পনার রাজ্যে উপনীত করিয়া তাহাকে সে রাজ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া নিজেরা অদৃশ্য হয়েন অথবা, প্রশান্ত সরসীবক্ষে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া, তীরে বসিয়া, লোকে যেমন সেই ক্ষুদ্রাকার উর্ম্মিমালার ক্রীড়া পরিদর্শন করে, সেইরূপ পাঠকের মনে ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষুব্ধ কল্পনাময় ভাবের উদ্রেক করিয়া দিয়া নিজেরা অন্তরালে থাকিয়া সে কল্পনার ক্রীড়া দেখিতে থাকেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Lucy Gray" এবং "গাথা"-র কবির "সাঁঝের মেয়ে" এইরূপ কবিতার দৃষ্টান্ত :—

"They follow'd from the snowy bank
Those footmarks, one by one,
Into the middle of the plank;
And further there were none!

"—yet some maintain that to this day
She is a living child;
That you may see sweet Lucy Gray
Upon the lonesome wild.

"O'er rough and smooth she trips along,
And never looks behind;
And sings a solitary song
That whistles in the wind."

অন্যত্র :—

"এই মত রোজ আড়ালে থাকিয়া
দেখি চেয়ে তার খেলা;
একদিন, একি! আসে না বালিকা,
রাত হয়ে যায় বেলা।

* * * *

"তার পরে আসি নিত্য নদীতীরে,
নিত্য ফিরে ফিরে যাই;
সাঁজের তারাটি দেখি ফুটে থাকে;
কিন্তু সে বালিকা নাই!"

এই শ্রেণীর কবিতার এক একটির এক এক রূপ সৌন্দর্য্য, সে সকল সমালোচনায় প্রদর্শন করা সম্ভবপর নহে। আমরা কেবল ঐরূপ সৌন্দর্য্যের আভাস দিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র। "সাঁজের মেয়ে" কবিতার সহিত কবি একটি চিত্র সংযোগ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের আরও কোন কোন কবিতার সহিত এইরূপ চিত্র গ্রথিত হইয়াছে। ইহা য়ুরোপীয় প্রথা, এ প্রথার অনুকূলে স্থলবিশেষে কিছু বলিবার থাকিলেও, আমরা সাধারণতঃ এই প্রথার অনুমোদন করি না, বিশেষতঃ যে শ্রেণীর কবিগণের লিখনপ্রণালীর এক উদ্দেশ্য পাঠকের মনে কল্পনা জাগরিত করিয়া দেওয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে। কেননা একরূপ চিত্র সংযোগে পাঠকের কল্পনার পথ সংকীর্ণ হইয়া দাঁড়ায়; তাঁহার কল্পনা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বিচরণ করিতে পারে না। এ প্রথা সম্বন্ধে সাধারণতঃ বলিতে গেলে, আমাদের মতে ইহাও বলা যাইতে পারে যে কবিত্ব ও চিত্রবিদ্যাকে প্রকৃতির যমজ কন্যাদ্বয় বলিয়া মনে হইলেও ইহারা পরস্পর স্বাধীন, একের সাহায্যে অন্যের সৌন্দর্য্য অনুভূত করিতে হয় না। যে চিত্র ভাষার সাহায্যে বুঝিতে হয় সে চিত্র চিত্র নামের যোগ্য নহে, যে কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চিত্রের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় সে কবিত্ব অপ্রকৃত বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

"পদ্মা" ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহ, ইহার এক এক কবিতার এক এক রূপ সৌন্দর্য্য, সে সমস্ত সমালোচনায় দেখাইবার চেষ্টা অসম্ভব। 'পদ্মা'র কবি যে প্রকৃত কবিত্ব লইয়া, বঙ্গসাহিত্য উজ্জ্বল করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কবিতাগুলি যে ভাবের খনি, সৌন্দর্য্যের আকর তাহাই বঙ্গীয় পাঠকবর্গের গোচর করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের সে চেষ্টা সফল হইয়া থাকিলেই আমাদের সমালোচনার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

সুখে-দুঃখ।

সুখ পাই নাই ব'লে, হে বিশ্ববিধাতা,
তোমা'পরে মিছে অভিমান। তুমি দাতা,
আমি দীন, যা দিয়েছ করুণা প্রকাশি,
তাই কেন প্রাণপণে ভাল নাহি বাসি
বহু ভাগ্য মানি। ত্যজিলাম অসন্তোষ
বাম অদৃষ্টেরে আর নাহি দিব দোষ।
স্বর্গ হ'তে পাঠালে যা মানবের ঘরে,
প্রভু হ'য়ে পাঠালে যা সেবকের তরে,—
হোক্ দুঃখ; নির্ব্বিচারে শিরে ল'ব তুলি।
আশামুগ্ধ তৃষালুব্ধ আপনারে ভুলি
ভ্রমিব অভ্রান্ত নিত্য জীর্ণ ভগ্ন রথে
ধূলি-ধূসরিত দগ্ধ অন্ধকার পথে।
একদা দাঁড়াব কাছে দীর্ঘ রাত্রি জাগি,
সাধনের পুরস্কার গর্ব্বে ল'ব মাগি।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

দুঃখে সুখ।

হে দেবতা কণ্টকিত কুসুমের প্রায়,
সুমহৎ দুঃখ, এও তোমারি ইচ্ছায়।
সহস্তে সাজায়ে সবে পাঠালে যখন
মর্ত্ত্য-প্রবাসের তরে, হ'ল কত জন
সৌভাগ্যের বরমাল্য-বিমণ্ডিত-ভাল;
একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল এ কাঙ্গাল
জর্জ্জরিত ঈর্ষা-বিষে; বহু স্নেহে ডাকি
গুরুতর দুঃখভার তার শিরে রাখি
চাহিলে প্রশংস নেত্রে; সন্তুষ্টস্ফীত মনে
চ'লে এনু কল্লোলিত সহযাত্রীসনে।
তদবধি নিখিলের উৎসব উল্লাস
দুর্ভাগার ভাগ্য ল'য়ে করে পরিহাস।
মোর আছে এই তৃপ্তি,— হে সদয় স্বামী,
দাসের দুরূহ ব্রত পালিতেছি আমি।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

জহর ওস্তাদ।

চৌকিডাঙ্গায় প্রবাদ আছে যে হরি মুখুর্য্যের কয়লা ডিপোতে প্রবেশাবধি জহর ওস্তাদ আর খপসুরৎ্ পাকা দোস্ত। ইতিপূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে দেখা-শুনামূলক পরিচয়াদি ছিল কি না তাহার কোন ইতিহাস নাই; এমন কি তৎসংক্রান্ত তথ্যও এত বিরল যে সুচতুর ঐতিহাসিক গবেষণাও অদ্যাবধি কোন নিশ্চয় প্রমাণে উপনীত হইতে পারে নাই। তবে সর্ব্ববাদীসম্মত একটী কারণ প্রচলিত আছে যে উহারা দুই জনে একই দিনে ডিপোর বহিতে নাম লেখাইয়াছিল। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার বাক্যবাহুল্য বা আদান প্রদান না হইয়া শুধু এক ছিলিম তামাকের উপর এতটা আত্মীয়তা উৎপন্ন হইয়া গিয়াছিল। যথার্থ কারণ যাহাই থাকুক, আমি নিশ্চয় জানি, তাহা ভাবিয়া চৌকিডাঙ্গার কেহ অজীর্ণ সৃজন করিয়া অম্লউদ্গার তুলিবার অবসর অন্বেষণ করিত না ও তন্নিবন্ধন প্রাত্যহিক পার্থিব ব্যাপার গুলি কোনরূপ সংঘাত প্রাপ্ত হইত না। বোধ করি সেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাহারা সারাদিন রুদ্র রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া কঠিন বাহুর আঘাতে কঠিনতর মৃত্তিকা খনন করিতেছে ও মাঝে মাঝে বামহস্তে কোদালি ভর দিয়া মেরুদণ্ড সরল করিয়া ব্যথিত কোমরটা জুড়াইয়া লইতেছে ও দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী দ্বারা কপালের ঘাম দূরে ছটকাইয়া ফেলিতেছে তাহারা এতাধিকরূপে মানসিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার স্পৃহা রাখে না। রৌদ্র ধূসর উর্ব্বর মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে দিগন্তপ্রসারিত সর্ষপকুসুম সৃজন করিয়া আলস্যবিলাস করিতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ বোধ করে। সাদৃশ্যেই সকল সময় সখ্যতা ঘনিষ্টতর হইয়া উঠে এমন নহে, অনেক সময় বিলক্ষণ বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও প্রবল অনুরাগ সকলের বিস্ময় আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যে হেতু জড়বিজ্ঞানে সচরাচর বৈষম্যের মধ্যে আকর্ষণ দেখা যায় সেই হেতুই হয়ত কোন কোন দার্শনিক মনোবিজ্ঞানে তাহার ঠিক উল্টা নিয়ম ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু জাগতিক নিয়ম কোন কৃত্রিমসূত্রে

মিলাইয়া চলিতে চাহে না; বাস্তবিক সুবিধা পাইলে ব্যতিক্রম করিবার দিকে যাহার একটা ঝোঁক রহিয়াছে তাহার প্রমাণ এই দুইটী সাঁওতাল-অখ্যাতনামা মনুষ্যবংশধর জহর আর স্বরূপ।

জহর বলিষ্ঠ ও দৃঢ় নির্ম্মিত। দৈর্ঘ্যে ও দুর্দ্ধর্ষতায় জহরকে ঐতিহাসিক পুরুষের ন্যায় দেখাইত। গাছের শিকড়গুলা যেমন মাটীর মধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া মাটীকে সবলে আঁকড়িয়া ধরে তেমনি তাহার শরীরের শিরা উপশিরাগুলি মাংসপেশী সমূহ জড়াইয়া পাকাইয়া জমাট করিয়া তুলিয়াছিল। সে যখন হাঁটিয়া যাইত, মাটিও পার্শ্বস্থিত দর্শকেরা বেশ বুঝিতে পারিত একজন কেহ চলিয়া যাইতেছে। সে যখন 'খাদের' ভিতর সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত তখন তাহার কোদালি উত্তোলনের অনায়াসভাব আর মাংসপেশী সমূহের তীর্য্যক্গতিচ্ছন্দ একটি দেখিবার দৃশ্য. তাহার স্বল্পকুঞ্চিতাগ্র বাবরী বিশাল স্কন্ধদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নিম্নে আসিয়া পড়ে। গায়ের রংটা কালোই বলিতে হয়, কিন্তু ঘরে বসিয়া কেরাণীগিরি করিতে পাইলে শ্যামবর্ণ হইবারও অটক ছিল না। ডিপোর মধ্যে এইরূপ দ্বিতীয় একখানি শরীর দৃষ্টিগোচর হইত না।

বোধ হয় এই বিপুল বপুটার জন্য জহরের নিকট জগৎসংসার একটু আঁট বলিয়া ঠেকিত; তাহার যেন সর্ব্বদাই একটা আশঙ্কা ছিল যে সে যদি বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করে তবে অক্সিজেন বাষ্পের আকস্মিক হ্রাস হইয়া অবশিষ্ট প্রাণীজগতে মহামারী পড়িয়া যাইবে। বস্তুতঃ অপরের জন্য তাহার যে পরিমাণ সচেষ্টভাব ছিল নিজের প্রতি ততোধিক উদাসীন অবহেলা দেখা যাইত। পরিধেয় ধুতিখানা যেন নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি বশতঃ তাহার অঙ্গে লাগিয়া থাকিত, সে তাহার জন্য একটুও দায়িক ছিল না। গাত্রের ধূলামাটি পরিষ্কার করা কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহাতে তাহার কোন দিন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু নিজে সে উহাদিগকে বরাবর অলঙ্কার স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এত দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষাবয়বটীর কণ্ঠ সুকুমার নারীজনোচিত ছিল। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় ভাটিখানার সরাইয়ে বসিয়া সে যখন গান ধরিত তখন দলের ভিতর— 'বাহ্ বাহবাঃ' কোলাহল পড়িয়া যাইত আর পাগলিনী মাতিয়া ঠিক করিয়া দাঁড়ি-

পাল্লা ধরিতে পারিত না। এই জন্যই জহরের নাম জহর ওস্তাদ। বাস্তবিক এই সকল সচ্ছন্দ ভ্রমণজীবিরা চরিত্রগণের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে অতিশয় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং তদনুযায়ী উচিত নামকরণ করিবার জন্য কোন দিন কোন অভিধান বা নূতন পঞ্জিকার মুখাপেক্ষা করে না।

সুবল লোকটা মাঝারী অপেক্ষাও কিছু ছোট। দিব্য সুশ্রী গৌরবর্ণ; প্রখর রবিকর ও তীব্র উষ্ণ বায়ু তাহার বিশেষ কিছু হানি করিতে পারে নাই। কি কাজ, কি বিশ্রাম সকল সময়ে ফর্সা ছিটের কোর্ত্তা ও সুন্দর কোঁকড়া চুলগুলি পরিপাটী করিয়া আঁচড়াইয়া কাঠের চিরুণীখানি মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে লটকাইয়া দেওয়া সুবলকে দেখিলেই পরিচ্ছন্নতার ভাব মনে জাগিয়া উঠে। আর তাহার অজাতশ্মশ্রুগুম্ফ মুখখানি পুরুষের হইলেও মহিমাকুল বাঞ্ছিত — বাঞ্ছিত কি না বলিতে সাহস হয় না।

সুবলের কাছে সংসারটা বেশ ঢিলা রকমের ছিল। সে স্বেচ্ছাক্রমে তাহার মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা ও সুবন্দোবস্ত করিতে পারিত। দিনমান শুধু মাটীর সঙ্গে কাজ তবু তাহারই মধ্যে সে সুকৌশলে নিখুঁতরূপে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিত। সুতরাং ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে অনতিবিলম্বে তাহার নাম বাবুসুবল হইয়া দলের অনভাবিতপূর্ব্ব নামাবলীর মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিল।

সুবলকে তজ্জন্য কিছু দিন উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছিল; কারণ একটা লোককে কথায় কথায় নবাব সিরাজের সিংহাসনে অভিষেক করিলে এক এক সময় তাহার রাগ করিয়া রসজ্ঞান শেষ হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে দিন জহর একটুও না হাসিয়া দলস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দিল যে নিজের আন্তরিক ইচ্ছাবশতঃ যদি কেহ একটা নূতনতর প্রথা অবলম্বন করিয়া বসে তবে সেটা বিদ্রূপের বিষয় হয় না এবং নিরপেক্ষভাবে তাহার দোষগুণ দেখাই কর্ত্তব্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা অপরাধ নহে আর তাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া কাহার মনে হয়? যখন ইহারই জন্য বেশীর ভাগ পরিশ্রম নাই তখন সেটুকু স্বাধীন ইচ্ছায় বাদ সাধিবার প্রয়োজন? আমি নিজে যদিও কোন দিন পরিষ্কার থাকিতে পারি না তাই বলিয়া সুবলকে বিদ্রূপ করিতে আমার আদৌ প্রবৃত্তি হয় না।

বলা বাহুল্য এই স্পষ্ট কথার পর হইতে সুরথের উপর উপদ্রবের কিছু উপশম হইল কিন্তু তাহার নামটা খপ্সুরথ থাকিয়া গেল। জহরকে ঘাটাইতে কেহ সাহস করিত না কারণ ঐরূপ দুঃসাহসে দুঃখ সুনিশ্চিত। তাহা ছাড়া, সকলে তাহাকে একটু আন্তরিক খাতিরও করিত।

যে কাজ লোক জহর আর সুরথ ভাগাভাগি করিয়া লইত ও এক চালায় বাস করিত। কোন কাজ সরকার হইতে বিলিবন্দোবস্ত হইবার সময় দুইজনের মধ্যে একজন উপস্থিত রহিলে নির্ভাবনায় অপরের নাম লিখাইয়া দিত কিন্তু তাহা লইয়া উভয়ের মধ্যে এ পর্যন্ত কোন দিন মতান্তর ঘটে নাই। এমন কি সকলে দৈবজ্ঞের ন্যায় শপথ করিয়া বলিত নিরবধি ভবিষ্যতেও উহা হইবার সম্ভাবনা নাই।

কয়লাখনিতে বাউরী ও সাঁওতাল রমণীগণের একাধিপত্যের মধ্যে হিন্দুস্থানী মতিয়ার কি করিয়া আবির্ভাব হইল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। জনশ্রুতি আছে মতিয়ার পিতা সঙ্গীত ব্যবসায়ী ও তাহার মাতা ভাতীন বাই ছিল ও বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত কেহ কেহ বলে তাহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার চৌকিডাঙ্গায় আসে কিন্তু আসিবার পর দিন প্রাতঃকালে দেখা যায় মতিয়ার পিতার মৃতদেহ একটা 'খাদের' ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে। পুলিস-দারোগা দিয়া যৎপরোনাস্তি তদন্ত হইয়াছিল কিন্তু কি ফল হইয়াছে তাহা কাহারও স্মরণ নাই। মতিয়ার মাতার আর স্থান পরিত্যাগ করিবার সাধ্য রহিল না ও অল্পকালমধ্যেই বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিল। মতিয়ার তখন বয়স হইয়াছে— সে আপনি কাম করিয়া খাইতে পারে কিন্তু এই অবস্থায় নিরাশ্রয় হইয়া থাকাটা নিষ্কণ্টক নহে।

সুতরাং এমন সময়ে সদাশয় হরিবাবুর অনুগ্রহে, তত্ত্বাবধানে আশ্রয়ে ও খরচে নিষ্কর এক বিঘার উপর একখানি দোকানঘর তুলিল। মতিয়া নর্ত্তকী না হইয়া, হইল কিনা পসারিণী!

মতিয়ার দোকান চৌকিডাঙ্গার ঠিক হৃদয় অঞ্চলে। পল্লীর মধ্যে এমন একটি প্রধান জায়গায় দোকানের সার্থকতা হইতে অধিক কালবিলম্ব হয় না— অল্প খাদেকের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে তাহার যথেষ্ট সরবরাহ খুলিয়া গেল। প্রথম প্রথম সৌখীন ক্রেতার দল অগ্নিলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় মতিয়ার কায়মনোবাক্যে

আকৃষ্ট হইয়া সখ করিয়া বা উপরোধে পড়িয়া দু'পয়সা কিনিতে লাগিল। কিন্তু মুখরা মতিয়া সারাদিন ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে একে একে তাহাদের প্রত্যেকের প্রণয়-আক্রমণ এমন করিয়া নিরস্ত করিত যে দ্বিতীয়বার তেমন প্রগল্‌ভতা করিতে কেহই সাহস করিত না। বামপদের হাঁটুর উপর বাম হস্তের কনুই রাখিয়া দাঁড়ির দড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তৌলক্রিয়া সম্পন্ন করিতে করিতে সে যেমন বাক্‌-কৌশল প্রদর্শন করিত তাহা দেখিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মিগণও আপনাকে ধিক্কার দিতে পারিতেন।

মতিয়া সুন্দরী। তাহার সৌন্দর্য্য অতিশয় প্রখর। খেলোয়াড়ের হাতে ঘূর্ণমান শাণিত তরবারি যেমন চতুর্দ্দিকে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে কিরণ-ছটা জ্বালিতে থাকে তেমনি তাহার শরীরের বিবিধ গতিভঙ্গে অনবরত একটা দীপ্তোজ্জ্বল লাবণ্যভঙ্গিমা চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িত। তাহার রূপ-জ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় এক মুহূর্ত্তেই মনের মধ্যে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু বিদ্যুতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিঃশেষে মিলাইয়া যায় না; কিছু ক্ষণের জন্য একটা চিহ্ন রাখিয়া যায়। মুখে সে কথা কহিত, হাসিত রাগ করিত, গান করিত আর তাহাদের প্রচ্ছন্ন অর্থ সাধারণের নিকট সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য করিবার জন্য নানা অঙ্গভঙ্গীর সহিত চোখের চাহনি দিয়া আদ্যোপান্ত তর্জ্জমা করিয়া যাইত। যেমন উননের উপর দুগ্ধ উচ্ছলাইয়া উঠিয়া অগ্নির উত্তাপ ব্যক্ত করে; পুষ্করিণীর জল শিহরিয়া উঠিয়া সমীরস্পর্শ পরিস্ফুট করিয়া তোলে; সেইরূপ মতিয়াও কথায় কথায় এমন সকল শারীরিক বিশেষণ প্রয়োগ করিত যাহাতে তাহার মনের ভাবটা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইয়া যাইত। তাহার বিদ্রূপকে সে এমনি সজীব করিয়া তুলিতে পারিত যে তাহা সাধারণ বেদনানার উৎপাদক করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, তীক্ষ্ণাগ্র বাণের ন্যায় একেবারে হৃদ্‌পিণ্ডে গিয়া বিদ্ধ হইত। প্রত্যুত্তরে কেহ প্রকুল্ল-তার আয়োজন করিয়া বহুকষ্টে বাণটাকে সরাইয়া ফেলিতে সক্ষম হইলেও তাহার তীক্ষ্ণ ফলকখানি মনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া রহিয়া নিদারুণে যন্ত্রণা দিত। তেমনি তাহার অশ্রুতে দ্রবীকরণ, হাসিতে মাদকতা এবং অভিমানে জগৎ শূন্য বোধ করাইবার ক্ষমতা ছিল।

পূর্ব্বদিনের কথামত পরদিন ভোরে উঠিয়া জহর আর স্বরূপ কাজে

লাগিয়াছে।

এ দেশে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে কয়লা উত্তোলনের সাধারণতঃ দুইটি প্রণালী প্রচলিত আছে। যে কয়লার স্তর মৃত্তিকার অধিক নিম্নে নহে— তাহা সচরাচর পুকুরের মত খাদ কাটিয়া তোলা হয় — ইহাকে 'পুকুরে খাদ' বলে। যে স্থলে কয়লা অধিকতর নিম্নে সেখানে কল কারখানার বন্দোবস্ত। আজ কাল ইঞ্জিনে 'জিন' ঘুরানো, পম্পে জল তোলা প্রভৃতি কত রকম সুবিধা হইয়াছে; আইনের পর আইন পাশ হইয়া কতদিকে কত সুবন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে করিয়া সাধারণ শ্রমজীবিদের বিসর্গপরিমাণ ভাগ্যোন্নতি হইয়াছে কি না সন্দেহ। অবশ্য ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই যে দেশ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, যে লক্ষ্মীশ্রী দেশের শিরোভাগে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা আজিও তাহার সর্ব্বাবয়বে প্রবাহিত হয় নাই।

ভুলী, সুদাম, ডাকু, তিলক পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে দিবা রাত্রি অন্ধকূপে বদ্ধ রহিয়া দেশের ঐশ্বর্য্যব্রত রীতিমত উদ্‌যাপন করিতেছে; লোহার কল ও কথার আইনের উপর নির্ভর করিয়া বাহিরের মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবার একদণ্ড অবকাশ পাইতেছে না। আবার এত করিয়াও কই এক বেলার জায়গায় দুই বেলা হাঁড়ি উনানে উঠিতে চায় না। সে জন্য তাহারাও কোন আবদার করে না কারণ তাহারা বুঝিয়াছে তাহাদের অসন্তোষোচিত চীৎকার ক্রন্দন ও রাজনৈতিক কর্ণে বধিরতা বই মনোযোগ উৎপাদন করে না।

সেই ভোর হইতে উঠিয়া জহর আর সুরথ খাদের ভিতর অবিশ্রান্ত কাজ করিতেছে: বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তথাপি তাহারা তিলার্দ্ধকাল বিশ্রাম করে নাই। অন্যান্য লোকের ন্যায় কাজ করিতে করিতে তামাকের অনুশীলনটা তাহাদের বড় ভাল লাগিত না।

কান দিয়া শোন, কঠিন মাটিতে অবিরাম কোদালির আঘাত ও সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পিষ্ট শ্বাসযন্ত্রের 'হুস' 'হুস' করিয়া এক একটি শব্দ। নিরলঙ্কার গদ্যময় সংসারে এই সকল বিশ্রব্ধ দীর্ঘশ্বাসগুলি কঠোর কর্ম্মপ্রবাহের শক্তি-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে। রাজনীতিজ্ঞপ্রমুখ কি প্রবুদ্ধি সারেশীবর্গেরা

সংসারের এই বিচিত্র কর্ম্ম রথখানি যত সুকৌশলেই চালাইতে থাকুন না কেন, ইহার বিজাতীয় শব্দটা তাঁহারা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু যে সকল শ্রমসহিষ্ণু মূক ঘোটকগণ যুক্ত হইয়া উক্ত রথকে গতি অর্পণ করিতেছে, তাহারা উহার ঘর্ঘর ধ্বনিকে সঙ্গীতের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে ও উপযুক্ত সময়ে দীর্ঘশ্বাস হ্রেষার ন্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার গীতচ্ছন্দ নির্ণয় করিয়া একটু আয়েস বোধ করে। কিন্তু সৌখীন পদ্মময় সংসারের সাহানা রাগিণী আর তদনুবর্ত্তী শিঞ্জিত নূপুর কঙ্কনের তাললয়ের সহিত তাহার কি মর্ম্মান্তিক প্রভেদ!

সুরথের ক্লান্তি-ক্লিষ্ট মুখাবলোকন করিয়া জহর তাহাকে একটা কথোপ-কথনে আহ্বান করিয়া বসিল:

জহর বলিতেছিল "আচ্ছা সুরথ, মনে কর যদি খুঁড়িতে খুঁড়িতে এখানে এক চাপ সোনা উঠিয়া পড়ে— তাহা হইলে তুমি কি কর?"

সুরথ মাটীতে কোদালি আঘাত করিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে তুলিবার সময় হাসিয়া উত্তর করিল "আমি এই মাটীর মতন দূরে ছুড়িয়া ফেলি!"

শুনিয়া জহর উচ্চহাস্য করিয়া কহিল "আমি হইলে, রাত্তির না পোহা-ইতেই ভিটায় এক দালান দিয়া বসি।"

সুরথ কহিল— "ঢের হইয়াছে, হাওয়ার উপর আর ইমারত খাড়া করিও না!— ঘরখানার ছুটা বাঁধন দিতে হইবে; বাঁশের হুড়কাটাও কোথায় গিয়াছে!"

জহর বলিল "ভয় কি ভাই, হাওয়ার ইমারত ত আর কাহারও ঘাড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। আমার ত বোধ হয় বড়লোক হইতে এক চোটেই হয়— নহিলে রহিয়া রহিয়া দু'পয়সা করিয়া কে কবে বড় লোক হয়!"

"তাহা ভাই, যা-ই হউক, তাহাতে তোমার আমার কি কাজ। আমরা দুইবেলা বাঁচাইতে পারিলেই বড়লোক— পরের কথা পরের!"

এই বলিতে বলিতে সুরথ কোদালি ফেলিয়া কাপড়ের ধূলা মাটী ঝাড়িতে লাগিল; কোঁচাটা খুলিয়া ভাল করিয়া ঝাড়িয়া আবার পরিল; অঙ্গুলিসঞ্চালনপূর্ব্বক মাথার চুলগুলি একবার ঝাঁকাইয়া দিল।

জহর এতক্ষণ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি যাইতেছ?"

সুরথ বলিল 'হাঁ।'

জহর কহিল—"তবে তুমি যাও—আর একটু কাজ দেখি। খাদের মুখের এই পাথরটা সরাইয়া যাইব।"

সুরথ চলিয়া গেল। যতদূর দেখা গেল জহর একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছিল। "সুরথকে কেমন সুন্দর দেখায়!" ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় কোদালি তুলিয়া লইয়া খনন করিতে লাগিল।

যখন কপাল হইতে জলধারার ন্যায় ঘাম ঝরিয়া প্রস্তর খানা সিক্ত করিতে লাগিল তখন উহার গোড়া আলগা হইয়া আসিয়াছে। তাহার পর সমস্ত শরীরের বল দীর্ঘ দুই বাহুতে অর্পণ পূর্ব্বক মুখাবয়ব কুঞ্চিত করিয়া বিপুল বলের সহিত পাথরখানা উঁচাইয়া ফেলিল। ইত্যবসরে একটা উষ্ণ বাতাস বহিয়া আসিয়া তাহার শরীরে দ্বিগুণ ঘর্ম্মের সঞ্চার করিল।

সে ধীরে ধীরে দুই পায়ের মধ্যে কোদালিখানি রাখিয়া পাথরখানির উপর বসিয়া পড়িল। আপাততঃ বাটীতে তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না। পশ্চাতে স্তূপাকৃত মাটীর আলিশার উপর একটা ময়না বসিয়াছিল—নিতান্ত আত্মীয়ভাবে তাহার সঙ্গে একটা আলাপ যুড়িয়া দিল।

প্রথম সম্বোধনেই পাখীটা গ্রীবা হেলাইয়া মনোযোগ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জহর জিজ্ঞাসা করিল "ময়না মতিয়া কেমন সুন্দরী? এমন সুন্দরী এখানে আর নাই, না?"

ময়না ঘাড় সোজা করিল ও ঈষৎ মাথা ঝুঁকাইয়া সম্মতি বুঝাইয়া দিল।

"আচ্ছা ময়না, মতিয়া কাহাকে ভালবাসে?"

ময়না আবার ঘাড় বাঁকাইল।

"সুরথকে? সুরথকে কে না ভালবাসে!"

ময়না আলিশার উপর দুই চারি পা হাঁটিয়া গিয়া আবার ঘুরিয়া আসিয়া কান পাতিল।

জহর বলিল "দেখ আমিও ত মতিয়াকে ভালবাসিতাম—এখনও ভাল-

বাসি। আমার কি কোন আশা আছে?—নাঃ! সুরথের মতন কি সকলেই হয়!"

ময়না গ্রীবা সোজা করিবার প্রয়াস করিয়া আবার হেলাইল ও দুই ধাপ নামিয়া আসিল।

জহর যেন অর্দ্ধেক নিজেকে ও অর্দ্ধেক ময়নাকে বলিতে লাগিল: "দেখ এই মতিয়া যেন জোর জবরদস্তি করিয়া আমাদের দুই জনের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। সুরথের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইবে ভাবিতেই মরিয়া যাই। পীরিতকে ত আগে জানিতাম না, জানিতাম সুরথকে। মধ্য হইতে পীরিতটা আসিয়া তাহাকে আমার নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহে: আমি কিছুতেই তাহা মানিব না।"

ময়না মাটীর দিকে মুখ করিয়া গর্ গর্ করিয়া কি শব্দ করিল। শেষে ঘাড় সোজা ও বাঁকা করিয়া জহরকে আপাদমস্তক বিচার করিতে লাগিল। জহর তখন গান ধরিয়াছে:

তৃণতরুহীন বিশাল প্রান্তর মধ্যে—বাঁশীর মতন তীব্র উচ্চ তান তপ্ত মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা স্তরে স্তরে বিদীর্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভীক সপ্তমে কাঁপিতে লাগিল। জহর ভাবিল—যাহার আঁখি, যাহার চরণ আকাঙ্ক্ষিত হইয়া হৃদয়ে উন্মত্ত রক্ত সঙ্গীতবেগে শিরায় শিরায় আঘাত করিয়া ফিরিতেছে—কিন্তু প্রকাশ না পাইয়া কণ্ঠের দুয়ারে এই ব্যাকুল ঝঙ্কার জাগাইয়া তুলিতেছে, সে যেন আজি আনতদৃষ্টিতে শিয়রে দাঁড়াইয়া। সে প্রখর পাণ্ডু রৌদ্র দেখিতে পাইল না; তীব্র তপ্ত বায়ুর বহ্নি-জ্বালা একটুও অনুভব করিল না; দাঁড়াইয়া কি বসিয়া রহিয়াছে বুঝিতে পারিল না: সূক্ষ্ম চিন্ময় সঙ্গীতশব্দের ন্যায় সে রৌদ্রালোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। অবশেষে যখন সেই মহিমালক্ষ্মীকে বেষ্টন করিয়া করিয়া আবেগে অনুরাগে হৃদয়ের অন্তহীন অবসাদপুর পর্য্যন্ত ধ্বনিয়া উঠিল তখন পূর্ণোচ্চ স্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া ক্রমে ম্লান, মন্দীভূত হইতে হইতে গম্ভীর নিস্বনে মিলাইয়া গেল।

গানভঙ্গে স্তব্ধ মধ্যাহ্ন আরও নিস্তব্ধ বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর ধরণীর রুদ্ধ তপ্ত শ্বাস বহিয়া আসিয়া পূর্ব্ব সমাচার জানাইয়া গেল।

জহর বসিয়া বসিয়াই মাথা ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল অনতিদূরে রহিয়া

সশব্দে হাসিতেছে।

"সর্ব্বনাশ! হায় হায়, তবে ত সব শুনিয়াছে! মতিয়া কি অন্তর্যামী? নহিলে এখন——"

জহর যেন কোন বৈদ্যুতিকক্রিয়ার একলম্ফে মাটীতে দাঁড়াইয়া গেল ও অপরাধীর মত চাহিয়া রহিল।

মতিয়া তেমনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল: "কই গো! যত না কাম হইতেছে, দেখিতেছি তাহার ঢের বেশী ঘাম ঝরিতেছে! চেঁচাইবার বুঝি আর দিন ক্ষণ নাই?"

জহর কিছুই শুনিতে পাইল না—নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। মতিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া কাছে আসিল। জহরকে একটু আড় চোখে দেখিয়া বলিয়া উঠিল:

"ওমা, মা! জহর, তুমি কি নোংরা! হ্যা দেখত খপ্‌সুরৎ! লোকে দেখিয়াও ত একটু শেখে। ছি-ই-ই-ঈ!"

কথা শেষ হইতে না হইতে সে ঠোঁট উল্টাইয়া, শরীরের উত্তরার্দ্ধ দোলাইয়া এমন করিয়া শিহরিয়া উঠিল যে স্পষ্ট বোধ হইল যেন কেহ সমস্ত কাঁটাগাছ তাহার সর্ব্বাঙ্গে চিরুণীর মত বুলাইয়া গেল।

হতবুদ্ধি জহর মাথা হেঁট করিয়া নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার সাহস হইল না। কেবল খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল:

"তাই ভাবিতেছি একটা 'সাদী' করিলে হয়। হামেসা সাফ থাকা একেলার কাম নয়—আর একজন যোগান না দিলে বড়ই মুস্কিল! কিন্তু সুরৎ কি করিয়া——"

জহরের এই মন্তব্যের উপর মতিয়ার বাক্য ঠিক খঙ্গার মত আসিয়া পড়িল।

"ঈস্! মিন্‌সেদের অমনি আস্পর্দ্ধা! কোন্ আবাগী হাতের খাড়ু কাঙ্গাল হইয়াছে যে সাধ করিয়া মেথরাণীপনা করিতে আসিবে? মরন আর কি! কাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে যে—"

বলিতে বলিতে কথা শেষ না করিয়া গভীর ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষে

একটা ধিক্কার জানাইয়া দিল এবং কথায় যাহা বলিল না তাহা ভাবে ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া জহরকে আপাদমস্তক দগ্ধ করিতে লাগিল।

জহরও সেই সময়ে একটা অসামান্য কাজ করিয়া বসিল। সে অনায়াসে এত বড় 'শক্তিশেল'টা মুহূর্ত্ত মধ্যে গলাধঃকরণ করিয়া এবং কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল:

"সুরথ ত তাহা নয়! সুরথকে আর কেহ ফেলিতে পারিবে না। সুরথ যাহাকে হাতে বাঁধিবে সে রাণীর হালে থাকিবে। সুরথের মতন সুন্দর –"

সুরথের জন্য ওকালতী অবলম্বনপূর্ব্বক সওয়াল জবাব করিতে করিতে জহর একটু স্ফূর্তি পাইয়া স্বকীয় আত্মগ্লানিটা কিয়ৎপরিমাণে জীর্ণ করিয়া ফেলিল। জহর ভাবিয়াছিল এইবার মতিয়া ঠেকিয়াছে---ইহার জবাব দিতে পারিবে না।

কিন্তু মতিয়া 'আর নাচ' বলিয়া কথা পূরণ করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শুধু হাস্য করিয়া জহরের সমস্ত বাক্যবল চূর্ণ করিয়া দিল। বায়ুকম্পিত নারিকেলদলগুলি যেমন রৌদ্রালোক ঝিকিয়া উঠে তেমনি সে হাস্যমুখরিত হইয়া নীরব গরবে চলিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে গমনোন্মুখী মতিয়া ফিরিয়া কহিল: "চলিলাম গো! এই সাহুটোলার দিকে একটু আসিয়াছিলাম। যাই, দেখিব গিয়া এখন বাথান ভরিয়া গিয়াছে!"

জহর ভাবিল--- আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাই না কেন। কিন্তু সাহস হইল না। মতিয়া কখনই তাহা হইতে দিবে না--কখনই তাহা ক্ষমা করিবে না। অবশেষে নিরুপায় ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধদৃষ্টিদ্বারা মতিয়ার প্রত্যেক পদক্ষেপ অনুসরণ করিতেছিল--- দেখিল মতিয়া অল্প খানিকটা দূর গিয়া হঠাৎ বসিয়া পড়িল।

উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া সে তথায় অগ্রসর হইয়া দেখে মতিয়া দুই হাতে দক্ষিণ পদ চাপিয়া একেবারে মাটীতে বসিয়া পড়িয়াছে।

শশব্যস্ত জহর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল "কি হইয়াছে?"

ভ্রূকুঞ্চিত মুখে হাসিয়া উঠিয়া মতিয়া কহিল "কিছুই না। পা'খানা একটু

মচ্‌কাইয়া গিয়াছে।"

জহর ভারি ভাবিত হইয়া পড়িল এবং অতিকষ্টে নিবেদন করিল যে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলে ভাল হইতে পারে।

কিন্তু মতিয়া দুইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াই বসিয়া রহিল---- দূর ছাই! সে তাহা পারিবে না।

জহর অর্দ্ধ স্বগতভাবে কহিল "হরণ থাকিলে ভাল হইত!"

মতিয়া একেবারে কাংস্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কেন---- সে থাকিলে কি এমন কি হইত যাহা তুমি পারিতেছ না?"

জহর তাহাতে কিছুই মনোযোগ দিল না। সে ততক্ষণ মতিয়ার ধপ্‌ধপে শাদা চুনরী আর নৈষনীর কাঁচলখানির সহিত আপনার ধূলিকর্দ্দমাক্ত পরিধেয়ের একটি রাসায়নিক তুলনা মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিল। অবশেষে বলিয়া ফেলিল: "যদি বল ত, আমি বহিয়া লইয়া যাইতে পারি।"

মতিয়া অনুনাসিক স্বরে যেন আপনাকেই কহিল "কি করি! আচ্ছা মুস্কিলেই পড়িলাম। আমারও যে ছাই! শীগ্‌গির না গেলেও নয়।"

জহর আর কোন কথা না কহিয়া এক হস্তে তাহার পদদ্বয় সাপটাইয়া ধরিয়া ও অন্যহস্ত পিঠের নিচে স্থাপন করিয়া অনায়াসে তাহাকে দ্বিহস্ত-বিস্তৃত বক্ষের উপর তুলিয়া লইল।

মুহূর্ত্তের জন্য তাহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ কাঁপিয়া গেল--- "এত কাছে, তবু কিছু কাছে নয়" ভাবিতে ভাবিতে সে চলিতে লাগিল।

কিছু দূর যাইতেই মতিয়া ধীরে ধীরে জহরের স্কন্ধে মাথা রাখিল ও তাহার কবোষ্ণ নিশ্বাস জহরের গণ্ডদেশ স্পর্শ করিতে লাগিল। জহরের যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া বুক ফুলিয়া উঠিল।

মতিয়া ডাকিল 'জহর'!

জহর উত্তর করিল 'কি!'

"মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছ যে!"

"তাহাই ভাল!"

"কেন? আমার মুখখানা কি এত মন্দ!"

"তোমার মুখ মন্দ! খুব সুন্দর! খুব সুন্দর!"

"তবে আমার পানে চাও।"

জহর চাহিল— মতিয়া তখন টিপ টিপি হাসিতেছে।

মতিয়া কহিল "জহর, আমি কি খুব ভারী?"

'ভারী! হাওয়ার চেয়েও তুমি হাল্কা।'

'কই! আবার যে তুমি মুখ ফিরাইলে?'

'এমনি থাকি।'

'কেন?'

'কেন, শুনবে?'

'হাঁ— বল।'

'বড় লোকদের বাগানবাড়ী তে লিচুর গাছ দেখিয়াছ?'

'হাঁ।'

"লিচু পাকিলে গাছগুলা জাল দিয়া ঘিরিয়া দেয় দেখিয়াছ?"

'দেখিয়াছি।'

"কেন দেয় বল ত?"

'কি জানি! তুমিই বল।'

"পাখীতে ঠোকরায় বলিয়া।"

মতিয়া আর কোন কথা না কহিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল জহর তাহা দেখিল না।

দোকান ঘরের বিশ হাতের মধ্যে আসিতেই মতিয়া জেদ করিয়া বলিল— 'আমাকে নামাইয়া দাও'। জহর মৃদুভাবে একটু আপত্তি করিতে যাইতেছিল কিন্তু সে তৎক্ষনাৎ লাফাইয়া মাটীতে খাড়া হইয়া জহরকে কহিল 'আমি আগে যাই, তার পর তুমি এস— সাবধান আমার সঙ্গে এস না।'

এই বলিয়া সে অতি অনায়াসগতিতে চলিয়া গেল। বেদনা বা পা মচ্‌কানোর কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। জহর কেবল একটা আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাইল।

মতিয়ার দোকানমণ্ডপ খাপ্‌রেলবর্ত্তিত। ঘরের দাওয়া মাটীর, কিন্তু ঘরে উঠিবার সিঁড়ীটা ইষ্টকনির্ম্মিত। চতুঃপার্শ্বে কঞ্চির বেড়া বিনিয়া আনিয়া সম্মুখে একটা প্রবেশপথ ফাঁক রাখিয়াছে— কঞ্চিনির্ম্মিত একখানি ঝাঁপ

ফটকের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ঘরের মেজেতে একখানি তক্তোপোষের উপর নানামূর্ত্তিবিশিষ্ট ঝাঁকা, ধামা, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদি রুচিসঙ্গত করিয়া সজ্জীকৃত রহিয়াছে এবং তদুপরি বিবিধপ্রকারের সওদা কোণহীন বর্তুলাকার পিরামিডের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। এই সমুদায় সওদাজাত পিরামিড পারিষদবর্গের মধ্যে ছোলা ও যবোদ্ভিন্ন দ্বিবিধ বর্ণের ছাতুর সমুন্নত মহিমা অতি সহজেই দর্শকের নয়ন আকর্ষণ করিত।

ইত্যাকার রাজধানীতে নিত্য বিরাজ করিয়া মতিয়া অন্নপূর্ণার ন্যায় সকলকে আহার্য্য বণ্টন করিয়া দিত; অপরিমিত-গঞ্জিকা সেবনকারীকে প্রতিষেধ করিত ও পূর্ব্বাভ্যাসক্রমে মধ্যে মধ্যে নৃত্যগীতদ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতেও আলস্য বোধ করিত না। কিন্তু যাহাই করিত সকলি আপন ইচ্ছায়— তাহাতে কাহারও উপরোধ বা অনুরোধ খাটিত না। সে খলবুদ্ধি বিড়ালশাবকটির ন্যায় এই সকল মনুষ্যসর্প দিগকে থাবা মারিয়া সচেতন করিয়া তুলিয়া ক্রীড়া করিতে ভাল বাসিত; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ সাহস করিয়া ফণা উত্তোলন করিলে সে অমনি সম্মুখের একখানি পা উঁচাইয়া নিজের মাথা আড়াল করিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে মজা দেখিত।

জহর সরাইয়ে গেল না। সেখান হইতে ফিরিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। আর মিথ্যা বলিতেছি না, সত্য সত্যই সে দুইটি পয়সার দিশী সাবান রাস্তার মধ্যে কিনিয়া লইল। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে যখন সে মতিয়ার সরাইয়ে গিয়া হাজির হইল তখন তাহার গায়ে ধূলা মাটীর চিহ্নও নাই; ধুতিখানি ও কোর্ত্তাটা বেশ পরিষ্কার— মাথার চুলগুলিও পরিপাটী। সে প্রথমেই সরাইয়ে ঢুকিল না। ঘরের একটু আড়ালে থাকিয়া দেখিতে লাগিল খপ্-স্বরূপ একটা ছোট খাটিয়ায় বসিয়া গান করিতেছে আর চতুর্দ্দিকে সমবেত শ্রমজীবির দল হাস্যোল্লাসের বল্গা প্রাণপণে আল্গা করিয়া দিয়াছে। গান থামিলে যখন জহরী ওস্তাদের খোঁজ পড়িল তখন সে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া প্রবেশদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। অমনি "ওস্তাদ জী" "ওস্তাদ জী" করিয়া চারিদিকে একটা সংক্রামক ধ্বনি পড়িয়া গেল। কেহ বলিল "ওস্তাদ জী ঢের দিন বাঁচিবে!" কেহ বলিল 'ওস্তাদ! আজ যে এত দেরী?' এইরূপ নানাপ্রকার সম্বর্দ্ধনা সমস্বরে উচ্চারিত হইয়া জহরের শুভাগমন

অভ্যর্থনা করিল।

মতিয়া এতক্ষণ তৌলক্রিয়া করিতে করিতে দাঁড়ির উপর দিয়া জহরকে দেখিতেছিল তাহার পর সকলে থামিয়া গেলে জহরের সম্মুখীন হইয়া কহিল :—

"মরি মরি! আজ যে একেবারে নাগরবেশ! ওগো তোমরা সকলে শোন আজিকে ওঁর একজন নাগরী সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। তুমি আর এখানে কেন? আপনার বাসায় যাও। মেহেরবানী করিয়া আমার সেলামটা তোমার তাঁর কাছে পৌছাইয়া দিও আর কসুর মাপ করিতে বলিও। যাও যাও এই বলিয়া সে অঙ্গুলি দিয়া গন্তব্য পথ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিল।" মতিয়ার এই ব্যবহারে সকলেই কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। জহরও ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কেহই দেখিতে পাইল না যে মতিয়ার একচক্ষু অন্তরালে রহিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছে না।

সকলে ওস্তাদের মুখে একটা গান শুনিবে বলিয়া খানিকক্ষণ রৈহাত চাহিল, কিন্তু মতিয়া তাহা শুনিবার পাত্র নহে। সে বলিল "তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না! হুজুরে হাজিরা দিতে হইলে একটুও বিলম্ব উচিত হয় না— কাজে কাজেই—" বলিয়া জহরের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া প্রস্থানাদেশ করিল।

জহর ধীরে ধীরে সরাই হইতে বহির্গত হইল। ভাবিয়াছিল অন্য কোন এক দিক চলিয়া যাইবে, তাহা না গিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বাসায় ফিরিয়া ঝাঁপ রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারগৃহে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আর যাহা ভাবিতে লাগিল তাহা উপন্যাসের নায়ক কিম্বা পাঠকদিগের নিকট কিছুই নূতন নহে, সুতরাং লেখা অনাবশ্যক বোধ করিলাম।

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর সুরথ আসিয়া ঝাঁপ ঠেলিল কিন্তু খসাইতে না পারিয়া দুই তিনবার 'জহর' 'জহর' করিয়া ডাকিল— কোন উত্তর পাইল না। অবশেষে বহুকষ্টে ঝাঁপ উন্মোচন করিয়া ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক দেশলাইয়ের সাহায্যে চেরাক ধরাইল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখে জহর এককোণে দেওয়াল ঠেস্ দিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

অমনি সে জহরের হাঁটুর উপর গিয়া বসিয়া পড়িল এবং তাহার বুকে হাত দিয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল "আর ভাই, আমাদের এ দেশে থাকা হ'ল না।"

জহর শুনিয়া বড় ব্যস্ত হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল "কেন? কি হইয়াছে?"

সুরথ একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল: "যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে! মতিয়াকে সাথীর জন্য আজ অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়াছিলাম কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হইল না। আর আজ তোমার সঙ্গে কি ব্যবহারটাই করিল। মতিয়া আমাদের দুই জনের মধ্যে কাহারও না হইয়া যদি অন্য কাহারও হয় তবে এখানে থাকিয়া তাহা আমি দেখিতে পারিব না। আমাদের অন্যত্র যাওয়াই ভাল।"

জহর অনেকক্ষণ মন মরিয়া রহিল, পরে সুরথের পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া কহিল "হাঁ ভাই, চল আমরা অন্যত্র যাই— এখানে পোষাইল না। নূতন ঠাঁই দেখিতে হইল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া দুই দোস্তে বসিয়া স্থান পরিত্যাগের বিষয় বলা কহা করিয়া আগামী পরশ্ব প্রত্যুষে দিনস্থির করিল। যে টুকু কাজ বাকি রহিয়াছে আগামী কল্য তাহা সমাধা করিতে এবং পাওনা টাকা সরকার হইতে চুকাইয়া লইতে সুরথ প্রতিশ্রুত হইল, কারণ জহর বলিল সে যাইবার পূর্ব্বে সে আর ঘরের বাহির হইবে না।

পরদিন চৌকিডাঙ্গায় পাড়ে কেহ শুনিল জহর আর সুরথ বিদেশে যাইতেছে। কেহ বলিল জহরের অন্যত্র কাজের সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু সুরথকে সে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না, সুতরাং সুরথও ঐ সঙ্গে যাইবে।

সন্ধ্যার সময় সুরথ সকল বিষয় সম্পূর্ণ সমাধা করিয়া বাসায় ফিরিল। জহর জিজ্ঞাসা করিল "সব ঠিক হইয়াছে?" সুরথ কহিল "হাঁ, সব ঠিক!"

সুরথ জিজ্ঞাসা করিল "মতিয়া ও দলের সহিত একবার বিদায়-সাক্ষাৎ করিতে যাইবে না?"

জহর কহিল "না, আমি আর যাব না। তুমি আমার হইয়া দু'কথা বলিও।"

সুরথ যখন ঘরের বাহির হইল তখন আকাশ যুড়িয়া খুব মেঘ হইয়াছে ; রাত্রির মধ্যে আর এক রাত্রি সংহত হইয়া ঘনীভূত অন্ধকারকে যেন স্পর্শা-নুভাব্য করিয়া তুলিয়াছে।

সুরথ ধীরে ধীরে মতিয়ার দোকানে উপস্থিত হইয়া জানা-কথা সকলের নিকট পুনরাবৃত্তি করিল।

মতিয়াও ধৈর্য্যসহকারে সব শুনিল— কেবল কখন রওনা হইবে, অন্য-মনস্কভাবে সেই সংবাদটা লইয়া চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরেই প্রবল বেগে ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া আসিল, দুই এক ফোঁটা করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সুরথ শেষ দিনে সকলের সঙ্গে একটা খোস গল্প যুড়িয়া দিয়াছিল। মতিয়া তাহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য দোকান দেখিতে উপদেশ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ক্বচিৎ বিদ্যুতালোকে পথ চিনিয়া চিনিয়া সে জহরদের কুঁড়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বাহির হইতে ঘরের গায়ে কান পাতিল, কিছুই শুনিতে পাইল না। বৃষ্টির বেগ তখন প্রবল হইয়াছে, বাহিরে থাকাও অসম্ভব। সুতরাং ধীরে ধীরে ঝাঁপ ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

জহর চুপ করিয়া বসিয়া অভিনিবিষ্টচিত্তে ছাদ্‌নায় বৃষ্টিপতনের শব্দ শুনিতেছিল— কিছুই বুঝিতে পারিল না।

মতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। জহর মাথা তুলিয়া তাহাকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

জহরের মুখের দিকে দৃষ্টিন্যস্ত করিয়া মতিয়া জিজ্ঞাসা করিল "শুনিলাম, কালিকাই তোমরা যাইতেছ ?"

জহর ফোঁপাইয়া উঠিল 'হাঁ' !

মতিয়া কহিল "তা' একটি বারও বুঝি দেখা করিতে নাই ? তাহাও বারণ দিয়া ?"

জহর মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

মতিয়া কহিল "জহর, দেখত আমি সে দিনের চেয়ে আজিকে ভারী কি ছোট হইয়াছি ? তুমি ত যাইতেছ: তোমার হাতে একবার ওজন হইয়া

থাকি।"

জহর মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখে মতিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে।

সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া মতিয়াকে অক্লেশে তুলিয়া লইয়া বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল।

মতিয়া তাহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া কহিল :—"দেখ, আজিকে বোধ হয় নিচুরগাছে জাল ঘেরা নাই।"

জহর বুঝিল। মাথা আনত করিয়া মতিয়ার বিম্ব-ওষ্ঠাধরপুটে নিবিড় চুম্বন করিল।

মতিয়া হাসিয়া কহিল "আর মিছে সোহাগ! কালই ত তুমি যাইতেছ?"

জহর অতিকষ্টে কহিল "হাঁ, তোমাকে ভাল বাসিয়া এই ফল। অসময়ে তুমি—" আর বলিতে পারিল না।

"কই তুমি ত এক দিনও তাহা আমাকে বল নাই!"

জহর ভাবিয়া দেখিল 'সত্যই ত!'

'তোমার থাকার কি কোন উপায় নাই—'

'আছে।'

'কি?'

'তোমার কাছে।'

"আমার কাছে যাহা ছিল তাহা এই দিলাম" বলিয়া মতিয়া জহরের গণ্ডদেশ চুম্বন করিল।

'থাকিলে?'

তাহার উত্তর ভাষা না হইয়া, হইয়া গেল চুম্বন। তথাপি কোন ভাষা অপেক্ষা ইহার অর্থ অস্পষ্ট হইল না।

ঘরের মধ্যে জহর মুগ্ধভাবে মতিয়ার হৃদয়স্পন্দন আপনার হৃদয়ে শুনিতেছিল। বাহিরে ছাদুনাতলার বৃষ্টির জল কল কল শব্দে বহিয়া গিয়া খানের ভিতর পড়িতে লাগিল।

জহর আর মতিয়ার পরিণয়ে সকলেই সুখী হইল, অযোগ্য বা অযোগ্যা বলিয়া কোন কথা কাহারও মনে উদয় হইল না। মতিয়া দোকান উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু সুরথ সর্বদা সাহায্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ করায়

তিন জনে দোকানেই বসত ঠিক করিয়া আর দুইখানা ঘর তুলিয়া লইল।

দলের লোকেরা জহরের সহসা বিদেশগমনের কারণটা ফাঁক করিতে সক্ষম হইয়া একদিন মহাসমারোহে একটা 'খানাপিনা' করিয়া লইল।

* * * * *

প্রত্যেক প্রান্ত বা সীমা যেমন এক হিসাবে শেষ, তেমনি অন্য হিসাবে উহা আরম্ভ। এই তিনটি তরুণ মানব হৃদয়ের সহিত এতক্ষণ যাপন করিয়া, তাহাদের শেষ বয়সে কি হইয়াছিল তাহা না জানিয়া সহজে কাহার পরিতৃপ্তি হয়? কারণ জীবনের ভগ্নাংশ যতদূরই যথার্থ হউক না কেন, উহা কখনই সমগ্র গঠিত জীবনজালের নমুনা হইতে পারে না।

আমরা জহরের ক্ষুদ্র জীবননাট্য এইখানেই শেষ করিলাম, কিন্তু জহরের গৃহকাব্য এইখান হইতেই আরম্ভ হইল।

সুরথ আর জহর কোন দিন ভিন্ন হয় নাই। উত্তর বয়সে তাহাদের সঞ্চিত লক্ষ্মীশ্রী আটচালা ঘরে দেদীপ্যমান হইলেন। জহরের প্রথমে এক পুত্র, পরে একটি কন্যা হইল। সুরথ বিবাহ করিয়াছে কিন্তু তাহার কোন সন্তান হইল না।

সুরথের নিকট এখন দিনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ ছেলেদের নিত্য নূতনতর দৌরাত্ম্য হৃষ্টচিত্তে সহ্য করা। বলা বাহুল্য সে আর তত পরিচ্ছন্ন থাকিতে অবকাশ পায় না। এমন কি, এক বছরের মেয়ে 'ভূষনি'র পায়ের ছাপটা যে দিন তাহার কাপড়ে না লাগিত সে দিন তাহার ভারি অসুখে যাইত। কাপড়ের ছাপটা লইয়া মধ্যে মধ্যে সে সকলকে দেখাইত যে 'ভূষনি'র পা কেমন আশ্চর্য্যরকম ছোট।

নেনকু যে দিন দোকানঘরের সবগুলি সিঁড়ী বাহিয়া একেবারে নীচে নামিয়া পড়িল, সুরথ তৎক্ষণাৎ মতিয়ার নিকট দৌড়াইয়া গিয়া নেনকুর এই অসামান্য ব্যাপার আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল ও বার বার করিয়া কহিল "নেনকু নিশ্চয়ই জহরকে জিতিবে।"

মতিয়া নয়ন-কোণে অঞ্চল দিয়া হাসিয়া কহিল: "কিন্তু সুরথ কাকার অঙ্ক যদি পরিষ্কার না হয় তবে উহাকে ফেলিয়া দিব!"

মোগল সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা।

ধর্ম্মমণ্ডলী নরপতি নির্ব্বাচন করিবেন। এবং কোরাণের আদেশ উৎকট ভাবে উল্লঙ্ঘন করিলে সে নরপতি পদচ্যুত হইবেন, ইহাই এসলাম ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু কার্য্যকালে মোসলমান জাতির রাজপদ বংশানুক্রমিক ও রাজার ক্ষমতা অখণ্ড। মোসলমান নরপতি এসলাম ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধানপ্রতিপালন করিবার জন্য লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী। কিন্তু তিনি পদে পদে সে বিধান উল্লঙ্ঘন করিলেও তাঁহাকে পুনর্ব্বার তাঁহার অনুগত করিয়া তুলিবার কোন পন্থা নাই। প্রকৃতিপুঞ্জ বিদ্রোহ অবলম্বন ব্যতীত আর কোন উপায়েই রাজার তাদৃশ স্বেচ্ছাচারের গতিরোধ করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের মোগল নরপতিগণও রাজ্যশাসন ব্যাপারে কোন নিয়মাধীন ছিলেন না। তাঁহারা স্বেচ্ছামত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে আদেশ প্রদান করিতেন তাহাই সকলসাধারণকে শিরোধার্য্য করিতে হইত। কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমীর কি নগণ্য কৃষক সকলেরই ধনপ্রাণ তাঁহাদের অঙ্গুলিসঞ্চালনে মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইত। বিদ্রোহ অবলম্বন ব্যতীত ইহার প্রতিরোধ করিবার আর কোন উপায়ই ছিল না। ফলতঃ ভারতবর্ষের মোগল শাসন প্রণালী যথেচ্ছামূলক ছিল।

বাবর সসৈন্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বাহুবলে লোদি বংশের হস্ত হইতে রাজ্য অধিকার করেন। আফগান শাসনকালে নরপতিগণ ভূস্বামী ছিলেন। তদনুসারে বাবরও দেশের সমস্ত ভূমির অধিকারী (Propriotor) হন। এই ভূমির রাজস্বই মোগল নরপতিগণের অতুল ঐশ্বর্য্যের মূল কারণ ছিল। প্রথমতঃ প্রকৃতিপুঞ্জ কেবল মাত্র অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ অর্থের অধিস্বামী ছিলেন; কিন্তু রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার অনুমতি ব্যতীত তাদৃশ সম্পত্তির ও উত্তরাধিকারী নিয়োগ সম্বন্ধে চরম পত্র দ্বারা কোন প্রকার নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু কালবশে এই প্রথার কথঞ্চিত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মোগল বাদশাহগণ কোন কোন কার্য্যের জন্য রাজপুরুষদিগকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি প্রদান করিতেন। রাজপুরুষগণ ইচ্ছামত এই সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিতে পারিতেন এবং কোন রাজপুরুষ মৃত্যুর পূর্ব্বে

উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে অনুরূপ চরম নিৰ্দ্ধারণ করিয়া না গেলে তদীয় সন্তানবর্গ কোরাণের নির্দ্দেশ মত সমস্ত সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইতেন। এইরূপ ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই নরপতিগণ পূর্ব্বোক্ত জায়গীর সকল বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন; তাহার প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় ছিল না। কোন কোন বাদশাহ ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন; অনেক স্থলে তাঁহাদের তাদৃশ কার্য্যের সমর্থনও করা যাইতে পারে। সাম্রাজ্যের স্বামিত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে রাজকুমারগণ সেনাপতিদিগকে বশীভূত রাখিবার জন্য নির্ব্বিচারে জায়গীর দান করিতেন। দু'একবার রাজবিপ্লবের পরেই পূর্ব্বোক্ত কারণে রাজস্ব বহুলপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত। এজন্য বাদশাহগণ কখন কখন সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুরুষগণের বিপ্লবলব্ধ জায়গীর সকল ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

বাদশাহগণই সমস্ত প্রজার সাধারণ উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু মূল ধনীর সন্তান বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহারা স্বয়ং প্রজার সম্পত্তি কদাচিৎ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কোন রাজপুরুষ প্রজাপীড়ন দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিলে বাদশাহগণ তাঁহার মৃত্যুর পর সে সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেন। এরূপ স্থলে মূল ধনীর সন্তান অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ কাজির নির্দ্দেশমত জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত বৃত্তি পাইতেন; ও তাঁহাদিগকে রাজকার্য্য প্রদান করা হইত। কোন প্রকার ওয়ারীস বিদ্যমান থাকিলে বণিক, ব্যবসায়ী অথবা শিল্পিগণের সম্পত্তি কখনও বাজেয়াপ্ত করা হইত না।

মোগল শাসনকালে রাজপুরুষগণের মর্য্যাদা ও সম্মান বংশানুক্রমিক ছিল না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিভাবলে রাজকার্য্যে প্রতিপত্তি এবং রাজানুগ্রহে দরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়া যশস্বী ও সম্মানভাজন হইতেন। কোন প্রতিভাশালী রাজপুরুষের বংশ-মর্য্যাদা থাকিলে তাহা সোনায় সোহাগার ন্যায় কার্য্য করিত, তাঁহারা বংশগৌরব গর্ব্বিত সম্রাটগণের নিকট সমধিক প্রিয়পাত্র হইতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা ও পদবী রাজকার্য্যের অনুগত ছিল। কেবল সাম্রাজ্যের সৈনিক বিভাগে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর

হইত। বিচারক, সাহিত্যবিদ ও বণিকগণ অনেক সময় উপাধিলাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন এবং রাজদরবারে আমীর ওমরাহগণের সঙ্গে এক শ্রেণীতে আসন লাভ করিতেন। অভিজাত সম্প্রদায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: (১) আমীর (২) খাঁ (৩) বাহাদুর। সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও সুবাদারগণ আমীরশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। খাঁ উপাধিধারীগণ সৈন্য বিভাগের বিশিষ্ট পদসমূহে নিয়োজিত ছিলেন। বাহাদুরগণ কার্য্যাদিতে বিলাতী নাইট সম্প্রদায়ের অনুরূপ ছিলেন। এই তিন শ্রেণীর কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না।

হিন্দুরাজত্বকালে কর্ম্মচারী ও সৈনিক পুরুষদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ ভূমিদান করিবার প্রথা ছিল। দাক্ষিণাত্যে মোসলমানের প্রবেশলাভ করিবার সময় বিজয়নগর প্রভৃতি রাজ্যে এইরূপ জায়গীরের প্রথা বিদ্যমান ছিল। মোসলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সৈনিকগণের পারিশ্রমিক প্রদান করিবার জন্য কিরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যাইতে পারে না। ফেরিস্তার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে জায়গীর প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার রাজত্ব কালের শেষ। পক্ষান্তরে সমস্-ই সিরাজের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে ফিরোজ শাহ তোগলক (১৩৫৫ খৃঃ) প্রথমে রাজকর্ম্মচারী ও সৈনিক পুরুষদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ জায়গীর প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন এবং ফিরোজের পূর্ববর্ত্তী আলাউদ্দীন (১২৯৫ খৃঃ) এ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন।(১) আমরা পরস্পর বিরোধী বিবরণের বর্ণনা প্রণালী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করি যে মোসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই জায়গীরের প্রথা অনুসৃত

(১) Some ancient Omrahs, who had estates conferred on them in the provinces near the Indus, had, for some time past, refused to supply their quotas to the army, for the maintenance of which they held these estates. *Quoted from the reign of Nasiruddin Mamood in Dow's History of Hindostan.*

This method (of paying officials) was introduced by Sultan Feroz and remains as a memorial of him. In the reigns of the former rulers of Delhi it had never been the rule to bestow villages as

হইয়াছিল, কিন্তু আলাউদ্দীন এ প্রথায় অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদিগকে নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন; তাহার পর ফিরোজশাহ তোগলক আলাউদ্দীনের নিয়ম রহিত করিয়া পুনর্ব্বার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করেন।

যাহাহউক বাবর ভারতবর্ষে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া জায়গীর প্রদানের প্রথাই অবলম্বন করেন। তিনি সেনাপতিদিগকে জায়গীর প্রদান করিতেন এবং সেনাপতিগণ এই প্রকার জায়গীরের উপস্বত্ব দ্বারা অধীনস্থ সেনাদিগকে পারিশ্রমিক দিতেন। হুমাউনও এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই প্রথার তিনটী দোষ ছিল। প্রথমতঃ অধীনস্থ লোকের প্রতি জায়গীর ভোগী সেনাপতিগণের অখণ্ড আধিপত্য সংস্থাপিত হইত, এজন্য তাঁহারা সহজেই বিদ্রোহ অবলম্বন করিতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা অত্যধিক লোভে জায়গীর ভূমির কর আদায় করিবার সময় নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতেন। তৃতীয়তঃ সেনাপতিগণ যে পরিমাণ সৈন্য প্রতিপালন করিবার উপযোগী জায়গীর ভোগ করিতেন তাহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিতেন। এই সব কারণে আকবর এই প্রথা রহিত করিয়া সৈন্যদিগকে নগদ পারিশ্রমিক প্রদান করিবার নিয়ম করেন। তিনি সেনাপতিদিগকে মনসবদার উপাধি প্রদান করেন। তাঁহারা গুণানুসারে দশহাজার, সাতহাজার, পাঁচহাজার কিংবা তদপেক্ষা অল্প সংখ্যক সৈন্যের অধিনায়কত্ব লাভ

---

stipends upon office-bearers * * * * Sultan Alauddin used to speak of this practice with disapprobation. * * * * Such a number of pensioners would give rise to pride and insubordination, and if they were to act in concert, there would be danger of rebellion. With these feelings there is no wonder that Alauddin refused to make grants of villages, and paid his followers every year with money from the Treasury. * * * * During the forty years of his reign, he (Firoz) devoted himself to generosity and the benefit of Musalmans by distributing villages and lands among his followers.—*Tarikh-i-Firoz-shahi* by Shams-i Siraj Afif

করিতেন এবং তাহাদের বেতন রাজকোষ হইতে পাইতেন। অধীনস্থ সৈন্যের সংখ্যানুসারে সেনাপতিদিগকে দশহাজারী, সাতহাজারী প্রভৃতি বলা হইত। সমগ্র সৈন্য এইরূপ যদৃচ্ছাভাবে বিভক্ত হইত। কোন এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যানুসারে সমগ্র সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলের পরিচালনার নিমিত্ত কোন এক নির্দ্দিষ্ট অনুপাতানুসারে সেনানায়ক নিয়োজিত করিবার নিয়ম ছিল না। প্রত্যেক মনসবদারের অধীনস্থ সৈন্যের একার্দ্ধ পদাতিক ও অপরার্দ্ধ অশ্বারোহী ছিল। পদাতিক সৈন্যের চতুর্থাংশ বন্দুকধারী ও অবশিষ্ট তিরন্দাজ ছিল। মনসবদারের অধীনস্থ সৈন্য ব্যতীত আর এক শ্রেণীর সৈন্য ছিল। তাহাদিগকে আহেদী বলিত। কখন কখন রণকুশল অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষ একাকী মোগল সরকারে কর্ম্ম প্রার্থনা করিত; তাহাদিগের জন্যই এই সৈন্য-দল গঠিত ছিল। ইহাদের বেতন মনসবদারের অধীনস্থ অশ্বারোহী সৈন্যদের পারিশ্রমিক অপেক্ষা অধিক ছিল। আহেদী সৈন্যের বেতন গুণানুসারে স্থিরীকৃত হইত। মনসবদারের অধীনস্থ অশ্বারোহী সৈন্যবৃন্দমধ্যে ভারতবাসিগণ মাসিক বিশ টাকা ও সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরবাসিগণ মাসিক পঁচিশ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইত। তিরন্দাজ পদাতিক সৈন্যের বেতন মাসিক আড়াই টাকা ও বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্যের বেতন মাসিক ছয় টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। আওরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ে আহেদী সৈন্যের বেতন মাসিক পঁচিশ টাকার ন্যূন ছিল না। মোগল বাদশাহগণ গোলন্দাজবিভাগে ইউরোপীয়ানদিগকে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব এ প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া মোসলমানদিগকে গোলন্দাজ-বিভাগের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল মনসবদার আমীরশ্রেণীভুক্ত ছিলেন না তাঁহারা মাসিক দুইশত হইতে সাতশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন। সুবিখ্যাত বের্ণিয়ার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে মোগলাধীনে মনসবদারগণের বৃত্তি যথেষ্ট ছিল। আইন-ই-আকবরীগ্রন্থে আবুল ফজল মনসবদারগণের মাসিক বৃত্তি যে হারে প্রদত্ত হইত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন আমরা এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

দশ হাজারী—৬০০০০৲

আট হাজারী—৫০০০০৲

সাত হাজারী—৪৫০০০৲
পাঁচ হাজারী—৩০০০০৲
চারি হাজারী—২২০০০৲
তিন হাজারী—১৭০০০৲
দুই হাজারী—১২০০০৲
এক হাজারী—৮২০০৲

কেবল মাত্র রাজকুমারগণকেই দশ হাজারী মনসব প্রদান করা হইত। রাজকুটুম্বগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিলে আট হাজারী ও সাত হাজারী মনসবদার হইতে পারিতেন। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতাগুণে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিতেন। আকবরের পর বাদশাহগণ পুনশ্চ জায়গীর প্রদানের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং ক্রমশঃ জায়গীর ভূমি দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গীরদারগণ কালক্রমে সম্মিলিত হইয়া বহুসংখ্যক বংশানুগত স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী রাজ্য সংস্থাপন করাতেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিয়াছিল। (১)

মোগলশাসনাধীনে সৈন্য-সংখ্যা কত ছিল তাহা যথাযথরূপে নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় নাই। বের্ণিয়ার সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে আওরঙ্গজেব বাদশাহের দুই লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি গোলন্দাজ এবং অশিক্ষিত পদাতিক সৈন্য পরিপোষণ করিতেন। আকবরের সময়ে এতাধিক সৈন্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

(১) Keen's The Turks in India, p. 160

কবিতা-কুঞ্জ।

শৈশব-স্মৃতি।

আজি বহুদিন—
আঁধার শ্রাবণ রাতি, নির্ব্বাণ তারকা-ভাতি,
ঘনঘটা-আচ্ছন্ন গগন,
ধরণীর শ্যাম কোলে হাসিয়া বরষা দোলে,
তালে তালে গুরু-গরজন।

পরিয়া কিরণ-ভূষা কুসুম-মালিনী উষা
চকিতে বারেক পূর্ব্বাগারে,
প্রভাতের দ্বার খুলি ধরারে জাগায়ে তুলি
ঢাকে মুখ জলদ-আঁধারে।

কত সুখে তিন বোনে খেলিতাম কুঞ্জ মনে
—সরলতা শিশু হৃদয়ের;
শুনিতাম দূরে দূরে মোহন ললিত সুরে
কলালাপ বনবিহগের!

আজি কাল-চক্র বশে' কোথায় এসেছি ভেসে
কত দিন গিয়াছে বহিয়া,
কত উষা উদিয়াছে, সন্ধ্যা তারা নিভিয়াছে,
কত বর্ষা গিয়াছে চলিয়া!

ষড় ঋতু পায় পায় আসে আর চ'লে যায়
—প্রকৃতির মহা নাট্যলীলা;
অতীত আঁধার হ'তে ফিরে আসে মনোপথে
শৈশবের সেই ধুলো-খেলা।

—স্বচ্ছ জল, বাঁধা ঘাট, ধান্য-শীর্ষ,শ্যাম মাঠ,
সেই বাল্য সহচরীগণ,
অবগাহি' বাপী-নীরে আর্দ্রবাসে উঠি তীরে
ভক্তিভরে শিব আরাধন।

অপরাহ্ণে ফুল দলে বসি বকুলের তলে
মালা গাঁথা— কথা-বলাবলি,
শৈলমালা চারি পাশে, সমীরে সুবাস ভাসে,
তরু শিরে বিহঙ্গ কাকলি।

গাম্ভীর্য্য প্রতিমা খানি নেমে আসে সন্ধ্যা রাণী
গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসিনী—
ললাটে শান্তির তারা, ভাবেতে আপনা হারা,
উদাসিনী বিষণ্ণ-হাসিনী।

—স্মরি সেই বাল্যসুখ আজিকে উথলে বুক,
কোথা সেই আনন্দ কিরণ!
কল্পনার আঁখি 'পরে শুধু স্মৃতি ঘুরে মরে,
শুধু ছায়া— শুধু সে স্বপন!

হায়! যদি পুনরায় সে জীবন পাওয়া যায়
সে সুন্দর শৈশব সরল—
সেই হাস্য কোলাহল, সেই প্রীতি নিরমল,
সেই সব সঙ্গিনী কোমল!

জল আসে আঁখি পাতে, আর সে জীবন সাথে
এ জনমে হবে নাকো দেখা!
চির দিন দূরে বসি নয়ন-সলিলে ভাসি,
পড়িব গো শুধু স্মৃতি-লেখা।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

অমর।

(অনূদিত)

মধুর দিবস,

হেন স্নিগ্ধ, হেন শান্ত, হেন সমুজ্জ্বল—
স্বরগে মরতে যেন বিবাহ-বন্ধন;
শিশির কাঁদিবে হায়! ফেলি অশ্রুজল,
'রজনী আসিলে তব নাশ হবে সব.'!

সুন্দর গোলাপ,

হেন মনোহর বর্ণ, হেন সুবাসময়,
—প্রকৃতির যত্নে আঁকা চারু চিত্রপট;
মৃত্যু মাঝে তব মূল জানি সুনিশ্চয়,
ভ্রমর গুঞ্জরি কাঁদে—"মরণ-নিকট'!

বসন্ত মধুর,

কুসুমভূষিতঅঙ্গ বিহঙ্গনন্দিত,
গীতগন্ধবর্ণভরা আনন্দ উচ্ছল,
তোমার সঙ্গীতে সদা নাশ সূচিত;
জগতে অনিত্য সব, সকলি চঞ্চল!

শুধু নিরমল আত্মা পবিত্র সুন্দর,
মৃত্যুর কঠোর ঘায়ে পড়েনা ভাঙ্গিয়া;
সারা বিশ্ব চূর্ণ হবে,—অক্ষয়, অমর,
অনন্ত জীবন মাঝে রহে সে বাঁচিয়া।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

সে আছে।

সে গেছে চলিয়া, হেথা রেখে গেছে তার ছায়া;
মায়া তার প'ড়ে আছে, ছেড়ে গেছে তার কায়া।

নয়ন চলিয়া গেছে, দৃষ্টি তার জেগে আছে
গ[illegible] করুণা মাখা— ফিরে যেন কাছে কাছে।
ম[illegible] বদন খানি কোথায় গিয়াছে চ'লে,
লাজ মাখা হাসি টুকু শুধু তার গেছে ফেলে।
ফুলের পাপড়ি সম অধর গিয়াছে ঝ'রে,
সোহাগ চুম্বনটুকু কপোলে রেখেছি ধ'রে।
নিবিড় কুন্তল গেছে, রয়েছে সুগন্ধি ভার,
কর গেছে রেখে শুধু কোমল পরশ তার।
চরণ পলায়ে গেছে সুকোমল ধ্বনি আছে,
থেমে গেছে কণ্ঠ তবু রেশ টুকু র'য়ে গেছে।
জীবন গিয়াছে চ'লে হৃদি তার আছে জেগে,
"তুমি মোর প্রাণ-সখা—" আছে গান কাণে লেগে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু।

—

অশ্রু।

ফুল যে ঝরিয়া পড়ে,— কথা নাহি মুখে!
তার ক্ষুদ্র জীবনের বিকাশ বিনাশ,
তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাস,
র'য়ে গেল কিনা এই মর মর্ত্ত্য-বুকে,—
সে কি তা দেখিতে আসে? হেসে ঝরে যায়!
বনদেবী তার তরে, নীরব সন্ধ্যায়,
প্রশান্ত প্রভাতে, বসি' একান্তে নির্জ্জনে,
নির্ম্মল স্মৃতির উৎস— নয়নের নীর—
ফেলে যায় প্রতিদিন পবিত্র শিশির,
অতিজীর্ণপত্রাবৃত সমাধি-শিয়রে।
ভ্রমর ফিরিয়া যায় নিরাশ হইয়া;
শেষ মধুগন্ধটুকু কুড়ায়ে যতনে
ব্যথিত সমীর ফিরে আকুল ক্রন্দনে
লুপ্তপায় জনশ্রুতি— সমাধির পাশে।
কভু যদি কোন পান্থ পথ ভুলে আসে,
কহে তার কাণে কাণে বিষাদ-স্পন্দনে,—
"তোমরা এলে না আগে, দেখিলে না তারে,
ছোট ফুল— ঝ'রে গেল সৌরভের ভারে।"*

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

* ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের "উৎসাহের" জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ও কার্য্যারম্ভ করিবার পর ২৯শে ফাল্গুন বুধবারে উৎসাহ সম্পাদক বসন্তরোগে অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাচিত প্রবন্ধের উপর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন তাহা লইয়া 'উৎসাহ' ধীরে ধীরে পাঠক সমালোচক ও সহযোগীবর্গের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। লেখকবর্গের অনুরাগ ও অনুকম্পা অক্ষুণ্ণ থাকিলে 'উৎসাহ' আত্মকর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া ভরসা আছে।

প্রকাশক।

প্রদীপ

৪র্থ বর্ষ। } বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। { ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

উদ্বোধন।

তব চরণ-নিম্নে
উৎসবময়ী শ্যামা ধরণী সরসা।
ঊর্দ্ধে চাহ,—
অগণিতমণিরঞ্জিত-নভোনীলাঞ্চলা—
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা,
শান্ত-কুশল-দরশা।

দূরে হের,—
চন্দ্র কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্যপুলকগীতমুখর-কলুষহরতরঙ্গা,
ধায় মত্ত হরষে সাগরপদ-পরশে
কূলে কূলে করি পরিবেশন
মঙ্গলময় বরষা!

ফিরে দিশি দিশি,—
মলয় মন্দ কুসুম গন্ধ বহিয়া,
আর্য্য-গরিমা-কীর্ত্তি-কাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া;
হাসিছে দিগ্ বালিকা, কণ্ঠে বিজয় মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্যহরষা!

ওই হের,—
স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্বগগনে,
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি ডাকিছে সুপ্তিমগনে!
নিদ্রালস নয়নে, এখনো রহিবে শয়নে?
জাগাও, বিশ্ব পুলক-পরশে,
বক্ষে তরুণ ভরসা!

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

ফা হিয়ান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উত্তর ভারত।

চৈনিক [illegible]দিগের নিকট সিন্ধুর পশ্চিমপারস্থিত কতিপয় রাজ্য 'উত্তর-ভারত' নামে পরিচিত ছিল, তন্মধ্যে পূর্ব্বতীরস্থ কিয়ৎপরিমাণ ভূভাগও পরিগণিত হইত। এই সকল পুরাতন রাজ্যের মধ্যে টোলি, উদ্যান, গান্ধার, তক্ষঃশিলা, পুরুষপুর, ও নগরহার সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

উত্তর ভারতের উত্তরপশ্চিমাংশে টোলি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল,— ইহার পূর্ব্বভাগে সিন্ধুনদ, পশ্চিমে হুবাখোহ পর্ব্বতমালা। এই দেশে হীনযান সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল, এবং একটি ৮০ ফিট উচ্চ কাষ্ঠমূর্ত্তির জন্য টোলি রাজ্য বৌদ্ধতীর্থের মধ্যে পরিগণিত হইত। এই মূর্ত্তি— মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের। ফা হিয়ান বলেন,— "শাক্যসিংহের নির্ব্বাণলাভের তিনশত বৎসর পরে কোনও অর্হৎ কর্ত্তৃক এই কাষ্ঠমূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। তদুপলক্ষে বৌদ্ধ-শাস্ত্র সিন্ধুপারে নীত হইয়া অন্যান্য দেশে প্রচারিত হয়।" হিয়ঙ্ থ্‌সাঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়,— [illegible] রাজ্য তাঁহার সময়ে স্বর্ণের আকর ও কুঙ্কুমের উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। লোকে বলিত অর্হৎ মধ্যান্তিকের যত্নে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের কাষ্ঠমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। অর্হৎ মধ্যান্তিক একজন সুবিখ্যাত বৌদ্ধ প্রচারক,— তিনি যে কাশ্মীর ও হিমবৎ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, বৌদ্ধদিগের মধ্যে সকলেই তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই প্রচারকাল [illegible] এখনও তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। উদীচ্য বৌদ্ধমতে মধ্যান্তিক আনন্দের শিষ্য, তিনি গুরুর নির্ব্বাণলাভের পর বারাণসীতেই বসতি করিতেন। তথায় জনসাধারণ বৌদ্ধদিগের ব্যবহারে উত্যক্ত হইতেছে দেখিয়া মধ্যান্তিক যোগবলে দশসহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে সহসা কাশ্মীরে উপনীত হইয়া পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত [illegible]

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধমতানুসারে পরিনির্ব্বাণের তিনশত [illegible] পরে মধ্যান্তিক কাশ্মীরে প্রচারযাত্রা করেন। যাহা হউক,—এই [illegible] প্রচারকই যে উত্তর ভারতে বৌদ্ধমত প্রচারের পথ প্রদর্শক তদ্বিষয়ে সং[illegible] নাই।

ফা হিয়ান টোলি হইতে উদ্যানরাজ্যে গমন করেন, [illegible] বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া গান্ধার রাজ্যে উপস্থিত হন, তথা হইতে তক্ষশিলা ও পুরুষপুর দর্শন করিয়া নগরহার রাজ্যে প্র[illegible] করেন। এই স্থানে সহযাত্রিবর্গের মধ্যে অনেকের তীর্থযাত্রার শেষ হয়। [illegible] কেহ চীন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কেহ বা উত্তর ভারতেই দেহ[illegible] তে বাধ্য হন।

উদ্যান রাজ্য সিন্ধুতীরে সংস্থাপিত ছিল। তথায় মধ্যভারতের ন্যায় সুসভ্য সমুচিত অশন বসন ও সুমার্জ্জিত ভাষার পরিচয় পাইয়া ফা হিয়ান উদ্যানরাজ্যের অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এই রাজ্যে পাঁচশত সংঘারাম ছিল। যাঁহারা ভারতভূমি দর্শনকামনায় কত ক্লেশে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন; তাঁহারা উদ্যানে আসিয়া মধ্যভারতের কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় পাইয়া যে নিরতিশয় উৎফুল্ল হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? পরবর্ত্তী তীর্থযাত্রিগণের মধ্যে সঙ্গ ইউন এবং হিওন্থ থ্সঙ্গের গ্রন্থেও উদ্যানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সঙ্গ ইউন বলেন,—"উদ্যানের রাজা নিরামিষভোজী ছিলেন। তিনি প্রভাতে সায়াহ্নে শঙ্খ, বংশী, বীণা ও ডক্কানিনাদে বুদ্ধসেবা করিতেন; অপরাহ্ণে রাজকার্য্য পরিদর্শনার্থ সভাসীন হইতেন। সায়ংকালে বহুসংখ্যক শঙ্খঘণ্টানিনাদে চতুর্দ্দিকস্থ আকাশ প্রতিধ্বনিত হইত।" উদ্যান রাজ্যের উৎপত্তি ও তদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম নিবৃত্তি বিষয়ে হিওন্থ থ্সঙ্গ একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। একদা বিরূঢ়ক রাজা শাক্যরাজ্য আক্রমণ করিয়া শাক্যগণকে পরাস্ত করিলে, উদ্রসেন নামক শাক্যরাজকুমার উদ্যানরাজ্যে পলায়ন করিয়া হ্রদতীরে বিশ্রান্তিভূত হন। সে দেশে নাগজাতি বাস করিত; তাহাদের বেশভূষা আচার ব্যবহার অসভ্যের ন্যায় ভয়ানক ছিল। উদ্রসেন নাগকন্যার পাণিগ্রহণে হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তদ্দেশে রাজ্য সংস্থাপন করেন। শাক্যসিংহ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে পর সকল রাজন্যবর্গ তাঁহার [illegible] গ্রহণ করিবার জন্য কুশিনগরে সমবেত হন;

তন্মধ্যে উত্তরসেনও একজন। তিনি চিতাভস্ম আনিয়া উদ্যানে চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। এই আখ্যায়িকা অনুসারে উদ্যানে নির্ব্বাণের সমসময়েই বৌদ্ধমত প্রচারিত হওয়ার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গান্ধার একটি বহু পুরাতন রাজ্য—একদিকে কাবুলনদ অন্য দিকে সিন্ধুনদ, ইহার মধ্যে গান্ধার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান পেশোয়ার নগর সেকালে পুরুষপুর নামে গান্ধারের রাজধানী বলিয়া সুপরিচিত ছিল। ফা হিয়ান বলেন, মহারাজ অশোকের পুত্র ধর্ম্মবর্দ্ধন এই রাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করিতেন। ফা হিয়ানের সময়ে গান্ধার স্বাধীন ও সমৃদ্ধ জনপদ বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু হিয়ঙ্গের সময়ে গান্ধার হৃতসর্ব্বস্ব পরিত্যক্ত শ্মশানভূমির ন্যায় কপিশারাজ্যের উপবিভাগ রূপে শাসিত হইত। ফা হিয়ানের সময়ে গান্ধারে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ পরিলক্ষিত হইত; হিয়ঙ্গের সময়ে তথায় বৌদ্ধসংখ্যা অধিক ছিল না; অধিকাংশ লোকেই বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়াছিল। গান্ধার শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। হিয়ঙ্গ থসঙ্গ লিখিয়া গিয়াছেন যে;—পুরাকাল হইতে তাঁহার ভ্রমণ কাল পর্য্যন্ত গান্ধারনিবাসী অধ্যাপকবর্গ বহুশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নারায়ণ দেব, অসঙ্গবোধিসত্ব, বসুবন্ধু বোধিসত্ব, ধর্ম্মত্রাত, মনোহিত এবং পার্শ্ব অথবা আর্য্যপার্শ্বিক সুবিখ্যাত। ইঁহাদের জন্মভূমি বলিয়া গান্ধারের যে গৌরব ছিল, হিয়ঙ্গের সময়ে তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তৎকালে পরিত্যক্ত বৌদ্ধস্তূপ ক্রমশঃ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইতেছিল, তাহার স্থলে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া গান্ধারে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সাধন করিতেছিল। এই বৌদ্ধ জনপদে বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র সযত্নে রক্ষিত হইত;—বহুশতাব্দী লোকে সেই পাত্র পূজা করিবার জন্য গান্ধারে গমন করিত। হিয়ঙ্গের সময়ে ঐ ভিক্ষাপাত্র পারস্য দেশে নীত হইয়াছিল! ফা হিয়ান গান্ধারেই ভিক্ষা পাত্র দর্শন করিয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি

হন, তদ্বিষয়ে এখনও বাদ প্রতিবাদের অবসান হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস-লেখক হৃস্ ডেভিডের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪১২ অব্দের সমসময়ে শাক্য-সিংহ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহা ঠিক হইলে ফা হিয়ানের মতানুযায়ী কণিষ্কের রাজত্বকাল খৃষ্টির প্রথম শতাব্দীর অন্তর্গত হয়। অধ্যাপক লাসেনও এই মতের সমর্থন করেন। তিনি বলেন, কণিষ্ক খৃষ্টীয় ১০ হইতে ৪০ অব্দের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবেন। অন্যান্য লেখকগণের বিশ্বাস, কণিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক,— খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দ হইতে ভারতবর্ষে শকাব্দার প্রচলন হইয়াছে, তাহা কণিষ্কের রাজ্যকাল হইতেই আরব্ধ হয়। কণিষ্ক গান্ধারের রাজা হইলেও বহুদেশ বাহুবলে করপদ করিয়াছিলেন; জনশ্রুতি তাঁহার রাজ্যসীমা চীনদেশেও প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। হিয়ঙ্ থসঙ্গ বলেন,— কণিষ্ক পরিনির্ব্বাণের চারিশত বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া সমগ্র জম্বুদ্বীপ করতলগত করিয়াছিলেন। কণিষ্ক প্রথমে বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ছিলেন না,— একটি রাখাল বালক তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, শাক্যসিংহ কণিষ্কের আবির্ভাব ও কীর্ত্তিকলাপের কথা কহিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধদেবের ন্যায় সাধু পুরুষ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন শুনিয়া কণিষ্ক আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান হন। তিনি যে জনৈক প্রবল প্রতাপান্বিত বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া পুরাকালে সকল দেশেই সুপরিচিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল নরপালের সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম্ম জগদ্ব্যাপ্ত হয়, তন্মধ্যে অশোক ও কণিষ্কের নাম সুপরিচিত।

কণিষ্কের অত্যুচ্চ বৌদ্ধস্তূপের ন্যায় তাঁহার সংস্থাপিত সঙ্ঘারামও বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপরিচিত। গান্ধারের সাধু পুরুষদিগের পবিত্র স্মৃতি এই মন্দিরে সংরক্ষিত হইত। হিয়ঙ্ ইহার ভগ্নাবস্থা দর্শন করেন। এই মন্দিরের একটি কক্ষ পার্শ্বিকের স্মৃতি রক্ষা করিত। পার্শ্বিক ব্রাহ্মণধর্ম্মে সুশিক্ষিত ছিলেন, তিনি অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিন বৎসরে সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ করেন। পার্শ্বিকের স্মৃতিকক্ষের নিকটস্থ একটি পুরাতন মন্দিরে বসুবন্ধু অর্হৎধর্ম্ম কোষ শাস্ত্র নামক গ্রন্থরচনা করেন। এই মন্দিরের দক্ষিণস্থ অন্য একটি মন্দিরে মনোহৃত বাস করিতেন

বিভাষা শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইনি নির্ব্বাণের পরবর্ত্তী সহস্র বৎসরের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হন। নির্ব্বাণের পরবর্ত্তী পাঁচশত বৎসর বৌদ্ধসাহিত্যে "শাস্ত্রযুগ" ও তৎপরবর্ত্তী সহস্র বৎসর "সূত্রযুগ" নামে কথিত। মনোহৃত সূত্রযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হিয়ঙ্গ থসঙ্গ ইঁহার একটি আখ্যায়িক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,— মনোহৃত বিক্রমাদিত্যের সভায় অন্যায় তর্কে পরাস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরবর্ত্তী সম্রাট শিলাদিত্যের সভায় মনোহৃতের শিষ্য বসুবন্ধু ব্রাহ্মণগণকে পরাস্ত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয় মতেরই পণ্ডিত ছিলেন। হিয়াঙ্গ ভারতবর্ষে উপনীত হইবার ষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে শিলাদিত্যের মৃত্যু হয়। চৈনিক ভ্রমণকারিদিগের মতে এই শিলাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার নামই— বিক্রমাদিত্য। হিয়াঙ্গ খৃষ্টীয় ৬০৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৬৬৮ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বর্ণনানুসারে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমাদিত্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

গান্ধারের প্রাচীন রাজধানীর নাম পুষ্কলাবতী বা পুষ্করাবতী;— সূর্য্য-বংশাবতংশ রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের পুত্র পুষ্কল বা পুষ্কর এই রাজ্য সংস্থাপন করার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পুষ্কলাবতী একসময়ে বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিচিত ছিল। কণিষ্কের শাসনসময়ে বসুমিত্র নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই নগরে অবস্থান করিয়া বিখ্যাত অভিধর্ম্মপ্রকরণপাদ নামক বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন। পুষ্কলাবতী বহু বিপ্লবের লীলাভূমি। একদা ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত থাকিয়া পরে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়স্থান হয়; তদবস্থায় সেকেন্দার শাহ পুষ্কলাবতী অবরোধ ও অধিকৃত করিয়া সঞ্জয় নামক ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন। হিয়ঙ্গের সময়ে এখানে পুনরায় বৌদ্ধমত তিরোহিত হইতেছিল! এখন ইহা মোগলমানের আবাসভূমি।

গান্ধার রাজ্যের ন্যায় তক্ষশিলাও বৌদ্ধ স।
তক্ষশিলা কপিশারাজ্যের করপ্রদ ছিল; পরে
বিমাতার কৌশলে অশোকপুত্র কুণাল এই স্থানে
পুনরায় কুণালের চক্ষুর উৎপাটনের জন্য তাঁহার বিমাতা রাজার আজ্ঞা

এক রাজাজ্ঞা প্রেরণ করেন। কুণাল রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ আজ্ঞা সর্ব্বথা শিরোধার্য্য বলিয়া অম্লানচিত্তে চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিতে দেন। যাহারা এই চক্রান্তে লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেই দণ্ডিত হইয়াছিল; অশোক এই অশ্রুতপূর্ব্ব পিতৃভক্তির স্মৃতিসম্মাদর রক্ষা করিবার জন্য এইস্থানে একটি "কুণাল চৈত্য" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফা হিয়ান তাহার উল্লেখ না করিলেও হিয়াঙ্গ এই আখ্যায়িকা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উপগুপ্ত।

—*—

ফা হিয়ান সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া বহুযোজন ভ্রমণের পর যমুনাতীরসংস্থিত মথুরা নগরে উপনীত হন। মথুরায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে পথিমধ্যে কোন স্থানে দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সিন্ধুতীর হইতে মথুরা পর্য্যন্ত সকল স্থানেই বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল।

মথুরা প্রাচীন শূরসেনক রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিচিত। পুরাকাল হইতে বহু তপস্বী মথুরায় তপস্যা করিতেন; বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পরও বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ মথুরায় তপস্যা করিতে নিরস্ত হন নাই। মথুরা বহু সাধকের পদধূলি প্রাপ্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে শারীপুত্র, মুদ্গল পুত্র, পূর্ণমৈত্রায়ানীপুত্র, উপালি, আনন্দ, রাহুল এবং মঞ্জুশ্রীর স্মৃতিসম্মাদর রক্ষার্থে মথুরায় স্তুপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অনুরাগী তাঁহারা শ

প্র ...ত্রের, যাঁহারা সূত্রানুর

পূ: ...নর মতাবলম্বী তাঁহা

... ভিক্ষুণীগণ আনন্দের ...

বৌদ্ধমতের সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর পক্ষেই মথুরা একটি পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল।

মথুরা সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্যে উপগুপ্তের সাধনক্ষেত্র বলিয়া সবিশেষ পরিচিত। উপগুপ্তের ইতিহাসের সহিত বৌদ্ধমতবিস্তারের ইতিহাস চির-সংযুক্ত, তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন; সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়া মথুরায় তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। উপগুপ্ত তরুণজীবনেই জিতেন্দ্রিয় যোগী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন এবং মহারাজ অশোকের আমন্ত্রণে পাটলিপুত্রে গমন করিয়া রাজার ধর্ম্মোপদেষ্টা হন। ইঁহারই মন্ত্রণাবলে অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে কৃতসংকল্প হন।

তিব্বৎ চীন ও যাপানের বৌদ্ধসাহিত্যে উপগুপ্তের নাম সুপরিচিত। শাক্যসিংহের নির্ব্বাণলাভের শতবর্ষপরে তাঁহার অভ্যুদয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত বৌদ্ধলেখক অশ্বঘোষ উপগুপ্তের যোগসাধনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধজগতে "অলক্ষণক বুদ্ধ" নামে পূজিত। ডাক্তার বিল বলেন,----- সিংহলে উপগুপ্তের নাম অজ্ঞাত। এ কথা ঠিক নহে। সিংহলের মহাবংশ নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসে যিনি মোগ্গলিপুত্ত নামে পরিচিত, তিনিই যে মুশলপুত্র সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, তাহা সম্প্রতি প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্মজগতে উপগুপ্তের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় নির্লিপ্ত সন্ন্যাসির সংখ্যা অধিক নহে। ইঁহার জীবনের সহিত দেশ বিদেশে বৌদ্ধমত প্রচারের ইতিহাস সংযুক্ত বলিয়া অশোকের ন্যায় উপগুপ্তেরও বিস্তৃত জীবনী সঙ্কলিত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মরাজ্যে শাস্ত্র ও সদুপদেশ অপেক্ষা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত অধিক উত্তেজনা আনিয়া থাকে। শাক্যসিংহের জীবনে ও কার্য্যে এমন তন্ময়ত্ব ছিল যে, যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহাকেই সে দিব্যভাব স্পর্শ করিত। মহানির্ব্বাণের পর কিয়ৎকাল শাক্যসিংহের সমসাময়িক শিষ্যবর্গ ধর্ম্মজগতে জীবনগত সাধু-দৃষ্টান্ত দ্বারা বৌদ্ধমত প্রচারিত করেন। তাঁহাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমত পুস্তকগত ধর্ম্মোপদেশে পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু উপগুপ্তের দৃষ্টান্ত বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে পুনরায় নববল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। এই জন্য তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধরূপে পূজিত। বঙ্গসাহিত্যসেবকগণের মধ্যে সুকবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপগুপ্তের স্মৃতিসমাদরবর্দ্ধনার্থ একটি কবিতায় তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে কঠোর সন্ন্যাস ও যোগসাধনের অভাব ছিল না। সে সকল যোগী লোকালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অরণ্যবাস অবলম্বন করিতেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন শূদ্রাদির পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার ছিল না। সংস্কৃত ভিন্ন সচরাচর কথিত ভাষায় ধর্ম্মালোচনার রীতি ছিল না। তাঁহাতে জনসাধারণ সাধুসজ্জন হইতে পৃথক্ হইয়া সমাজের ভিন্নস্তরে স্থানলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধমতের বিশেষত্ব এই যে,— শাক্যসিংহ ভারতবর্ষের এই সকল পূর্ব্বসংস্কার বিদূরিত করিয়া স্ত্রী শূদ্র সকলের পক্ষেই সন্ন্যাস ও ধর্ম্মালোচনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন; সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে কথোপকথনের প্রচলিত ভাষায় উপদেশ বিতরণ ও গ্রন্থরচনার ব্যবস্থা করিয়া সকলের পক্ষেই ধর্ম্মালোচনায় হস্তক্ষেপ করিবার সুবিধা করিয়া দেন;— তাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যে সর্ব্বত্র বৌদ্ধমত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণগণ আপন প্রাধান্য রক্ষার্থ বৌদ্ধগণকে চোর ভণ্ড প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিয়াও বৌদ্ধমতের প্রবল প্রবাহের গতিরোধ করিতে পারেন না। শূদ্র উপগুপ্ত বৌদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলে, সেবাবৃত্তি ও সংসারধর্ম্ম লইয়াই জীবনবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন। তিনি বৌদ্ধাবির্ভাবের পর জন্মগ্রহণ করায় সমগ্র বৌদ্ধজগতে জগদ্গুরুর ন্যায় পূজালাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৌদ্ধমত যেন চিরকদ্ধ পর্ব্বতগুহার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া নির্ঝরস্রোত উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল,— সে স্রোত যত প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল, ততই দেশের পর দেশ প্লাবিত হইয়া গেল। উপগুপ্ত আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে জন্মগত প্রাধান্য খর্ব্বীভূত হইয়া জীবনগত পুণ্যপ্রভার সমাদর সংস্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধমত প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের নরপতিকে লোকরক্ষার্থ রাজধর্ম্মের কঠোরকর্ত্তব্যপালনের জন্য শূদ্রসন্ন্যাসীর মুণ্ডচ্ছেদ করিতে হইত; বৌদ্ধমত প্রবর্ত্তিত হইবার পর ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত সম্রাট অশোক মথুরার শূদ্র সন্ন্যাসীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা ও সম্বর্দ্ধনার সহিত রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই নবধর্ম্ম তখন পর্য্যন্তও সংকীর্ণতায়

সীমাবদ্ধ হয় নাই;—তখনও শতশাস্ত্রবিজড়িত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানের তুলনায় জীবনগত সদাচারই ধর্ম্মাচরণের প্রকৃত পন্থা বলিয়া পরিচিত ছিল।

উপগুপ্ত যোগমার্গের পথপ্রদর্শক বলিয়া বৌদ্ধসাহিত্যে সুপরিচিত। বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ তাঁহাকে অদ্বিতীয় গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া নববল প্রাপ্ত হন। উপগুপ্তের ধর্ম্মবলের সহিত অশোকের রাজশক্তি সম্মিলিত হইবার পর হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের বহুবিস্তৃতির সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মসাধনে ভারতবর্ষনিবাসী সকলজাতির তুল্য অধিকার স্বীকৃত হইত না; সুতরাং সে ধর্ম্ম ভারতবর্ষের বাহিরে অশিক্ষিত হূন শক যবন কিরাতাদির মধ্যে প্রচার করিবার প্রয়োজন বা প্রলোভন ছিল না। শাক্যসিংহের নবধর্ম্ম কাহাকেও হীন বলিয়া মনে করিত না; বরং লোকহিতকামনা ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং স্বদেশে এবং বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই ব্যাকুলতা বৌদ্ধপ্রচারকবর্গের জীবনের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে অসাধ্য সাধনেও উত্তেজিত করিয়াছিল। তাঁহারা মরুগিরি সাগর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পরিত্রাণের সুসমাচার বিতরণ করিবার জন্য দ্বীপে দ্বীপে দেশে দেশে ধাবিত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম্মই সর্ব্ব প্রথম প্রচারের ধর্ম্ম; সে ধর্ম্মের প্রচারকবর্গের মধ্যে উপগুপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তেজক শক্তি।

উপগুপ্তের উৎসাহে ও উত্তেজনায় বৌদ্ধমত বহুবিস্তৃত হইবার সময়ে বহুসংখ্যক বর্ব্বরজাতির মধ্যে সভ্যতাবিস্তারের সূত্রপাত হয়। মানব-সমাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে উপগুপ্তের প্রভাব এখনও লিখিত বা স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ কিরূপে ক্রমশঃ মধ্যএসিয়াকে সমুন্নত করিয়াছিল, মধ্যএসিয়া কিরূপে ইস্‌লামকে সুশিক্ষিত করিয়াছিল, এবং ইস্‌লাম কিরূপে ইউরোপকে জ্ঞানদান করিয়া সভ্যতাসোপানে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিয়াছিল,—তাহার ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইলে ভারতীয় বৌদ্ধমতের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইবে; এবং তাহার মূলশক্তির আলোচনা করিবার সময়ে শাক্যসিংহের নামের সঙ্গে উপগুপ্তের নামও সম্মিলিত করিতে হইবে।

ফা হিয়ান, হিয়ন্ থ্‌সঙ্গ প্রভৃতি বিদেশের তীর্থযাত্রিগণ এই মহাপুরুষের আরাধনা করিবার জন্য মথুরায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। ফা হিয়ানের সময়ে

মথুরায় যমুনার উভয়তীরে বিংশতি বৌদ্ধসংঘারামে তিন সহস্র পুরোহিত বাস করিতেন; হিয়ঙ্গের সময়ে তথায় পাঁচটি দেবমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফা হিয়ান যখন মথুরায় উপনীত হন, তৎকালে মথুরার নিকটবর্ত্তী মরুভূমির পশ্চিমে সকল স্থানেই বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল;— সে সকল জনপদের রাজারাও বৌদ্ধমতের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিতেন। এই স্থান হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত সমতল ক্ষেত্র, জনসাধারণ পরমসুখে কালাতিপাত করিত। ফা হিয়ান স্বচক্ষে তাহাদের যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে বলিয়াছেন,— "লোকের অবস্থা স্বচ্ছল। কোনরূপ রাজকর নাই। যাহারা ভূমিকর্ষণ করে তাহাদিগকেই কেবল শস্যের অংশ রাজভাণ্ডারে প্রদান করিতে হয়। রাজা কোনরূপ শারীরিক দণ্ডদান করেন না; কেবল পুনঃ পুনঃ রাজবিদ্রোহী হইলে দক্ষিণহস্ত ছেদন করিয়া থাকেন। সমস্ত দেশে লোকে জীবহিংসা ও সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছে; চণ্ডাল ভিন্ন আর কেহ লশুনাদি আহার করে না। বাজারে মদের দোকান দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কাহারও ভূমিহরণ করিবার সম্ভাবনা নাই— খোদিত লিপি দ্বারা তাহা নির্দ্দিষ্ট ও বংশানুক্রমে সম্মানপ্রাপ্ত হইতেছে।"

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে জীবহিংসা ও সুরাপান প্রচলিত ছিল;— শাস্ত্রে তাহার নিন্দা ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকিলেও লোকসমাজে তাহা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধমত প্রচলিত হইবার পর জীবহিংসা ও সুরাপান নিবারিত হইয়া যায়। যাহারা খৃষ্টীয়ান সুসভ্যসমাজের সুরাপান নিবারণের জন্য অক্লান্ত অধ্যবসায়ে প্রচারকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত ইউরোপ ও আমেরিকাকে সুরাত্যাগে সম্মত করিতে পারে নাই। যে ধর্ম্মমত ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তৃত দেশ হইতে সেকালে জীবহিংসা ও সুরাপান নির্ব্বাসিত করিয়া জনসাধারণের রোগ দারিদ্র্য গৃহকলহ ও জঘন্যজীবনের পরিবর্ত্তে সুখ শান্তি ও পুণ্যকীর্ত্তি আনয়ন করিয়াছিল, সে ধর্ম্মের প্রচারকবর্গের জয়ঘোষণা করিতে কাহার না আনন্দ হয়?

ফা হিয়ান যখন এই দেশে পদার্পণ করেন, তখন চন্দ্রগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া

বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিহারের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়,— সন্ন্যাসিগণ বিহারে বাস করিবার সময়ে শয্যা আসন, অশন বসনের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতেন। যোগাভ্যাস, শাস্ত্রাভ্যাস, ধর্ম্মালোচনা, উপদেশ দান— ইহাই তাঁহাদের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ধর্ম্মাচার্য্যবর্গের পরিচর্য্যার জন্য রাজা প্রজা সকলেই বিহারের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করায়, একদল সংসারাসক্তিশূন্য পুণ্যপ্রয়াসী সন্ন্যাসী দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বঙ্গদর্শনের পুনর্জ্জন্ম।

যখন ভাল লাগে না, তখন কিছুই ভাল লাগে না! বসন্তের ফুল, গ্রীষ্মের ফল, শরতের জ্যোৎস্না, হেমন্তের শিশির,— শিশুর হাসি, যুবতীর অভিমান, বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য,— ইহলোকের সুখ, পরলোকের সুখস্বপ্ন,— যখন ভাল লাগে না, তখন ইহার কিছুই ভাল লাগে না!

তখন পরকে ভুলাইবার জন্য, আপনাকে বঞ্চনা করিবার জন্য, প্রিয়জনকে অপ্রিয় সত্য হইতে দূরে রাখিবার জন্য চিঠি পত্রে, কথা বার্ত্তায়, উৎসবে আনন্দে এক ঝুড়ি মিথ্যা কৈফিয়ৎ কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়! এরূপ অবস্থায় মানুষ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়ে,— কিন্তু দশজনে তাহা বুঝিয়া দেখিতে চাহে না!

যে পাইবে, সে পাওনা গণ্ডা এই দণ্ডেই চুকাইয়া লইতে চায়; যে পাইবার আশা রাখে, সে পাইবার দাবি এই দণ্ডেই পাকা করিয়া লইতে চায়; যে কিছুই পাইবার দাবি রাখে না, সে রাস্তা জুড়িয়া বসিয়া থাকে—

যদি কিছু পায়! এ দিকে, যে দিবে সে বেচারার তখন হয়ত কিছুই ভাল লাগিতেছে না;— বরফজলও কেমন দুর্গন্ধ এবং গরম; রাজভোগও কেমন তিক্ত এবং বিরস; দুগ্ধফেণনিভমৃদুকোমলশয্যা কেমন কণ্টকময়- কঠিন!

যখন কিছুই ভাললাগে না, তখন আপনাকেও আপনার নিকট ভাল লাগে না; মনে হয়, আমি বুঝি সচল যন্ত্রবিশেষ;— দিন নাই, রাত্রি নাই, শীত নাই গ্রীষ্ম নাই, বাল্য নাই যৌবন নাই, সময় নাই অসময় নাই, আজীবন কেবল ঘড়ির কাঁটার মত টক্ টক্ ঠক্ ঠক্— ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই চিরাভ্যস্ত চক্রপথেই ঘুরিয়া মরিতেছি! সেই প্রভাতে গাত্রোত্থান, সেই মধ্যাহ্নে পান ভোজন, সেই দীর্ঘ দিনমান গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে কার্য্যভারবহন, সেই দিনান্তে গৃহাগমন ও শয্যাপ্রান্তে নিশান্ত পর্য্যন্ত বিনিদ্রনয়নে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন;— দিনের পর দিন সেই পুরাতন পথ, পুরাতন কার্য্যপদ্ধতি, পুরাতন অভিজ্ঞতা, পুরাতন আশানৈরাশ্যবিজড়িত পুরাতন বিড়ম্বনা!!

যাহাকে এইরূপে কায়ক্লেশে দুই হাতে ঠেলিয়া জীবনের দিনগুলি কোনরূপে বিদায় করিয়া দিতে হয়, তাহার কাছে কোন কিছু পাইবার প্রত্যাশা সমধিক বিড়ম্বনা! এমন জীবনে পদ্য ভাল লাগে না, এমন জীবনে গদ্যও ভাল লাগে না। সাহিত্য ও শিল্প ত সৌন্দর্য্য লইয়াই গঠিত? যাহার ভাল লাগে না, তাহার কাছে সৌন্দর্য্য নিতান্তই নিষ্ফল;— সে সাহিত্যের শোভা, শিল্পের গৌরব অনুভব করিতে অক্ষম। সাহিত্য তাহার নিকট অক্ষর সমষ্টির উচ্চস্তূপ, শিল্প কেবল দ্রব্যসমষ্টির বিরাটব্যূহ!

যাহার জীবন এইরূপে বহিয়া গিয়াছে, তাহার রোগের ঔষধ নাই;— সে একেবারে হাতের বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহাকে বুঝাইয়া পারা যায় না, শাসন করিয়া পারা যায় না, ভয় দেখাইয়াও পারা যায় না! সে যে ক্রমশঃ উৎসন্নদশায় নিমগ্ন হইতেছে— জানিয়া শুনিয়াও তাহার প্রতিকার করিবার উপায় নাই!

বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনে এই ভাব স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে! বাঙ্গালী কাজের বাহির হইয়া একেবারে হাতের বাহির হইয়া গিয়াছে;— একেবারে বহিয়া গিয়াছে, অথচ নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া এক ঝুড়ি কৈফিয়ৎ রচনা করিয়া তাহাই কোলে করিয়া বসিয়া আছে তর্কবাগীশ-

দিগের সঙ্গে তর্কে পারিয়া উঠিবে না; তাহারা প্রত্যেক কার্য্যেরই অনেকগুলি কারণ দেখাইয়া দিবে। তাহারা দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে,---- পিতামহের মাসিক পঞ্চাশ টাকায় চলিত, পৌত্র বাবুর পাঁচশতেও চলে না! যাঁহাকে পুত্রকলত্রভারনিপীড়িতস্কন্ধে এক বোঝা না নামাইতে আর একটি বোঝা কাঁধে তুলিয়া লইতে হয়, সে দেশের কথা, দশের কথা, শিল্পের কথা, সাহিত্যের কথা ভাবিবার সময় পাইবে কখন? তাই তাহার কিছুই ভাল লাগে না!

অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিও,---- তাঁহাদের কিছুই ভাল লাগে না! যাঁহারা কুবেরসন্তান, তাঁহাদেরও ভাল লাগে না। রজনীতে নিদ্রার পরিবর্ত্তে জাগরণ, সুতরাং রজনী ভাল লাগে না। দিবসে কর্ম্মের পরিবর্ত্তে নিদ্রা, সুতরাং দিবসও ভাল লাগে না। বিশ্রামের সময়েও অমিতাচার, সুতরাং পান ভোজনে সুখ নাই; কর্ম্মের সময়ে আলস্য, সুতরাং ক্ষুৎপিপাসার প্রাচর্য্য নাই।

দেশের দিকে চাহিবার অবসর নাই, কারণ---- দেশ ভাল লাগে না! ছি! সেই সংকীর্ণ পথ, সেই পথপার্শ্ববর্ত্তী স্বচ্ছন্দবনজাত তৃণগুল্মলতার আবর্জ্জনা, সেই খাল বিল, সেই পচা জল, পচা গন্ধ--- সেই দুঃখীর জীর্ণ কুটীর, সেই পীড়িতের আর্ত্তনাদ, সেই ভিখারীর ভিক্ষাভাণ্ড, সেই পল্লী-জীবনের সহস্রবিড়ম্বনা,--- সে কি আর উন্নোজ্জ্বল বিংশশতাব্দীতে ভাল লাগে? তাই পল্লীনিবাসী কুবেরসন্তানগণ এখন কলিকাতাপ্রবাসী হইয়াছেন! শীতে কিষ্কিন্ধ্যায়, গ্রীষ্মে গন্ধমাদনে লম্ফ ঝম্প! তথাপি অতি সংগোপনে শুনাইও---- শুনিতে পাইবে---- ইহাও ভাল লাগে না! সাহেবী পোষাক, সাহেবী খানা, সাহেবী আদব কায়দার মধ্যেও নাকি কি এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখ আছে! আজ বল, কাল থিয়েটার, পরশ্ব পার্টি,---- আজ লাটগার্ডেনের চাঁদা, কাল তাঁহার পত্নীর চাঁদা, পরশ্ব তাঁহাদিগের চাপরাসী-বর্গের বক্শিশ;--- আজ উইল্সনের বিল, কাল কেল্নারের বিল, পরশ্ব ছোট আদালতের উকীলের চিঠি! ইহাতে আর সহর ভাল লাগিবে কেমন করিয়া?

যাহারা নগরবাসী কর্ম্মঠ লোক; তাঁহাদের কথা না বলিলেও চলিত।

তাঁহাদের সময় নিতান্তই অল্প;—যাহা কিছু সময়, তাহা অর্থোপার্জ্জনে বা সেই চেষ্টায় ফুরাইয়া যায়। অবসরটুকু গৃহিনীর কাছে বন্ধকী তমঃশুকে বাঁধা পড়িয়া আছে। সুতরাং সময় কোথায়? দেশের কে বাঁচিল, আর কে মরিল,—তাহারও সন্ধান লইবার সময় হয় না! তথাপি অতি সংগোপনে শুধাইও—শুনিতে পাইবে—আপিসের খাটুনি আর গৃহিনীর বকুনী তাহাদিগকেও নিতান্ত নিরেট করিয়া তুলিয়াছে! যে আকণ্ঠনিমগ্ন, আত্মরক্ষাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে,—তাই কর্ম্মঠ লোকে আত্মরক্ষণ করিতেই সদাব্যগ্র, দেশের কথা দশের কথা ভাবিবার সময় নাই, সময় থাকিলেও—ভাল লাগে না!

যাহারা পল্লীনিবাসী, তাহারা ত প্রায় ষোল আনাই নিরক্ষর। দুবেলা দুমুঠা আহার, আহা! তাহাও সকল বৎসরে ঘটিয়া উঠে না! অশন বসনের টানাটানি, প্লীহা মড়কের টানাটানি, জমিদার মহাজনের টানাটানি,—জীবন ও মৃত্যুর সহস্র টানাটানিতে পড়িয়া তাহাদের কাছে কোন কিছুই ভাল লাগে না।

কাহারও কিছু ভাল লাগে না বলিয়া, বাঙ্গালীর ছোট বড় পণ্ডিত মূর্খ ধনী দরিদ্র—কেহই দেশের কথা দশের কথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় না; সকলেই আপনার কথা ও আপনার কাজ লইয়াই সদাব্যস্ত! যাহারা দেশের দোহাই দিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া মরিতেছে, তাহারা আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরেট! পদ্যে গদ্যে উপন্যাসে নাটকে—মাসিকে সাপ্তাহিকে—সভায় বন্ধুজনসমীপে—সকল স্থানে ও সকল কাজে দেশের জন্য হায় হায় করে; কিন্তু তাহার মধ্যে দেশের প্রকৃত হিতকথা অতি অল্প! ইহারা একটা সভার কাজ চালাইতে পারে না, একই উদ্দেশ্যে পাড়ায় পাড়ায় সভা করে; ইহারা একখানি কাগজে সাহিত্যসেবা করিতে পারে না, গলিতে গলিতে কাগজ বাহির করিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরে; ইহারা এক পাতা কেতাবে বক্তব্য বুঝাইতে পারে না, *রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করে—তথাপি বলিবার কথা বলা হয় না! ইহাদের সভা, সংবাদপত্র বা পুস্তক দেশের জন্য নয়, দশের জন্যও নয়; কি জন্য যে এই পণ্ডশ্রম—তাহাও মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

যাহারা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সময়ে সর্ব্বদা একতাবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিত এবং পথে ঘাটে চীৎকার করিয়া গাহিত—"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ,"—তাহারাই বড় হইয়া এবং বুড়া হইয়া দলাদলি পাকাইতেছে! কি লইয়া দলাদলি, কে তাহার মীমাংসা করিয়া দিবে? তথাপি সাহিত্যে দলাদলি, শিল্পে দলাদলি, সভায় দলাদলি, ধর্ম্মে দলাদলি অধর্ম্মেও দলাদলি। তাহার কোলাহলে সভা ও সংবাদপত্র গালাগালিতে ভরিয়া গেল, তথাপি চেতনা হইল না!

এ দেশের লোকে কাহার জন্য সাহিত্যশ্রমে অগ্রসর হইতেছে? কাহার জন্য নূতন মাসিক নূতন সাপ্তাহিক জন্মগ্রহণ করিতেছে,—কাহার জন্যই বা পুরাতন মৃত পত্রগুলি পুনরুজ্জীবিত হইবার আশায় প্রেতলোক হইতে কাতর ক্রন্দন সমুত্থিত করিতেছে! কে লিখিবে, কাহার জন্য লিখিবে, কি লিখিবে,—ভাবিলে নিরাশায় হৃদয় মন ভরিয়া যায়!

বঙ্গদর্শন মরিয়াছিল। মরিয়া বাঁচিয়াছিল। সুযোগ্য সম্পাদক ছিল, সুবিজ্ঞ লেখকদল ছিল,—দেশে এত কাগজ ছিল না, কাগজে এত দোকানদারী ছিল না;—তথাপি যে দেশে বঙ্গদর্শন মরিল, আর্য্যদর্শন টিকিল না, বান্ধব বিলুপ্ত হইয়া গেল, জ্ঞানাঙ্কুর অঙ্কুরে পচিল,—সেই দেশে আবার বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয় কেন? যে নামের সঙ্গে একটা গৌরবের স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে, তাহাকে আবার ধূলা মাটির মধ্যে টানিয়া আনিবার আয়োজন কেন?

যদি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কোন পত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা বাঁচে না। তাহার লেখক এবং গ্রাহক উভয়েরই অভাব হয়। যদি বিশেষ ভাবে মাসিক পত্রকে সমুন্নত করিবার শুভসঙ্কল্প লইয়া কোন পত্র জন্মগ্রহণ করে; লোকে তাহা চাহে না। লেখকেরা পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া লিখিবে, পাঠকেরা পড়িয়া পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া উঠিবে—এমন লেখক এবং এমন পাঠক বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজে অধিক দেখা যায় না। লেখক অবলীলাক্রমে লিখিবেন,—গল্প পদ্য উপন্যাস সমালোচনা নীতি ধর্ম্ম ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান গণিত ফলিত-জ্যোতিষ—যাহা চাও লেখনীমুখে তাহাই অনর্গল নির্গত হইবে; এমন

লেখক বাঙ্গালাসাহিত্যেই অধিক। সকলেই লেখক, সুতরাং পাঠকের সংখ্যা অল্প।

সাহিত্যের বাজারে সস্তার প্রভাব, উপহারের প্রভাব,— বিজ্ঞাপনের প্রভাব, মেকির প্রভাব। লোকে বোধ হয় তাহাই চায়। লোকে যাহা চায় তাহাই ত দিতে হইবে,— নচেৎ দোকান পাট বন্ধ করিতে হইবে। লোকে যাহা চায় তাহার বিস্তর আমদানী হইতেছে, আবার একখানা নূতন দোকান কেন?

লোকে যাহা চায়, আমরা তাহা বেচিব না। তেমন মাল দোকানে কেন, মালগুদামেও রাখিব না। লোকে যাহা চায় না, চাহিলেও পায় না, পাইলেও বুঝে না,— আমরা এবার সেইরূপ দুর্লভ বস্তুরই সরবরাহ করিব। দোকান উঠিয়া যায় যাউক, দোকানের মাথায় বজ্রপাত হউক,—দোকানদারী উঠাইবার জন্যই ত আমাদের এই নূতন ধরণের দোকানদারী!

ভাষাকে সমুন্নত করিব, সাহিত্যকে শক্তিশালী করিব, ভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া সুকৌশলে জাতীয়জীবনকে ধীরে ধীরে সমুন্নত করিয়া তুলিব— ইহা বলিতে এবং শুনিতে বেশ কথকতার মত শুনায়; দশজনে হাঁ করিয়া শুনিয়া শুনিয়া হাততালি দিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করে। কিন্তু কে শুনাইবে, আর কাহাকে শুনাইবে— এই দুইটি বিষয়েই যাহা কিছু সন্দেহ!

ভাষা বাঁধন ছিঁড়িয়া ছুটিয়াছে;— এখন কথায় ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত না হইয়া ক্রমশঃ অস্পষ্ট ছায়ার মত মিলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সাহিত্য শক্তিবাহুল্যে অসীম সাহসে সাহসী হইয়া উঠিয়াছে— ভাল করিয়া দন্তোদ্গম হইবার পূর্ব্বেই সে লোহার কলায় চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছে। লেখক পাঠক সমালোচক সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে মণিকাঞ্চন-যোগ উপস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এ সময়ে একখানা নিরপেক্ষ নির্ভীক সুলিখিত সুপরিচালিত মাসিক পত্রের প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলিবার জন্য এই দীর্ঘ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছি না। কিরূপ পত্রের প্রয়োজন, কিরূপ লেখার প্রয়োজন, কিরূপ লেখকের প্রয়োজন,— সে সকল কথা দশ দিন পরে ভাবিয়া দেখিব, এখন ত একখানা যাহা কিছু বাহির করিয়া ফেলি। এইরূপ ভাবেই অধিকাংশ

কাগজ বাহির থাকে— এইরূপ ভাবেই অধিকাংশ কাগজ ধ্বংসমুখে অগ্রসর হয়।

বাঙ্গালা কাগজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভাব লেখকের। যাঁহারা লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায় সকল কাগজেই লিখিতে বাধ্য হন। কবিকে কবিতার যোগান দিতে হয়, উপন্যাসলেখককে ছোট গল্প রচনার তাড়নায় সর্ব্বদাই কেতাব হস্তে গল্প সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়, ইতিহাস-লেখককে পুরাতন কেতাবের দোকানে হাঁটাহাঁটি করিয়া মরিতে হয়, আর সম্পাদক মহাশয়কে চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠাইয়া প্রবন্ধের জন্য চিরায়মান লেখকবর্গকে মধ্যে মধ্যে উত্যক্ত করিয়া বেড়াইতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কাগজ বাহির করিবার খাতিরে জানিয়া শুনিয়া নিতান্ত নিরূপায় হইয়া কত অযোগ্য প্রবন্ধে পত্রকলেবর পূর্ণ করিতে হয়! শেষে আর যোগ্যাযোগ্যের বিচারে উৎসাহ থাকে না— সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য নদীর স্রোতের মত সরল ও সহজ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ যাহা হাতে আসে, তাহাই ছাপা হইয়া যায়!

বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবিত হইয়া সুযোগ্য সম্পাদকের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে— পুরাতন সেবকদলও পুরাতন জীর্ণপতাকাতলে সমবেত হইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। তৎ সঙ্গে নূতন অনেকগুলি সখের সৈনিকও সঙ্ঘীভূত হইতেছেন। তবে আর নিরুৎসাহের কথা কেন?

আগুণের দাহিকাশক্তি কে অবিশ্বাস করে? কিন্তু খড়ের আগুণ অধিকক্ষণ জ্বলে না। বাঙ্গালীর উৎসাহ এবং উদ্যম বড়ই ক্ষণস্থায়ী। অধ্যবসায়ের সঙ্গে দীর্ঘকালে যাহা সম্পন্ন করিতে হয়, বাঙ্গালী তাহাতে অগ্রসর হইতে জানে না। ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে সুদীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনা বহুজনসাপেক্ষ। তাই ভয় হয়— বঙ্গদর্শন মরিয়া বাঁচিয়াছিল, বাঁচিয়া আবার মরিতে না হয়!

কিন্তু এক হিসাবে বঙ্গদর্শনের পুনর্জ্জন্মে বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গল হইবার ভরসা পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদর্শন এককালে বাঙ্গালী সাহিত্যসেবকদলের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়স্থল বলিয়া পরিচিত ছিল। সে কাল চলিয়া গিয়াছে। এখন যে কাল পড়িয়াছে, ইহাতে যদি বঙ্গদর্শন পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে অক্ষম হয়, তবে বর্ত্তমান সাহিত্যসেবকদিগের অক্ষমতা বিশদরূপে ফুটিয়া

হইবে। সেই ভয়ে—লাজে লজ্জায়—নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যদি দশজনে মিলিয়া কাগজখানিকে সমুন্নত করিবার চেষ্টা করেন, তবে সেই সঙ্গে বাঙ্গালা মাসিক পত্রও সমুন্নত হইবে। এ আশা কি নিতান্ত দুরাশা?

সেনাদলের নিকট পূর্ব্ববিজয়গৌরববিজড়িত জীর্ণ পতাকা যেমন উৎসাহবর্দ্ধনের অমোঘ কৌশল, সাহিত্যসেবকদলের নিকটেও বঙ্গদর্শনের পতাকা সেইরূপ হইতে পারে। এক দিন ইহার পত্রে পত্রে তৎসাময়িক লেখকবর্গের প্রতিভা বিকশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল; আজ আবার প্রকাশকগণ বর্ত্তমান লেখকবর্গের সম্মুখে সেই প্রসিদ্ধ পত্রিকার পত্রগুলি উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন,—এবার তাহাতে যদি কেবল হিজি বিজি লতা পাতা লিখিত হয়, তবে বর্ত্তমান লেখকদলের কলঙ্কের অবধি থাকিবে না। সুতরাং আমরা বঙ্গদর্শনকে পুরাতন বন্ধুর ন্যায় পরম সমাদরে অভ্যার্থনা করিয়া লইতেছি। যাঁহারা লিখিবেন, তাঁহারা যদি একটু আলস্য ত্যাগ করেন, যাঁহারা সম্পাদনকার্য্যে লিপ্ত হইবেন তাঁহারা যদি একটু প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় প্রদান করেন, যাঁহারা অর্থব্যয় করিয়া উৎসাহ প্রদান করিবেন তাঁহারা যদি একটু মুক্তহস্ত হন;—তবে বঙ্গদর্শনের পুনর্জ্জন্ম নিতান্ত নিষ্ফল না হইতেও পারে। কিন্তু প্রথম সংখ্যার নমুনা আশাপ্রদ হয় নাই। প্রবন্ধনির্ব্বাচনে কৌশল, প্রবন্ধ রচনায় উদ্দেশ্য, প্রবন্ধ মুদ্রাঙ্কনে যত্ন বা প্রবন্ধ প্রচারে লিপিকারের চেষ্টার বিশেষ কোন পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। দশখানার মত একখানা হইয়াছে, যেমন হইতেছে তাহাই—কেবল গ্রন্থ সমালোচনায় পুরাতন ওস্তাদি দলের তাঙ্গাগলার ধমক চমকের ত্রুটি নাই! প্রথম সংখ্যা দেখিয়া মতামত প্রকাশ করা অনুচিত বলিয়া আমরা কোন প্রবন্ধেরই সমালোচনা করিলাম না; কেবল সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি—তিনি যখন কর্ণধারের আসনে উপবেশন করিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন যেন ভরাভাদরের পূরা গাঙ্গে তরঙ্গতাড়িত চন্দ্রমার প্রতিবিম্বশোভায় আত্মহারা হইয়া গীত গাহিতে গাহিতে কর্ণ হইতে ক্ষুদ্র বাহবুগল মুহূর্ত্তের জন্যও স্থানান্তরিত না করেন।

"যদি ডুবি, নহি একা—ডুবিব সকলে।"

ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী।

(বিল চলন)

উত্তর বঙ্গের সুবিস্তৃত বিল চলনের নাম বঙ্গবাসী: অনেকেই অবগত আছেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহার যে পরিমাণ আয়তন ছিল, এক্ষণে তাহার চতুর্থাংশও দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অশীতিপর প্রাচীনগণ ইহার যে সীমা নির্দ্দেশ করেন, তাহাও সহস্রাধিকবর্গ মাইল ব্যাপী। এই বিল সম্প্রতি রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী। কালক্রমে ইহার বহুলাংশ বৃক্ষরাজিসুশোভিত জনকোলাহলপূর্ণ উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইলেও বর্ষাকালে এখনও দুইশত বর্গমাইলের অধিক স্থান জলপূর্ণ হইয়া থাকে। দূর দূরান্তরের মৃগয়াপ্রিয় দেশীয় ও ইউরোপীয়গণ ইহার ধান্য শৈবালাদিলুব্ধ জলচর ও উভচর পক্ষিকুল নির্ম্মূল করিবার মানসে প্রতিবর্ষেই শুভাগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা, ইহার গর্ভে ভীষণ বন্য মহিষ ও বরাহের সুখনিবাস দেখিয়াছি। তৎকালে পক্ষিকুলের ইয়ত্তাই ছিল না। শীতকালে আরাকাণ-নিবাসী মগগণ বেত্রবন্ধনীনিবদ্ধ কাষ্ঠময় তরণী যোগে মৎস্যরঙ্গ ও বককুল নির্ম্মূল করিয়া বহুসংখ্যক চিত্রিত কোমল পালক লইয়া চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগিজ ব্যবসায়ীগণের নিকট বিক্রয় করিত। তাঁহারা এতদ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। মগগণ বহুযোজনদূর হইতে সুভীষণ মেঘনা, কীর্ত্তিনাশাদি খরস্রোতা নদী উত্তীর্ণ হইয়া বহুপক্ষিসমাকুল বিল চলনে আসিয়াই নিরস্ত হইত না; রাজসাহী জেলার পূর্ব্ব ও উত্তর অঞ্চলের চন্দ্রাবতী, মজ্জদহ, বিলকুমারী, বিল সেইতি প্রভৃতি আরও অনেক বিস্তৃত জলাভূমিতে বক ও মৎস্যরঙ্গ বধ করিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারিত না। বাল্যকালে আমরা তাহাদিগের অব্যর্থ তীরের সন্ধান দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম, আবার তাহাদিগের অদ্ভুত জলযান দেখিয়া অপেক্ষাকৃত অদৃষ্টপূর্ব্ব আমোদ

লাভ করিতাম। নৌকাগুলিতে লৌহের সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। খান কত তক্তা সুদীর্ঘ সুচিক্কণ সুন্দি বেতের বন্ধনীনিবদ্ধ হইয়া নৌকাকারে পরিণত হইত। অল্প শুষ্ক পথ উত্তীর্ণ হইলেই নদীর সুবঙ্কিম বাঁকের ঘের এড়াইবার সময় মগ্‌গণ বেত্রের বন্ধন খুলিয়া কাষ্ঠখণ্ডগুলি মস্তকে বহন করিয়া পুনর্বার আবশ্যকমত নৌকার আকারে পরিণত করিত। আমরা সে সময়ে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না। তাহারা আরাকাণ হইতে আসিবার সময়ে সুদৃশ্য বেতের পেট্‌রা, পাটী ও মাদুর নানারূপ শিল্পদ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করিত। তদ্ভিন্ন নানা অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য গীতাদির দ্বারা এ দেশের কৌতূহলপ্রিয় ধনী দরিদ্রদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া পয়সা, তণ্ডুল ও ধান্য সংগ্রহ করিত। আমরা পল্লীগ্রামে তাহাদিগকেই প্রথমে চুরুট্ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। তাহাদের মস্তকের চূড়া-নিবদ্ধ-চিকুর চন্দন-কাষ্ঠ ও হস্তিদন্তের চিরুণী ও পক্ষীর পালকেই সজ্জিত, তাহার পার্শ্বে একখানি চিত্রিত রেশমি রুমাল। এক্ষণে কলিকাতা অঞ্চলে তাহাদের পালকের ভূষণ কথঞ্চিৎ দেখা যায়; কিন্তু পরিধানের লুঙ্গী ও কোট এবং মস্তক বেষ্টনী রেশমী রুমাল যথাবৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এদেশে তাহাদিগকে "মাছরাঙ্গা মাথা" কেহ বা "মগ" বলিত। সে সময়ে উত্তর বঙ্গের বহু দক্ষিণ দিয়া প্রবল পদ্মানদী বহমানা ছিল। রাজসাহীতে মহাগঙ্গা এবং তাহার শাখা বারাহী (বারাণ্ড) নারদ, বড়াল প্রভৃতি যে কয়টী স্রোতস্বতী ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সংশ্রব ছিল না। রাজসাহী অঞ্চলের মধ্য দিয়া আত্রেয়ী ও করতোয়া নদী বহমানা থাকিলেও তাহার জল তত বেগে ছিল না, কাজেই বিলগুলি প্রায় বারমাস বিস্তৃত জলময় থাকিত। এ দেশের ভড় (বাগড়ি) অঞ্চলে অনেক গ্রামে চৈত্র বৈশাখ মাসেও প্রচুর জল থাকায় নৌকা কিম্বা চাড়ি (মৃত্তিকার এক প্রকার বড় বড় গামলা) যোগে ভিন্ন এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে গতিবিধির উপায় ছিল না। বিগত ১২৪৫ সালের পূর্ব্বে পুঠিয়ার পূর্ব্বদিকে মুশা খাঁ নামক জনৈক মুসলমান ধার্ম্মিক, বিলের জল নির্গমনের জন্য একটি খাল কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই খালও মুশা-খাঁর নামেই অভিহিত ছিল। উহাই পরে [illegible] প্রবল বন্যা হইয়া বড়াল নদীর এক পার্শ্ব দিয়া মুশা

খাঁর খালের মধ্যে পদ্মার ঘোলা জলস্রোত প্রবেশ পূর্ব্বক—প্রবলবেগে বহিয়া নানা খাল দিয়া চন্দ্রাবতী প্রভৃতি বিল বালুকা পূর্ণ করিতে থাকে। সেই সময়ে মুশাখাঁ ভাঙ্গিয়া হোজা নদীতে বর্দ্ধিত হইয়া গদাই খাল প্রভৃতির যোগে সেই জল বেগে বিল চলনের পশ্চিমপার্শ্বে প্রবেশ লাভ করে। এক্ষণে হোজানদীর পূর্ব্বাংশকেই গদাই নদী বলিয়া থাকে। রাজসাহীর প্রাচীনগণ সেই পঁয়তাল্লিশের ভীষণ বন্যার প্রভাবের কথা সর্ব্বদাই আলোচনা করিতেন, পল্লীর কবিগণ তাহার নানা ছড়া প্রস্তুত করায় ভদ্রগৃহিণী হইতে রাখালগণ পর্য্যন্ত তাহা গান করিত বলিয়া সেই ভৈরবভাব বহুদিন কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

১২৪৫ সাল হইতে পদ্মার সহিত বিল চলনের যে সংযোগ ঘটিয়াছে, তাহার ফলেই এই অঞ্চলের সমস্ত বিলগুলি ভরাট হইয়াছে এবং বিলচলনের সেই ভীষণ ভাব তিরোহিত হইয়া তাহার বক্ষে বহুজনাকীর্ণ শত শত গ্রামের উৎপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে আর অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই অঞ্চলের নদী নালা বিল ঝিল গুলি যে জলশূন্য মরুতে পরিণত হইবে, তাহা অতি গণ্ডমূর্খেও অনুমান করিতেছে। কিন্তু জমিদারগণ, এই ঘটনাদ্বারা আপাতঃ বহুলাভবান হইয়াছেন বলিয়া দেশের সেই ভীষণ ভবিষ্যৎ মরুচিত্র দেখিয়াও দেখিতেছেন না!

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ প্রস্তাবিত বিলচলনকে বঙ্গোপসাগরের একটি পুরাতন খাল বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফলতঃ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গই প্রকৃত বঙ্গদেশ ছিল। বর্ত্তমান রামপুর বোয়ালিয়া নগরের দক্ষিণ মহানন্দানদী ও পূর্ব্বভাগে নারদ নদই বরেন্দ্রভূমির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমাংশ ছিল। তাহার পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মপুত্রের বর্ত্তমান শাখা (যমুনা) পর্য্যন্ত যে জলময় ভূমি ছিল, তাহা ও উক্ত অঞ্চলের দক্ষিণে ফরিদপুর যশোহর, বরিশাল এবং বাখরগঞ্জ জেলার প্রায় স্থান ব্যাপিয়া বঙ্গোপসাগর থাকা অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন।

ফলতঃ সহস্রাধিকবর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান উত্তর বঙ্গের সহিত দক্ষিণ বঙ্গের অন্তর্ব্বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য প্রকাণ্ড বিলচলনই সিংহদ্বার ছিল। তৎকাল হইতে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে জলপথে বাণিজ্য

দ্রব্যের আগম নির্গম ব্যতিত স্থলপথের সুবিধা ছিল না। তজ্জন্য সেই সিংহ-দ্বার বিলচলনে জলদস্যুর সমধিক প্রভাব ছিল। দস্যুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ বংশের প্রাধান্য ছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর বেণী-পৈঠার নায়ক বেণী রায় এবং চলন বিলের পার্শ্ববর্ত্তী কৈত নামক গ্রামের ভবাণী রায় নামক দস্যুদলপতির কথা কুলজ্ঞগ্রন্থে দেখা যায়। বেণী রায় পূর্ব্ব বঙ্গে এবং ভবাণী বিলচলনের মধ্যে দস্যুদলপতি ছিলেন। তাঁহাদিগের অধীনে ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্রকায়স্থ, হাড়ী ও চণ্ডালাদি বিস্তর বীর পুরুষ ছিল। কালক্রমে ভাতুড়িয়ার রাজা কংশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্মপরিগ্রহ করায় তাঁহার শাসনে ও প্রলোভনে এই অঞ্চলের বিস্তর নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু, মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করায় এবং হিন্দু রাজধানী গৌড়নগরের পতন হইলে অনেক বরেন্দ্রবাসী ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্মণ, বরেন্দ্র পরিত্যাগে বিলচলনের পূর্ব্বপারে এবং পূর্ব্ব বঙ্গ— বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে, ও পদ্মানদীর দক্ষিণ পারে বাস করিয়াছিলেন।

সামান্য অনুসন্ধান করিলেই চলনবিলের পার্শ্ববর্ত্তী সমৃদ্ধিশালী বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের দস্যুতাই ঋদ্ধির কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেকালে বঙ্গদেশে মহাভারত, বাল্মিকী রামায়ণের, কথকদিগের মুখে নানা বিকৃত আকারের ব্যাখ্যা হইত। তজ্জন্য সমাজে বাহুবলে অর্থার্জ্জন কতকটা ধর্ম্মানুগত বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করিতেন; তাহার পরে অসুরনাশিনী করাল-করবালধারিণী তান্ত্রিক শক্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। তখন উদ্রদস্যুদিগের মধ্যে রনরঙ্গিনী দেবী কালীমাতার উপাসনার, কৌলাচার পঞ্চ মকারের সাধনায় নৃশংস হিংসাবৃত্তিও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছিল। নরবলী ও দস্যুতাও তাহার জন্যই ধর্ম্মাঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সে কালের দস্যুদিগের কালীমাতার প্রীত্যর্থে শত শত নরহত্যায় অনুমাত্রও ক্লেশ হইত না। এখনও মুসলমান দস্যুগণও সেই হিন্দু প্রথানুসারে কালিকাসাধনান্তে দস্যুতায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ মদ্যপানে বৃত্তিবিশেষের উত্তেজনা এবং লজ্জা ভয় লোপ করাই এই সাধনার মূল উদ্দেশ্য। পূর্ব্বকালে বলপূর্ব্বক পরস্বাপহরণ ক্ষাত্রবৃত্তি বলিয়া বিশ্বাস থাকিলেও দরিদ্রের দারিদ্র্যনাশ, প্রবল কর্ত্তৃক উৎপীড়িতের আশ্রয় দান, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং দস্যুতায় অর্জ্জিত অর্থ ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা দস্যুদিগের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। এই সকল

ধর্ম্মকার্য্য, সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার জন্য অনেক ধার্ম্মিক গৃহস্থও দস্যুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন। দস্যুতার জন্য কেহ সমাজে দণ্ডিত কিংবা অপমানিত হইতেন না। বরং কোনও কোনও দস্যুপতি সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বেণী রায় স্বনামে বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে এক পৈঠা সৃষ্টি দ্বারা কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সুসঙ্গের রাজপরিবার এই বেণী পৈঠার নায়ক শ্রোত্রিয়।

প্রস্তাবিত সময়ে বঙ্গদেশ দিল্লীর বাদসাহ কি বঙ্গের সুবাদারের নামে মাত্র অধীন ছিল। জমিদার ও দস্যুপতিগণই প্রকৃত পক্ষে সমাজের ও প্রজা সাধারণের নিয়ন্তা ছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য কেহ রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেন না। বাহুবলই প্রত্যেক পরিবারের রক্ষার উপায় ছিল বলিয়া ভদ্র ইতর সকল শ্রেণীর লোকেই বাল্যকাল হইতে ডঁড়, কুস্তি, লাঠী, তরবারি ও তীর প্রভৃতি চালন শিক্ষা করিতেন। বরং বিদ্যাশিক্ষার গৌরব তত ছিল না। পুরোহিত ও গুরু ব্যবসায়িগণ শাস্ত্রাভ্যাস এবং নগর উপনগরবাসিগণ চাকুরীর প্রত্যাশায় রাজভাষা শিক্ষা করিতেন ভিন্ন, পল্লীবাসী ভূম্যধিকারী হইতে কৃষক পর্য্যন্ত বাহুবল অর্জ্জনে মনোযোগী ছিলেন। হায়! অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও গ্রামে গ্রামে কুস্তির আখড়া, লাঠী খেলা শিক্ষার আসর ছিল। যুবকগণ জুতা কিংবা জামা ব্যবহার করিতেন না; ইজার পেণ্টুলান স্পর্শ করিতেন না। প্রায় সকলেই, কটিবন্ধনে বস্ত্র পরিধান, দীর্ঘ বাবরী ধারণ এবং বংশযষ্টি প্রহরণধারী ছিলেন। অতি দরিদ্রের গৃহেও দুদশ খানি লাঠী, বল্লম, সড়কি, ও ঢাল শোভা পাইত। দেশের রাজা যে প্রজাদিগের ধন ও পরিবার রক্ষা করে তাহা কেহ মনেও ধারণা করিত কি না সন্দেহ। তবে জমিদার ও দস্যুদলপতির প্রতি প্রায় সকলেই সম্মান প্রদর্শন করিতেন। গ্রাম্য প্রাচীনগণ পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ ছিলেন, কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যেমন যুবকদিগের সম্মিলন ও বল পরীক্ষার উপায় ছিল, সেইরূপ প্রাচীন ও বিজ্ঞগণ সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক মীমাংসার জন্য প্রত্যহ স্থান বিশেষে একত্র হইতেন। তাঁহারা নানা গল্প, সামাজিক মন্ত্রণা, দবা ও পাশা খেলাদিকার্য্যে সময়াতিবাহিত

করিতেন।

সে সময় সংবাদ পত্র না থাকিলেও, আগন্তুক ও পর্য্যটক পরম্পরায় মুখে মুখে বহুদূর দেশের সংবাদ প্রচারিত হইত। তবে হুজুক ও বাগাড়ম্বরে যে কল্পিত সংবাদ প্রচারিত না হইত এরূপ নহে। এখনকার সংবাদপত্রেও সময়ে সময়ে আষাঢ়ে গল্প ইউরোপ প্রভৃতি স্থানেও প্রকাশিত হয়। তবে সে সময়ে এতদ্দেশবাসিগণ অনেকেই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। বঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রভাব বর্ত্তমান কালাপেক্ষা অনেক অল্প ছিল বলিয়া দূর দূরান্তরের সংবাদ আদানপ্রদানে অনৃতের ভাগ অল্প থাকিত। ব্যভিচারী ও সমাজদ্রোহীর গুরুতর দণ্ড দিলেও, এমন কি এই শ্রেণীর দোষীকে হত্যা করিলেও, সমাজের নেতৃগন রুষ্ট হইতেন না। বরং সেইরূপ হত্যাকারীকে রাজশাসন হইতে অব্যাহতির জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা একপ্রাণতা অবলম্বন করিতেন। ঈর্ষা ও প্রতিযোগীতা সেকালে অন্য আকারে ছিল। এক দেশের কি এক গ্রামের অধিবাসী স্বদেশ কিংবা স্বগ্রামের কোনও কদাচার ধ্বংস কিংবা উন্নতির কার্য্য ও তদর্থে নিয়ম প্রচলন করিলে অন্য দেশ কি অন্য গ্রামবাসিগণ. দলবদ্ধরূপে স্বসমাজে ও স্বদেশে যাহাতে সেই দোষ লাঘব হয় কিংবা অপর স্থান অপেক্ষা স্বদেশের ও স্বগ্রামের অধিক উন্নতি হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সেই উপলক্ষে এক দেশ অথবা এক গ্রামের লোক অপর গ্রামের সামাজিক দোষ লইয়া আলোচনা করিতেন, এবং স্বদেশের গৌরব প্রকাশ দ্বারা ঈর্ষা প্রকাশ করিতেন। স্বগ্রামের কোনও দোষ গোপন জন্য, কোনও কলঙ্ক ক্ষালন নিমিত্ত বালক বৃদ্ধ বনিতা প্রাণপনে চেষ্টা করিতেন। এইরূপ একপ্রানতা সে কালের প্রশংসার বিষয় ছিল। সিঁদেল চুরীর বড়ই গুরুতর দণ্ড ছিল। কিন্তু চাকুরী করিতে গিয়া উৎকোচ গ্রহণ কিংবা মিথ্যা খরচ লিখিয়া মুনিবের টাকা চুরি করা সমাজে তত দোষাবহ ছিল না। নরহত্যাকারী দস্যু অপেক্ষা সিঁদেল চোর সমাজে ঘৃণিত ও দণ্ডার্হ ছিল। ব্যভিচারীকে সপরিবারে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত দণ্ড দিলেও, প্রশংসা ভিন্ন লোকে দোষী বিবেচনা করিত না, বরং আততায়ী ও দুষ্কার্য্যকারীর প্রাণদণ্ড কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। আহা! কি বাহুবীর্য্যের অর্জ্জিত ভাগ স্বীকার, কি গুরুতর ব্যক্তির আনুগত্যের কি নির্ম্মল আনন্দের

দিনই গিয়াছে। আর কি নিত্য অনাটন, নিত্য অসন্তোষ, নিত্য স্বগ্রাম, স্বসমাজ ও স্বপরিবারে দলাদলি ও ঘোর অশান্তির দিন আসিয়াছে!

সেকালে এক জনের কিছু অর্থ সঞ্চিত হইলেই জলশূন্য স্থানে জলাশয় খননের কিংবা পথ প্রস্তুত ও পয়ঃপ্রণালী প্রচলনের প্রতিযোগীতা উপস্থিত হইত। "রাম ২/০ দুইবিঘা জমার একটি পুষ্করিণী দিয়াছে, তুমি একটি ৪/০ চারি বিঘা ভূমিতে জলাশয় খনন কর। যদু পুষ্করিণীর তীরে একটি ঘাট বান্ধিয়াছে, তোমার পুষ্করিণীর ৪টি ঘাট এবং একটি শিবমন্দির প্রস্তুত কর।" স্বগ্রামের ও স্বদেশের লোক এইরূপ প্রতিযোগীতা, এইরূপ জেদ্ প্রকাশ করিতেন; আর ধনীও আহ্লাদের সহিত তাহাই শুনিতেন। অবশ্য ইহার অন্তঃপটে হিংসা বলুন আর ঈর্ষা বলুন এরূপ বৃত্তির প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু, এই হিংসা এবং এই ঈর্ষা যেন বঙ্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যের যশোধ্বংসের এই প্রতিযোগীতা যেন আমরা আবার দেখিতে পাই। দোষ ভিন্ন কেবল নির্ম্মলগুণলাভ জগতে দুর্লভ।

সে কালের গুণের কথা শত পৃষ্ঠায় লিখা যায়, আর একালের সভ্যতার চক্ষে সেকালের দোষের কথা ত শত শত পৃষ্ঠায়, উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু, তুলনা করিয়া বুঝিবার আর তদনুসারে কার্য্য করিবার এখন ক জন আছেন? সে কালে পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যতীত গ্রামের সাধারণ অধিবাসীরা লেখাপড়ার তত ধার ধারিতেন না। সকলে অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন, কথায় কথায় পত্র লেখা চলিত না, অতি গুরুতর বিষয়ও লোকের মুখে বলিয়া পাঠাইতেন, আর এখন সামান্য কথায় সামান্য লোকেও পত্র ও কার্ড লিখিয়া থাকেন। সেকাল অপেক্ষা একালে অভাব অধিক, সুতরাং প্রয়োজনও অধিক। সেকালে পরার্থে—ধর্ম্মার্থে প্রতিযোগীতা ছিল, একালে আপনার বিলাতি জুতা, পুত্রের দাসত্বকরী বিদ্যা উপার্জ্জন, গৃহিনীর অঙ্গ বিবাহ বাটীতে অহঙ্কার দেখানের জন্য অলঙ্কারের অভাবকে আমরা মহাকষ্টকর বিবেচনায় শরীরের রক্ত জল করিয়া শ্রম করিতেছি। হিংসা, ঈর্ষা, ও দলাদলিতে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতেছি। বাস্তবিক সুখ কোন্ কালে? একালে না সেকালে? তাহা পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন!

শ্রীগিরীশচন্দ্র লাহিড়ী।

প্রবাস-যাত্রী।

আজ,	যেতেছি বিদেশে, সুদূর প্রবাসে
অজানা ঘরে,
প্রাণ	উঠিছে গুমরি, তব কথা স্মরি
নয়ন ঝরে!
দুইদিন আজ চিনেছি তোমায়,
দুদিনেই ভাল বাসিয়াছি হায়!
এতই অজানা অচেনা বালায়
হৃদয় ভ'রে,—
ভাবি নাই কভু তাহা ত স্বপনে,
জানিনা ত হ'ল এরূপ কেমনে,
কে বাঁধিল মোরে দৃঢ় প্রেমডোরে
এমন ক'রে;
আমি;	বুঝিতে ত নারি, নয়নের বারি
শুধুই ঝরে!

আজ,	পড়ে সখি মনে—সেদিন দুজনে
বাঁধিনু পাশে,
আমি	দুরু দুরু হিয়া, দেখিনু চাহিয়া
কত কি আশে,
পড়ে মনে সেই আঁখির মিলন;
লাজমাখা সুধাসিঞ্চিত বচন,
সুমধুর সেই মদির চুম্বন
ফুলের বাসে,
স্নিগ্ধ সুকোমল হাত দুইখানি;

ঘুমঘোর আঁখি ঘুমঘোর বাণী,
সেই নিশিশেষে সুনীল আকাশে
চাঁদিমা হাসে;
আজ, পড়ে সবি মনে হৃদয় গগনে
সকলি ভাসে!

মোর ব্যথাময় হিয়া, তুমি জুড়াইয়া
দিয়েছ আসি;
তুমি নিবিড় আঁধার হৃদয়ে আমার
ফেলেছ নাশি!
নিবায়েছ তুমি দিয়া প্রেমজল
হৃদয়ে আমার দারুণ অনল;
ফেলে দেছ কোথা জানি না, সকল
দুঃখের রাশি;
অতীতের স্মৃতি অতীতের কথা,
অতীতের দুঃখ অতীতের ব্যথা,
গিয়াছি ভুলিয়া, শুধুই দেখিয়া
তোমার হাসি;
মোর নবীন এ প্রাণ করিয়াছ দান
তুমিই আসি।

হায়, যেতেছি চলিয়া, বুঝিবা ত্যজিয়া
জনম তরে,
আজ সারারাতি ধরি দেখি আঁখি ভরি
হৃদয়ে ধ'রে;
তুমি কহ কথা আমি শুধু শুনি,
তুমি রহ বসি, আমি শুধু চুমি,
তুমি হাস সখি, আমি শুধু দেখি—

হৃদয়ে ধরিয়া নয়নের জলে
স্নাত করি তোমা, পূজি প্রেমফুলে,
প্রাণ ভরি চুমি যাব সখি চ'লে
বিদেশে দূরে ;---
সেথা সব তোমা স্মরি দিবা বিভাবরী
জীবন ধ'রে।

তুমি আজ হাসি-মুখে, মাথা রাখি বুকে,
বিদায় দিয়ো ;
অই প্রেমে ঢল ঢল নয়নে সজল
বারেক চে'য়ো।
ভ্রমিব একেলা সুদূরে বিজনে,
দিবে কি কখন তব-হৃদি কোণে
একরতি স্থান অভাগা হেন জনে,
বলিয়া দিয়ো ;
তাহ'লে, যদিও রহিব সুদূরে,
তব ছবি সদা জাগিবে অন্তরে ;
নিশীথে স্বপনে মিলিব দুজনে
দেখিয়া নি'য়ো ;
এবে তুমি হাসিমুখে মাথা রাখি বুকে
বিদায় দিয়ো।

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ দেব।

সঙ্গিনী।*

(সমালোচনা।)

সঙ্গিনী একখানি মহিলালিখিত কবিতাগ্রন্থ,— গোলাপী কাগজে অলক্তকাক্ষরে মুদ্রিত, শাটীসুচিক্কণ বিচিত্র বস্ত্রাবরণে বিমণ্ডিত, বাহ্যবেশে কুসুমলোভনীয়!

লতা সহকারকে আশ্রয় করিবার জন্য, আগ্রহে বাহুবিস্তার করে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। মহিলাগণও সাহিত্যচর্চ্চায় হস্তক্ষেপ করিবার সময়ে পুরুষ-লেখকবর্গের আদর্শকে আশ্রয় করিতে চাহেন। ইহাও বোধ হয় প্রকৃতির নিয়ম। সেই নিয়মের অধীন হইতে গিয়া সঙ্গিনীরচয়িত্রী কিয়ৎপরিমাণে পুরুষোচিত রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গালা গীতিকাব্যের অধিকাংশই যে ছাঁচে ঢালা, ‘সঙ্গিনীর’ সর্ব্বাঙ্গেও তাহারই দাগ,—তজ্জন্য ভাবে ভাষায় বিষয়বিন্যাসে ‘সঙ্গিনী’ কিছু প্রগল্‌ভা—মুখরা—চঞ্চলাঞ্চলাম্বরা!

“সাজায়ে সোনার থালে চন্দন লেপিত মালে,
আনিয়াছি শত শতদল;
ধর ধর হৃদিজাত ফল!”

এই মঙ্গলাচরণ কিছু প্রখর, কিছু মুখর। ‘ধর ধর’ এই যুগ্মপদের ব্যবহার কিছু চঞ্চলতাজ্ঞাপক। তথাপি, সোনার থালে সজ্জীকৃত চন্দনানুলিপ্ত এই অভিনব শতদলমালা স্পর্শে সুকোমল, ঘ্রাণে মধুগন্ধময়, শোভায় সুন্দর। শোভা ও সদ্‌গন্ধ একটু তীব্র; তাহা কর্ম্মক্লান্ত দরিদ্র বঙ্গীয় পাঠকের পক্ষে হয়ত একটু ভীতিজনক। ‘সঙ্গিনীর’ কথা বাঁশী কিন্তু বীণার ঝঙ্কার,—কেবল তাহার মধ্যে গৃহধর্ম্ম-সাধন-ব্যাকুলা বঙ্গকুলবালার আত্মত্যাগ ও পরসেবার আভাস অল্প; ‘সঙ্গিনীর’ বেশবাস সুবর্ণজড়িত,— কিন্তু গোময়-

---

* শ্রীমতী ভুবনমোহিনী সুন্দরী ঘোষ প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

সুবক্ষিত বঙ্গগৃহাঙ্গণ বুঝি ধূলা মাটির ভয় দেখাইয়া তাহাকে দূরে রাখিয়া নমস্কার করিতে বলিতেছে! ভাবে ভঙ্গীতে, হাসিতে অশ্রুতে কথায় নীরবতায় কেমন এক উৎকৃষ্টি;— কি যেন নাই, কি যেন চাই, কি যেন পাই নাই এইরূপ অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি ও অশান্তি দেদীপ্যমান! এরূপ 'সঙ্গিনীকে'* একটু সভয়ে একটু সসঙ্কোচে সম্ভাষণ করিতে হয়; ভয়— পাছে তৈলাক্ত করস্পর্শে পত্রলেখা কলঙ্কিত হয়; সঙ্কোচ— পাছে কি বলিতে কি বলিয়া বিড়ম্বিত হইতে হয়!

এখনকার গীতিকাব্যের কবি জীবনপ্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই হঠাৎ বাগ্দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করেন; ভারতী তাঁহার কাছে নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া নানা কথায় বরাভয় বিতরণ করিয়া থাকেন। সে সংবাদ পাঠকসমাজে বিতরণ করিবার জন্য কবি কিছুমাত্র কৃপণতা প্রদর্শন করেন না। সঙ্গিনীরচয়িত্রীও এই প্রথার মান্যরক্ষা করিয়াছেন।

"প্রথম যে দিন হেসে
মানসে পশিলে এসে,
তদবধি গন্ধ পুষ্পে শ্রীচরণ সেবি।"

এইরূপে দেবীর আবির্ভাব ও পূজার আরম্ভ হইয়াছে। বরলাভে বিলম্ব থাকিলেও, আশার আভাস পাওয়া গিয়াছে!—

"মনে হয়, কবিতার সাথে
দেখা হবে কোন্ মধুরাতে;
হয়ত মনের ভুলে বীণাটি দেবেন তুলে,
হেসে হেসে এ দাসীর হাতে,
কোন এক উন্মদ নিশাতে।"

সে শুভরাত্রির প্রতীক্ষা না করিয়া রচয়িত্রী আপাততঃ কণ্ঠসঙ্গীত লইয়াই উপনীত হইয়াছেন। সে সঙ্গীত শুনাইবার জন্য 'সঙ্গিনী' শ্রান্ত পথিককে ডাকিয়া গাহিতেছেন:—

"আমারো হৃদয় বনে
ঝাড়ে ঝোপে কোণে কোণে
ফোটে কত ফুল;

দেখিতে পায় নি কেহ,
আঁধার গহন গেহ,
দিক্ হয় ভুল।"

ইহাতে এক অব্যক্ত মধুর বিষাদব্যাকুল কোমল কাতরতা থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। যথা;—

"নিত্য ফুটে নিত্য ঝরে,
কেহ দেখিল না, ওরে,
জন্ম মৃত্যু হায়;
আধ ফোটা, অফুটন্ত,
বিকাশের নাহি অন্ত
উষায় সন্ধ্যায়।
আশার আলোকে দিয়া
কে রাখিবে জিয়াইয়া
আমার কলিকা;
কেহ কি আদরে তুলে
এই ছোট ছোট ফুলে
গাঁথিবে মালিকা!"

এই সুর সকল সুরের উপর ঝঙ্কার দিয়া বাজিতেছে; ইহাতে নৈরাশ্যের সঙ্গে ব্যাকুলতা মিশিয়া পাঠকচিত্তে মোহ বিস্তার করে; স্বতই আহা! আহা! বলিয়া সমবেদনায় হৃদয়ভার লাঘব করিতে ইচ্ছা হয়।

সঙ্গিনী-রচয়িত্রী যে সাহিত্যশক্তি লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু সে শক্তি এখনও আত্মপরিচয় প্রদান করিবার প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না,— তাই প্রচলিত গীতিকাব্যের সুমার্জ্জিত রাজ-পথকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যসমাজের দ্বারস্থ হইয়াছে। এই পথ সুমার্জ্জিত হইলেও বহুজনাকীর্ণ,— কলহকোলাহলময়! কত দিকে কত সুরে কত গান ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে নবীনার ক্ষীণকণ্ঠ ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। প্রকৃতির প্রতি, ঋতুসঙ্গীত, ধূলি, প্রয়াণস্বপ্ন, চাঁদের আত্মকাহিনী,

সঙ্গিনী প্রভৃতি কবিতা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যশক্তির পরিচয়স্থল।

আজ কাল ব্যক্ত অপেক্ষা অব্যক্ত সৌন্দর্য্যের আদর অধিক। কিছু বুঝিব, কিছু বুঝিব না, কিছু শুনিয়া বুঝিব, কিছু ভাবিয়া বুঝিব, কিছু বা বুঝিবার জন্য আজীবন ভাবিয়া মরিব— তাহাকেই বলি বর্ত্তমান বঙ্গীয় গীতিকাব্য। ইহা সঙ্গীতের মত মধুময়, চিত্রের মত সুশোভন; কিন্তু সঙ্গীতের কথা যেমন স্বরতরঙ্গে ডুবিয়া যায়, চিত্রের রেখাবিন্যাস যেমন বর্ণবাহুল্যে ঢাকিয়া পড়ে, ইহাও সেইরূপ। বেশ শুনিলাম, বেশ দেখিলাম,— এই পর্য্যন্তই বলা যায়; কি শুনিলাম বা কি দেখিলাম তাহা খুঁটি নাটি করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। ইহার জন্য কবিকে তিরস্কার করা চলে না। অবগুণ্ঠন শোভা বর্দ্ধন করে;— ব্যক্ত অপেক্ষা অব্যক্ত না জানি কত সুন্দর, এইরূপ এক অনির্ব্বচনীয় আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া দেয়। বাঙ্গালা গীতিকবিতাও অবগুণ্ঠনবতী হইয়া এইরূপ মনোমোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহা সুন্দর, কিন্তু কেন সুন্দর তাহা বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। সেকালের কবিতায় এরূপ অবগুণ্ঠনের আতিশয্য ছিল না; কবি যাহা বলিতেন, পাঠক তাহা বুঝিতেন। সুতরাং সেকালের কবিতা পড়িয়াই কবিতার অর্থ বোধ ঘটিত। এখন কবিতা পড়িবার পূর্ব্বে কবিকে জানিতে হয়, বুঝিতে হয়; তাঁহার মত বিশ্বাস ও আচরণ কিরূপ, পারিলে তাহারও কিছু কিছু সন্ধান লইতে হয়,— নচেৎ সকল কথা, সকল ভাব ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

"হাসি খুসি বিসর্জ্জিয়া সেজেছ যোগিনী,
শ্মশানে বেঁধেছ ঘর শ্মশানবাসিনী।
শুভ্রবাসে আবরিয়া স্বচ্ছ তনুখানি
মানবীর বেশে তুমি কমলা কল্যাণী।"

এই কবিতার কথাগুলি কেমন মধুমাখা, অথচ কেমন বিষাদব্যঞ্জক! তাহার বর্ণনা? শোন,—

"ভূষণ বিহীন ওই তনুর ভঙ্গিমা,
দিব্য আভরণা ও যে লাবণ্য প্রতিমা!
বিষাদের স্নিগ্ধদীপ্ত আলোকে আলোকে

কি প্রশান্ত শুভ্রজ্যোতি সর্ব্বাঙ্গে ঝলকে !
নির্ম্মল দর্পণসম ম্লান রূপখানি
স্বর্গের উদার ছবি দেখাইছে আনি !
অশ্রুণব আছে শুধু চির প্রিয়সাথী,
চারুনেত্রে মুকুতার মালা দেয় গাঁথি।
মলিন অধরে ওই খিন্ন ক্ষীণ হাসি
আধো আলো, আধ ছায়া, বড় ভালবাসি।
মেঘে রৌদ্রে মিশা যেন ইন্দ্র ধনু আলো,
সংসারের দূরে থাকি ধরাবাসে ভালো।
দ্বীপপুঞ্জে ভরা যথা গভীর সাগর,
দুঃখের কঙ্কর ভরা কোমল অন্তর।
সুখহীন আশাহীন নিষ্ফল জীবন
ডাকি নিবে কবে আসি মধুর মরণ ?
তিলে তিলে জ্বলি নিত্য নিষ্প্রভ, নিমেষে,
আলয় আঁধার করি নিবিবে নিঃশেষে।"

একটি কবিতার আদ্যন্ত উদ্ধৃত হইল। রচনা কেমন সরল, পদবিন্যাসে কেমন কৌশল, ভাববিকাশে কেমন অবগুণ্ঠনের ব্যবহার,— ভাবে তাহার কেমন আলো ও ছায়া, হাসি অশ্রু, শান্তি অশান্তি, সুখ দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ ! কিন্তু এ কাহার বর্ণনা ? ইহাকে হেঁয়ালি বলিতে পার, কারণ একটু না ভাবিয়া বুঝিবার উপায় নাই, ভাবিয়াও সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। কবি এই কবিতায় 'বিধবার' বর্ণনা করিয়াছেন। বিধবার সহমরণ নিবারণ সময়ে ও বিধবার বিবাহ প্রচলন চেষ্টায় বিধবার দুঃখ যন্ত্রণার যে সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গসাহিত্যে এক চিরস্থায়ী ভাব রাখিয়া গিয়াছে। তদনুসারে স্থির হইয়া গিয়াছে— বিধবার জীবন সুখহীন, আশাহীন, নিতান্তই নিষ্ফল ! দেহের সুখই সুখ এবং দেহের দ্বারা সুখ ভোগের আশাই আশা ; যাহার সে আশায় ছাই পড়িয়াছে, তাহার জীবন নিষ্ফল ভিন্ন আর কি বলিব ? ইহাই এ জগতের কথা। ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং, কবিরও যে তাহাই মত ও বিশ্বাস.

কাব্যস্থলে তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই দৈহিক ব্যাপারগুলি কাব্য হইতে দূরে বাস করিত; যাঁহারা কাব্যমধ্যে ইহাদিগকে স্থান দিতেন, তাঁহাদের কাব্য রুচিদোষে অশ্লীল বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইত। আজ কাল আবার বাতাস ফিরিয়াছে,— আবার দেহের শোভা; দেহের সুখ, দেহের সম্ভোগ কাব্যরসকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ভাষা একটু অবগুণ্ঠনবতী; তাই রক্ষা; নচেৎ ভাব ও ভাবগত শিক্ষা সমান। যথা;—

"থর থর করতলে করতল রাখি
বেদনাবিধুর প্রাণ রাখিলাম ঢাকি।
বক্ষে বক্ষ মিলাইল যবে দুটি হাত,
শিরায় শিরায় যেন এল ঝঞ্ঝাবাত!
অবশেষে বিদায়ের চকিত চুম্বন
এঁকে গেছে একখানি মরণ স্মরণী!"

অপিচ

"সে ক্ষীণ শাড়ী ভেদে ফুটিল উচ্ছ্বাস
যৌবন প্লাবন:
শত আশা বুকে কাঁপে; পরাণ ব্যাকুলি যাপে
নিঃসঙ্গ শয়ন?

কেবল কথা সাজাইয়া গুছাইয়া, ভদ্রতার অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া, সেই পুরাতন দেহের সম্ভোগাত্মক সৌন্দর্য্যকে কাব্যসৌন্দর্য্যের সার করিবার প্রবৃত্তি আজিকার কাব্যে প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহা বাঙ্গালীর প্রশান্ত অন্তঃপুরেও উপনীত হইয়াছে!

কবির অধিকাংশ উপমা উৎপ্রেক্ষাদি এখন এই সম্ভোগাত্মক দৈহিক সৌন্দর্য্যকেই অবলম্বন করিতেছে। সঙ্গিনীরচয়িত্রীর দুহিতৃরূপা কবিতা নির্ঝরিণীর ন্যায় উদ্ভূত হইয়া সুদূরে ধাবিত হইতেছে— এই ভাব বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছেন:—

"কবে এই পাষাণের বক্ষ ভেদ করি
জনমিল প্রীতিময়ী দুহিতা সুন্দরী?
আজ দেখিতেছি তারে রূপ পথ দিয়া

বাহিরিয়াছে অভিসারে গৃহ তেয়াগিয়া !"

ইহার সৌন্দর্য্য কোথায়, তাহা একটু ভাসিয়া লইতে হয় এবং ভাবিয়া ভাবিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াও, সে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। অভিসারিকা দুহিতা— গুপ্তপথে বহির্গতা— তাহার মধ্যে এতকাল ঘৃণা, অভিমান, কলঙ্ক ও বিলাপের ভাব নিহিত ছিল। এখন তাহাই সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু ইহার জন্য পথপ্রদর্শকেরাই নিন্দাই--- তাঁহাদের অক্লান্ত সাধনার বাঙ্গালা গীতিকাব্যে কিরূপ রুচি ও কিরূপ সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়া কতদূর পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, মহিলা-লিখিত কাব্যগ্রন্থের এই সকল কবিতাই তাহার নিদর্শন।

বর্ত্তমান গীতিকাব্যের যাহা দোষ তাহাই প্রধান গুণ---- যাহা গুণ তাহাই মুখ্য দোষ। ব্যক্ত অপেক্ষা অব্যক্ত সৌন্দর্য্য বর্ণনার আসক্তি এই দোষ গুণের কারণ। ভাব প্রকাশের অক্ষমতা অথবা ভাব ধারণা করিবার অস্পষ্টতা হইতেই এই দোষের উৎপত্তি হয়। কবি যাহাকে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখেন, পাঠককেও অগত্যা তাহা ধোঁয়া ধোঁয়া দেখিতে হয়। কিন্তু যেখানে কবি স্পষ্ট দেখিলেও, পাঠক দেখিতে পারেন না. সেখানে ভাব প্রকাশের অক্ষমতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। একটু চেষ্টা করিলে এই দোষ পরিহার করা যায়।

"মুকুল বসন্ত সনে
মনে নাই. আন মনে
করিলি কৈশোরলীলা
হেসে সমাপন !"

এখানে "মুকুল-বসন্ত" একটি ব্যাসকূট ! মুকুল যেমন বসন্তের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, অন্যমনস্কের মত, কৈশোরলীলা সমাপ্ত করিয়া মুকুলের শোভার সঙ্গে বসন্তের সুখ টুকু হারাইয়া, নিদাঘতাপদগ্ধ ফলরূপে পরিণত হয়, অবোধ হিয়ারও সেই দশা ঘটিয়াছে। ইহাই যদি ঐ কবিতার ভাবার্থ হয়, তবে তাহা বাক্যে পরিস্ফুট হয় নাই !

উজ্জ্বল আঁধার, উন্মত্ত শান্তি, নির্দ্দয় করুণা প্রভৃতি শব্দসম্পাৎ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইলে, বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয়।

""যে নীরব হাহাকার শুনিবারে পারি"

এরূপ শব্দবিন্যাসে গদ্যজীবিরা গলদ্‌ঘর্ম্ম হন !

একালের অবগুণ্ঠন যেমন নানা কারণে সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে, সঙ্গিনীতে 'অবগুণ্ঠন' শব্দও সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া 'গুণ্ঠন' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'দিকে দিকে' কবিতার অনুরোধে 'দিশি দিশি' সংস্কৃত মূর্ত্তি ধারণ করিতে বাধ্য হয়; সঙ্গিনীতে প্রয়োজনানুরোধে তাহা 'দিশি দিশি' মূর্ত্তি ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'নিশা' বাঙ্গালায় আসিয়া 'নিশি' রূপে চলিয়া গিয়াছে, অশ্রুজল, খাসিয়া, স্বজন ইত্যাদিও চলিতেছে। কিন্তু সঙ্গিনীতে ব্যবহৃত 'তনুর তনিমা' 'নীল নীলিমা' প্রভৃতি শব্দ সুষমায় সহিত এই সকল অপপ্রয়োগের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না;--- এরূপ শব্দের ব্যবহার পরিহার করাই ভাল।

'সঙ্গিনী' প্রথম প্রকাশিত কবিতাপুস্তক; কালে কবিলেখনী আরও মধুবর্ষণ করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। সেই আশায়, সঙ্গিনীর অঙ্গাহরণের বিলাতী তীব্রগন্ধ দূর করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নিসর্গ-সুন্দরীকে অতিরিক্ত অলঙ্কারভারে নিপীড়িতা করিলে, সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় না; স্বাভাবিক কাব্যসৌন্দর্য্য বিস্তার-ক্ষমতাকেও অতিরিক্ত ভাব ভঙ্গিতে ভারাক্রান্ত করিলে ভাল দেখায় না। সঙ্গিনীরচয়িত্রী সহজে সরলভাবে বিনা আড়ম্বরে সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, তাহা জাতিকুসুম-বাসিত প্রাবারকের ন্যায় কবিতার অঙ্গরাগ মধুগন্ধে আচ্ছাদিত করিয়া দিত;--- শ্রোতা ও সম্পাদক পাঠকচিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িত! তাহার তুলনায় কৃত্রিম জাঁক জমক কত অকিঞ্চিৎকর! ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম; ভাল ক্রমে আরও ভাল হউক বলিয়াই এত বিস্তৃত সমালোচনা লিখিলাম।

---*---

মোগল সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মোগল জাতির এক কোরাণ ব্যতীত আর কোন অনুশাসন লিপিবদ্ধ ছিল না। দেশাচার ও যুক্তিমূলক কতকগুলি বিধান আবহমান কাল হইতে প্রচলিত ছিল; এসকল বিধানের কথাও লিপিবদ্ধ ছিল। এতদ্বারাও কোন কোন বিষয়ের মীমাংসা করা হইত। পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া প্রকৃতি পুঞ্জের নিকট এই সকল বিধানের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন।

পল্লীগ্রামে কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েত তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। কিন্তু প্রত্যেক পরগণায় একজন করিয়া কাজি নিযুক্ত থাকিতেন, এই সকল বিচারক এক এক সময়ে উৎকোচগ্রাহী ছিলেন। বিচারার্য্য সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক স্বরূপ কাজিদিগকে দিতে হইত। কাজিগণ বিচারকার্য্য তাড়াতাড়ি নিষ্পন্ন করিতেন। কোন কাজি বিচার বিভ্রাট ঘটাইলে ও তাহা বাদশাহের কর্ণগোচর হইলে তিনি অভিযুক্ত কাজির গুরুদণ্ড বিধান করিতেন। এজন্য তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিতে সাহসী হইতেন না। কোন বিবাদে উভয় পক্ষই হিন্দু অথবা মোসলমান হইলে কাজিগণ অপক্ষপাতে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, কদাচিৎ কোথায়ও বিচার বিভ্রাট ঘটাইতেন। কিন্তু এক পক্ষ হিন্দু ও অপর পক্ষ মোসলমান হইলে অনেক সময় হাস্যকর বিচারাভিনয় হইত। কেবল মাত্র ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকেই কাজি নিযুক্ত করিবার জন্য কোরাণের কঠোর অনুশাসন আছে। এজন্য অনেকস্থলে ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিগণই কাজির পদে নিযুক্ত হইতেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কাজির বিচারকালে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার জন্য মুফ্‌তি নামক এক শ্রেণীর শাস্ত্রবিদ্‌গণ নিযুক্ত থাকিতেন। সমাজ, ধর্ম্ম, ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে হিন্দুদিগকে কাজির বিচারের অধীন হইতে হইত না। তাহার মীমাংসার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত

কাজিগণ কোন অপরাধের নিমিত্ত প্রাণ দণ্ডের বিধান করিলে তাহা সুবাদারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইত। এইরূপ অনুমতি না পাইলে সে আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার নিয়ম ছিল না। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন বিচারে অর্থী প্রত্যর্থী সন্তুষ্ট না হইলে তাহারা উদ্ধতন আদালতে অভিযোগ করিতে পারিত। এখানে স্বয়ং সুবাদার বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজধানীতে তিনজন উচ্চপদস্থ বিচারকর্ত্তা প্রজাগণের অভিযোগের মীমাংসা করিতেন। তাঁহারা আসেসরগনের সাহায্যে আপীল অথবা প্রথম অভিযোগের বিচারকার্য্য সমাধা করিতেন।

এতদ্ব্যতীত মোগলবাদশাহ স্বয়ং প্রকৃতিপুঞ্জের অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতেন। অভিযোগের বিষয়টী সরল ও স্পষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচার করা হইত। কিন্তু বিষয়টী জটিল হইলে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ ও শাস্ত্রবেত্তার অভিমত জিজ্ঞাসা করিবার নিয়ম ছিল। বিচার্য্য বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সময় সময় মীমাংসার ভার রাজধানীর আদালতের প্রতিও অর্পণ করা হইত। কিন্তু এস্থলেও অর্থী প্রত্যর্থী আদালতের মীমাংসার বিরুদ্ধে বাদসাহের নিকট পুনর্ব্বিচার প্রার্থী হইতে পারিত। বাদশাহ প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাত্র মিত্র সহ দরবারে উপবেশন করিতেন। তৎকালে একজন নগণ্য প্রজাও আবেদন পত্র হস্তে উপনীত হইলে বাদশাহ তাহাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ পূর্ব্বক যথা যোগ্য ব্যবস্থা করিতেন।

প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ দ্বারা মন্ত্রি সমাজ গঠিত ছিল। কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা কালে মন্ত্রিগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার নিয়ম ছিল। মন্ত্রিগণ আপনাদের অভিমত জ্ঞাপন করিতেন, তাহার পর বাদশাহ ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেন অথবা মনঃপূত না হইলে তাঁহাদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের ইচ্ছামত আদেশ প্রচার করিতেন। তিনি সময়ে সময়ে নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসু হইতেন। কোন প্রদেশ সংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার আবশ্যক হইলে তদ্দেশ সম্বন্ধীয় সবিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হইত।

মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের নাম উজীর। সমস্ত রাজকীয় ঘোষণাপত্র ও আদেশলিপি তাঁহার সহিমোহর যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত। উজীরের স্বাক্ষরের পর বাদশাহ তাহাতে স্বীয় চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেন। উজীরের দপ্তর নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য পরিচালনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রী নিয়োজিত ছিলেন। উজীরের হস্তে আয় ব্যয় বিভাগের সমস্ত ভার অর্পিত ছিল। তিনি প্রাদেশিক রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। পদগৌরবে ও ক্ষমতায় উজীরের নিম্নেই মিরবক্সী। মিরবক্সী সমর বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। ইনি উজীরের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিলেন না। প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। আবুল ফজল আকবরের সময়ের তালিকা প্রদান করিয়া প্রত্যেক বিভাগের নির্দ্দিষ্ট কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে রাজকোষ ও টাকশালের বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সুগন্ধ, ফল, ও পুষ্প সংক্রান্ত কার্য্যালয়, রন্ধনশালা, এবং কুকুর থানা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিভাগের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই বিবরণ পাঠ করিলে নয়ন সমক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ও বৈভবের চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং তাহাতে সহজেই পাঠকের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে।

মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ সমূহের শাসন সংরক্ষণ জন্য এক এক জন করিয়া শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের উপাধি সুবাদার বা নিজাম ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার প্রবল ক্ষমতা ও দুর্দ্দান্ত প্রতাপ ছিল। যদিচ শাসনকর্ত্তাগণ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বাদশাহী নিয়মাধীন ছিলেন তথাপি তাঁহারা অনেক সময়ে এক এক জন স্বেচ্ছাচারী শাসন-কর্ত্তার ন্যায় কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বৎসরান্তে নিরূপিত রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ করিলে বাদশাহ তাঁহাদের কৃত কার্য্যে আর হস্তক্ষেপ করিতেন না। বাদশাহের অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা ভূসম্পত্তি দান করিতে পারিতেন। সৈনিক ও অন্যান্য বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীর বহাল বরতরফ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কেবল মাত্র সেনকর্দ্ধ

কর্ম্মচারী বাদশাহী নিয়োগক্রমে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ পদচ্যুত করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও কোন কোন কর্ম্মচারী অন্যায়াচারণ করিলে বাদশাহের আদেশ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সস্‌পেণ্ড করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক-শাসন কর্ত্তৃবর্গের ছিল। বিচার কর্ত্তাগণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তৃবর্গই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। দেশের শান্তি ও রাজশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য শাসন কর্ত্তাগণ সর্ব্বতো-ভাবে দায়ী ছিলেন। দেশের রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ানগণের উপর অর্পিত ছিল। রাজস্ব সংগ্রহ কার্য্যে শাসনকর্ত্তাগণের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু কেহ রাজস্ব সংগ্রহকালে প্রতিবন্ধকাচরণ করিলে তাহা নিবারণ করিবার জন্য তাহারাই দায়ী ছিলেন। শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যয় দেওয়ানের মারফৎ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে গ্রহণ করিতে হইত।

পদগৌরবে ও ক্ষমতায় সুবাদারের নিম্নেই দেওয়ান। দেওয়ানগণ বাদশাহী নিয়োগক্রমে নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহারা কোন বিষয়ে সুবাদারী কর্ত্তৃত্বাধীন ছিলেন না। রাজস্ব, শুল্ক, ও অন্যান্য রাজকর সংগ্রহের ভার দেওয়ানগণের হস্তে অর্পিত ছিল। দেওয়ানগণ দেশের শাসনসংক্রান্ত নিরূপিত ব্যয় সুবাদারের নির্দ্দেশ মত প্রদান করিয়া উদ্বর্ত্ত রাজস্ব রাজ-ধানীতে প্রেরণ করিতেন। দেশের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের জন্য বাদশাহী সরকারে দেওয়ানগণই দায়ী থাকিতেন। এজন্য সুবাদারগণ কোন প্রকার অন্যায্য খরচ করিলে অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত সৈন্য নিযুক্ত করিলে দেওয়ানগণ সে ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাজকোষের অর্থ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইতে পারিতেন।

শাসন সৌকার্য্যার্থ এক এক জন সুবাদারের শাসিত দেশকে কতিপয় সরকারে, প্রত্যেক সরকার কতিপয় পরগণাতে এবং প্রত্যেক পরগণা কতিপয় দাস্তরে বিভক্ত ছিল। এই সকল বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্ম-চারীগণ রাজস্ব ও শাসনসংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

প্রত্যেক সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য এক এক জন ফৌজদার রাখিবার নিয়ম ছিল। তাঁহারা রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্য ব্যতীত আপন আপন বিভাগের সৈন্যদলের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। এতদ্ব্যতীত সরকার সমূহের শান্তি রক্ষা এবং সুশাসনের ভারও তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক পরগণার জন্য দেওয়ানের অধীনে একজন করিয়া ক্রোরী নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা দেওয়ানের নির্দ্দেশমত রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রোরীগণের অধীনে রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য তহসিলদারগণ নিযুক্ত ছিলেন। বৃহৎ বৃহৎ নগরের শান্তিরক্ষার জন্য কোতয়ালগণ নিযুক্ত থাকিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে রাজস্বকর্ম্মচারীগণই শান্তিরক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

প্রত্যেক পরগণার জন্য এক এক জন কারকুন নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা পরগণার রাজস্ব সংক্রান্ত প্রত্যেক কার্য্যের দৈনিক বিবরণী রক্ষা করিতেন। সে বিবরণীতে শীকদার প্রভৃতি কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর রাখিবার নিয়ম ছিল। এই বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার প্রতি তিন মাস অন্তর রাজধানীতে প্রেরণ করা হইত। যাহাতে প্রাচীন রীতি-নীতির অন্যথাচরণ,—নূতন আবোয়াবের প্রবর্ত্তন এবং অন্য কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য পরগণা সমূহের কারকুনগণ আদিষ্ট ছিলেন। শীকদার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের কাগজ পত্র যথাযথরূপে লিখিত হইতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার ভারও তাঁহাদের হস্তেই সমর্পিত ছিল। কারকুনগণ যে সকল বিবরণী রাজধানীতে প্রেরণ করিতেন তাহার সমস্ত রাজস্ব বিভাগের দপ্তরে সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত ছিল। ইহার ফলে দেওয়ানগণ আপন আপন হিসাব নিকাশ প্রদান করিবার পূর্ব্বেই বাদশাহগণ সুবা সমূহের রাজস্ব সংক্রান্ত আয় ব্যয়ের সমস্ত বিবরণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন। এজন্য এই বন্দোবস্ত দেওয়ানগণের অপকার্য্যের প্রতিরোধক ছিল এবং তাঁহাদিগকে বহুল পরিমাণে ন্যায় পথে প্রতিষ্ঠিত রাখিত।

মোগল বাদশাহ ইচ্ছাক্রমে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিতে পারিতেন। যথেচ্ছামূলক শাসনপ্রণালীবদ্ধ রাজ্যে এরূপ নিয়ম প্রয়োজনীয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রই উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু বাদশাহের ইচ্ছা হইলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিত। নানা কারণে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মোগল রাজপুত্রগণের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যলাভের আশা তাঁহাদিগকে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও পিতার অনুগত করিয়া রাখিত। একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনাধিকারী এসম্বন্ধে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম না থাকাতে রাজপুত্র মাত্রেই রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। এজন্য মোগল বাদশাহের মৃত্যুর পর রাজবিপ্লব উপস্থিত হইত। এই বিপ্লবকালে প্রকৃতিপুঞ্জ ও সৈন্যবৃন্দ যে রাজকুমারের পক্ষ অবলম্বন করিত তাঁহারই রাজসিংহাসন লাভের সমধিক সম্ভাবনা থাকিত। সুতরাং রাজকুমারগণ পিতার জীবদ্দশাতেই প্রকৃতিপুঞ্জ ও সৈন্য-বৃন্দের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত রাখিবার কল্পনায় অনেক সময়ে সৎপথ অবলম্বন করিতেন এবং প্রাজ্ঞতা ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতে যত্নশীল হইতেন। যথেচ্ছামূলক শাসনপ্রণালীবদ্ধ রাজ্যের অধিপতি তরুণ বয়স্ক অথবা দুর্ব্বলচিত্ত হইলে তাহার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই সব কারণে মোগল বাদশাহের উত্তরাধিকারী নিয়োগের ক্ষমতা প্রয়োজনীয়ই ছিল।

আমরা এস্থানে মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার যে বিশ্লেষণ করিলাম তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে রাজপুরুষগণের পক্ষে বিদ্রোহ অবলম্বন করা সহজ সাধ্য ছিল। মোগল বাদশাহ রাজপুরুষগণের বিদ্রোহ আশঙ্কায় অনেক সময় প্রজাহিতৈষী হইতেন। রাজপুরুষগণের বিদ্রোহ কালে প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার পক্ষাবলম্বী থাকিলে তাঁহার সিংহাসন অটল থাকিত। এজন্য মোগল বাদশাহ সুশাসনে প্রজাবৃন্দের হৃদয় আকৃষ্ট রাখিবার জন্য যত্নশীল ছিলেন। মানুচি লিখিয়াছেন যে জাহাঙ্গীর বাদশাহ প্রজারঞ্জনের জন্য প্রত্যহ গবাক্ষ পথে একবার উপনীত হইয়া জনসাধারণকে দর্শন দিতেন; এনিয়মের ব্যত্যয় হইত না। কোন দুর্নিবার্য্য

উপস্থিত হইলে তাহা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত করিবার নিয়ম ছিল। কারণ সমস্ত প্রজা তাঁহার ক্রীতদাস তুল্য; এজন্য তিনিও পারস্পারিক সম্বন্ধে তাহাদের নিকট এক প্রকার দাসত্বে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি এক দিন দৃষ্ট না হইলে অথবা তাঁহার অনুপস্থিতির উপযুক্ত হেতু প্রদর্শিত না হইলে প্রজাগণের বিদ্রোহ অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই বিবরণ হইতে অনুমিত হইবে যে মোগল বাদশাহের পক্ষে প্রজারঞ্জন করা কিদৃশ প্রয়োজনীয় ছিল। স্বেচ্ছাচারী রাজার সিংহাসন প্রজা প্রীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা কখনও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারেনা। দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার যথেচ্ছামূলক শাসনপ্রণালীর প্রকৃষ্ট নীতি নহে। যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় রাজভক্তিতে উচ্ছ্সিত হইয়া স্বেচ্ছাচারী রাজার সিংহাসন অভিসিঞ্চিত করিতে পারে তদুপায় অবলম্বন করাই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য। মোগল-বাদশাহগণ এই আদর্শে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিভাশালী দয়ার্দ্রচিত্ত প্রজাবৎসল বাদশাহগণের সুশাসনে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর কাল উহার মহিমা ও প্রাধান্য অটুট থাকে। বাবর ভারতের প্রথম মোগল বাদশাহ। তিনি অসি হস্তে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া হিন্দুস্থানে মোগলের বিজয় পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উদারচেতা পুরুষ-সিংহ সে অসি কখনও প্রকৃতিপুঞ্জের রক্তে কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি বিজিতদেশ শাসন করিবার জন্যই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বার্থপরতা দয়াধর্ম্ম বিবর্জ্জিত ছিল না। এজন্য তিনি দেশ শাসনোপলক্ষে কখনও অত্যাচারের প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই; পরন্তু তাহাদের মঙ্গল বিধান জন্য মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার ভারতাগমন পরস্ব লুণ্ঠন জন্য আকস্মিক আক্রমণ ছিল না। তিনি দেশের রাজস্বই আপনার অতুল অধ্যবসায় ও উৎকট পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আমরা সেনাপতিদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান কালে কখনও তত সঙ্কুচিত করেন নাই। এজন্য তাঁহারা রাজপ্রদত্ত অর্থেই পরিতুষ্ট থাকিতেন। আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যপ্রিয়তা বাবরের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল।

এজন্য রাজ্যের স্বাভাবিক আয়ই তাঁহার সমস্ত অভাবমোচনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তিনি কখনও নিজাধীন প্রকৃতিপুঞ্জের ধনধান্যের প্রতি ঈর্ষ্যা কলুষিত নয়নে দৃষ্টিপাত করেন নাই। যে সকল বীরপুরুষ হিন্দুস্থানে মোগলের বিজয় বৈজয়ন্তি বহনকার্য্যে সাহায্য করিয়া ছিলেন তাঁহারা সকলেই বাবরের চরিত্রবলে সঙ্কুচিত ছিলেন। এজন্য তাঁহারাও প্রকৃতি-পুঞ্জের সঙ্গে ব্যবহার কালে সদাশয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিতেন।

বাবরের পুত্র হুমায়ুন প্রতিভান্বিত বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রজাপ্রীতির অভাব ছিল না। তিনি নিজে কখনও প্রজার শোষণ কার্য্যে হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। হুমায়ুনের মস্তক হইতে দুর্দ্দান্ত সের সাহ রাজমুকুট কাড়িয়া নেন। এই সময় ভারতবর্ষের প্রকৃতিপুঞ্জ হুমায়ুনের পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজ্যচ্যুত হইবার পর তাঁহার দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছিল; প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার অনুরাগী থাকিলে তাঁহার তাদৃশ কষ্ট ভোগ করিতে হইত কি না সন্দেহের স্থল। তিনি সপ্তদশ বৎসর কাল তরঙ্গ সঙ্কুল নদীগর্ভে নিমজ্জিত তৃণখণ্ডের ন্যায় নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে সিংহাসন পাতিয়া ছিলেন। এ সময়ের তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের পূর্ব্ববিরাগের প্রতিশোধ লইতে উৎসুক হইয়াছিলেন না।

হুমায়ুনের পুত্র আকবর প্রজা প্রীতির মোহনমন্ত্রে ভারতবর্ষের সর্ব্ব-সাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং ন্যায় ধর্ম্মানুমোদিত পথে প্রজা পালন করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। তিনি রাজার বিনা অনুমতিতেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা প্রজাবর্গকে অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজপুরুষ-গণের শোষণ ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিবিধ বিধানের প্রণয়ন করেন।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর অস্থিরমতি নৃশংস শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় একবারে কোমলতা বর্জ্জিত ছিল না; এবং তাঁহার শাসন কার্য্য পিতৃ অনুসৃত পথেই পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি প্রজারঞ্জনের

জন্য নিরপেক্ষপাতের ন্যায় বিচার করিতেন। এমন কি সুবিচারের জন্য তিনি প্রিয়তমা মহিষী নূরজাহানের পালিত পুত্রকে হত্যার অপরাধে প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান রাজনীতি বিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ট্যাভার নিয়ার লিখিয়াছেন যে শাহজাহান অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন।

শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব কূটনীতিবিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি আপনার গন্তব্য পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য পাপে দ্বিধা শূন্য ছিলেন। তাঁহার গুপ্ত বিষ প্রয়োগে অনেকের ইহলীলা শেষ হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মান্ধতায় হিন্দুগণ অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্বেও আওরঙ্গজেব নিজে কখনও প্রজার ধনরত্নের প্রতি কুটিল কটাক্ষ-পাত করেন নাই এবং রাজপুরুষগণের শোষণ ও অত্যাচার হইতে তাঁহা-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। তিনি ভ্রাতৃরক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিবার সময় ব্যতীত আর কখনও প্রকাশ্যভাবে নৃশংস আচরণের পরিচয় প্রদান করেন নাই। মির আতইআলম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি কখনও কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন নাই।

মোগল শাসনকালে প্রকৃতিপুঞ্জ পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছে, তাহারা কোন প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করে নাই; ইহা প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে মোগল বাদশাহগণ প্রজা-হিতৈষী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ফলতঃ প্রজার হিতকর বিধান প্রণয়ন করিলেই তাহা প্রতিপালিত হয় না; তাহার প্রতিপালন জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সর্ব্বদা সন্ধিবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া বাদশাহগণ সকল সময়ে রাজপুরুষগণের কার্য্যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। এজন্য নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিত। বিশেষতঃ আওরঙ্গজেবের বংশধরগণ দুর্ব্বলচিত্ত প্রজাপালনে অপটু শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা বিলাসস্রোতে ভাসমান থাকিতেন এবং দুরাকাঙ্ক্ষ মন্ত্রি সমাজের কার্য্যানুমোদন করিয়াই আপন আপন [illegible] কর্ত্ত—

করিতেন ও ক্লীব রাজন্যবর্গ মন্ত্রিগণের করধৃত সূত্রাবলম্বনে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন এবং কোন কারণে সে সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পা ভুলেই তাঁহারা ভূলুণ্ঠিত হইতেন। এই সব কারণে মোগল শাসনের শেষ ভাগে দেশ মধ্যে অরাজকতা রাজত্ব করিতে ছিল। (১)

শ্রীরাম প্রাণ গুপ্ত।

—*—

(১) আমরা প্রবন্ধান্তরে মোগল শাসন কালে ভারতবাসীর অবস্থা কিরূপ

পিশাচী।

তখন আমি একজন ডেপুটী, সুতরাং সরকারী কার্য্যোপলক্ষে প্রায়ই মফঃস্বলে যাইতে হইত। সে বার একটা জটিল মোকদ্দমার সরজমিন তদারকের জন্য দৌলৎপুর গিয়াছিলাম। তখন বৈশাখ মাস,— প্রখর গ্রীষ্মকাল। মোকদ্দমার চিন্তায় এবং গ্রীষ্মের তাড়নায় আমি সে দিন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। উপায়ান্তর না দেখিয়া, আমার সেই নাতিবৃহৎ নাতিক্ষুদ্র পটমণ্ডপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্যাম্পখাটিয়া খানি বাহিরে আনিয়া বিছাইলাম।

এতক্ষণে যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মস্তকের উপর অনন্ত নক্ষত্রখচিত সুন্দর আকাশ— তাহার স্থানে স্থানে আলো, আর স্থানে স্থানে অল্প অল্প অন্ধকার, আর সম্মুখে বহুদূরবিস্তৃত অন্ধকার মাঠ, তার পরই জঙ্গল তালগুল্মাদিপরিবৃত দৌলৎপুরের নির্জ্জন প্রান্ত সীমা। সেই নিশীথে আমি ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম, এমন সময় স্তব্ধ প্রান্তর বিকম্পিত করিয়া কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল :—

"রক্ত—রক্ত—বিষ!"

শুইয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। আবার সেই কণ্ঠ ধ্বনিত হইল—"রক্ত-রক্ত-বিষ"। মনে হইল যেন আকাশের শতকোটী নক্ষত্র এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া চীৎকার করিতেছে—'রক্ত-রক্ত-বিষ'। বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল। আমি ডাকিলাম—"বেয়ারা"। কিন্তু তাহার কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না। আমার নিকট হইতে, দশ হস্ত মাত্র দূরেই আবার সেই ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল—'রক্ত—রক্ত—বিষ'।

শয্যাত্যাগ করিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, একটি ছায়াময়ী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে দূরের অন্ধকারের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। পরক্ষণেই একটি কঙ্কালসার মলিন অর্দ্ধবিবসন পুরুষের কম্পিত হস্ত আমার সবল দৃঢ় মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ হইল। সেই অন্ধকারের ভিতরেও তাহার চক্ষু দুইটি যেন তপ্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল।

মূর্ত্তি তাহার বিকট দন্তপংক্তি বাহির করিয়া "হি হি" করিয়া হাসিয়া উঠিল; তারপর ভীত ত্রস্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল—"রক্ত-রক্ত—বিষ"।

পরক্ষণেই সমস্ত নিস্তব্ধ—সে আমার পায়ের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

সেই মূর্চ্ছিত সন্ন্যাসীকে আমি তাঁবুতে বহিয়া আনিলাম। তখন আমার হেডক্লার্ক অবিনাশ বাবু এবং চাপরাসীরা জাগিয়া উঠিয়াছে। সকলে মিলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া শীতল জল সেচনের পর তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। প্রদীপালোকে দেখিলাম—একটি কঙ্কালসার নরমুণ্ড তাহার গলদেশে বিলম্বিত রহিয়াছে।

আমার বড়ই কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নাম কি?"

সে আমার কথার কোন উত্তর দিল না। কেবল নিতান্ত অপরাধীর মত আমাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে এক একবার চাহিতে লাগিল। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত—ললাট চিন্তারেখাচিহ্নিত; মুখ দেখিয়াই আমাদের বেশ মনে হইল যে, এ ব্যক্তি উন্মাদরোগগ্রস্ত।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার বাড়ী কোথায়?" তথাপি সে নিরুত্তর। তাহার মুখের মাংসপেশীগুলি মধ্যে মধ্যে এক একবার যেমন কুঞ্চিত ও বিস্ফারিত হইতেছিল, তাহাতে বেশ বুঝিলাম যে, সে যেন কি একটা কথা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে অথচ পারিতেছে না বলিয়া বড়ই বিব্রত হইতেছে। এমন করিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল।

ধীরে ধীরে তাহার মুখের শ্রী অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিল। তাহার উন্মত্ত আরক্ত বিস্ফারিত লোচনদ্বয় নমিত হইতে লাগিল। আমি তাহার

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার নাম কি ?" একটি গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে তখন বলিতে লাগিল :—

"কি আমার নাম ? আমার নাম হেমচন্দ্র। একদিন আমিও ঠিক তোমারই মত ছিলাম। আমারও আশা ছিল, ভরসা ছিল। কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়া দেখিয়া আমিও আমার দিবস রজনী অতিবাহিত করিতাম। আমিও একদিন তোমারই মত হাসিয়াছি—তোমারই মত ভাবিয়াছি—তোমারই মত সকল কাজই করিয়াছি। শোন, শোন আমার দুঃখময় জীবনের সকল কথা আজ তোমাকে বলিব। কাহারও কাছে না বলিতে পারিয়া আমি যেন পাগল হইয়া উঠিয়াছি—আমার বুকের ভিতর জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই দেখ, চাহিয়া দেখ—আমার বুকের ভিতর সহস্র শ্মশানের লক্ষ চিতা জ্বলিতেছে।"

হেমচন্দ্র তাহার ক্ষীণ বাহুদুইটি ঊর্দ্ধে তুলিয়া, তাহার সেই ব্যাথিত বক্ষস্থল আমাকে দেখাইতে লাগিল। আমি নির্ব্বাক হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিলাম। সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল—

"আমি একজন উকিল ছিলাম। আমার কত যশ, কত সম্মান, কত অর্থ ছিল। সে সব এখন স্বপ্নের কথা। যশ, সম্মান, অর্থ এ সব ত তুচ্ছ; আমার একটি সামগ্রী ছিল যাহা পৃথিবীতে বুঝি আর কাহারও ছিল না—বুঝি আর কাহারও হইবে না। সেটি কি শুনিবে? সে আমার হৃদয়ের রাণী, নয়নের মণি, আমার রূপবতী গুণবতী পত্নী-সরলা। সরলা আমার দ্বিতীয় বারের পরিণীতা স্ত্রী। খুব অল্প বয়সে আমার প্রথম বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের ৪।৫ দিন পরই আমার সে স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। সরলার যেমন সৌন্দর্য্য, তেমনি গুণ ছিল। তাহার মত স্ত্রী কয় জনের হয় ? আমার অদৃষ্ট-লক্ষ্মী সরলা আমারই ছিল। আমি তাহার দিকে চাহিয়াই সংসারে তোমাদের মত কত অসাধ্য সাধন করিয়াছি।

হেমচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল !

"তারপর একদিন, সে আজ অনেক দিনের কথা—কি জানি কতদিন ? আমার আর তাহা মনে হয় না,—তারপর একদিন আমার অদৃষ্ট সরলা ফুটিয়া গেল। আমি ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম সরলা নাই, শুধু তাহার স্মৃতি

আছে—সরলা অমরধামে চলিয়া গিয়াছে, যাইবার সময় আমার জন্য তাহার কেবল একটি মাত্র স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আমি আমার ভাঙ্গা বুকে সরলার সেই চিহ্নটীকে তুলিয়া লইলাম—তুলিয়া লইয়া কত যে কাঁদিলাম তাহা আর বলিতে পারি না।"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই হেমচন্দ্রের চক্ষু যেন ক্রমশঃ আরক্ত হইতে লাগিল। তাহার মুখমণ্ডলে উন্মাদের দুই একটি লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। হেমচন্দ্র আরও উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—

"আমি সরলার স্মৃতি বুকে করিয়া সরলার প্রতি মাংস, মজ্জা—সরলার রক্তেরও বাড়া তাহার বড় যত্নের, বড় আদরের সেই অমূল্য চিহ্নটীকে আমার জীবনের লক্ষ্য করিয়া আবার তাহার জন্যই সংসারের বাঁধনে বাঁধা পড়িলাম। কিন্তু একদিন, কি কুক্ষণে। আমার বৃদ্ধ পিতার নিতান্ত অনুরোধে আমি এমন একটি বিষম ভুল করিলাম—তাহার জন্য আমার সব গেল। হায় হায়, আমি কেন তখন বুঝি নাই?"

যে হৃদয়ে সরলার রাজত্ব ছিল, এক দিন কি কুক্ষণে সেই হৃদয়ে মোহিনী আসিয়া রাজত্ব বিস্তার করিল—সেই বুকে, বুকের সেই আসনে পিশাচী মোহিনী আসিয়া বসিল। আমি মোহিনীকে বিবাহ করিলাম। আমার সরলার চিহ্নটীকে আমি মোহিনীর হস্তে সমর্পণ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম—রমণী দেবী! সরলাকে দেখিয়া আমার সেই ধারণাই হইয়াছিল। কিন্তু মোহিনী যে রাক্ষসী, তাহা আগে বুঝিতে পারি নাই।

এমনি করিয়া অনেক দিন গেল। আমি সরলাকে ভুলি নাই; তখনও ভুলিয়াছিলাম না। কিন্তু ঐ পিশাচী আসিয়া কিছুদিনের জন্য একটা কেবল মোহের আবরণ দিয়া সরলার সেই দেবীমূর্ত্তিকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

আমার নয়নের আলো, দেহের রক্ত, যোগেশ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যোগেশের মুখে আমি সরলার সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। তাহার মুখ চাহিয়াই আমি প্রাণ ধরিয়াছিলাম।

শেষে আমার যোগেশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইল—লেখা পড়া শিখিল। ডাক্তারী শিখিবার জন্য আমি তাহাকে কলিকাতা পাঠাইলাম। রাক্ষসী পিশাচী

মোহিনীর ইহা সহিত না। আমার স্বর্গ অভিনয় করিতাম, কিন্তু মোহিনী সে জন্য বড় ব্যথিত হইত। সে আমার বুকের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রেমের আসন পায় নাই। তাই সাহস করিয়া আমাকে বড় বেশী কিছু বলিতে পারিত না। কেবল আকার ইঙ্গিতে মধ্যে মধ্যে যোগেশের বিরুদ্ধে দুই একটি কথা আমার কাছে বলিতে চাহিত। আমি তাহাতে কাণ দিতাম না। বরং মোহিনীকে তজ্জন্য শাসন করিতাম। তখন আমার আরও দুইটি পুত্র জন্মিয়াছে।"

হেম বাবু থামিয়া গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর---"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি আমার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে বলিলেন---

"আমার মাথাটা যেন কেমন করিতেছে। আমি বুঝি আবার এখনই জ্ঞান হারাইব। মাঝে মাঝে আমার বেশ জ্ঞান হয় তখন আমি সব কথা বুঝিতে পারি - আবার পরক্ষণেই কেমন উন্মত্ত হইয়া উঠি। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি, সব কথা বলিয়া ফেলি; নহিলে বুঝি আর বলা হইবে না।

"হাঁ, কি বলিতেছিলাম। ও শ্রী মোহিনীর কথা। মোহিনী যোগেশকে কিছু বলুক আর নাই বলুক, সে যে মোহিনীর চরিত্র অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাতে আর আমার সন্দেহ নাই। সকলেই জানিত মোহিনী কিছু অধিক স্বার্থপর। আমি অনেক দিন দেখিয়াছি, যখনই কোন কার্য্য-গতিকে যোগেশ আমার শয়নকক্ষে আসিত তখনই মোহিনী তাহার উপর এমন একটি অবিশ্বাসপূর্ণ তীব্র কটাক্ষপাত করিত যে, তাহাতে আমার শরীরের ভিতর দিয়া যেন তাড়িত প্রবাহ ছুটিতে থাকিত। কিন্তু কি করিব, আমি তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতাম না।

"কলিকাতা যাইবার পূর্ব্ব হইতেই যোগেশ সতর্ক হইয়াছিল। যতদূর সম্ভব সে তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ রমেশ ও নর্দানকে সে প্রাণপণে ভালবাসিত। আমি মোহিনীকে কত শিখাইতাম, কত বুঝাইতাম। কিন্তু রাক্ষসী কিছুতেই বুঝিল না। সেই আমার সর্ব্বনাশ করিল।

"ঐ দেখ--- ঐ সে সে আসিয়াছে। আয় রাক্ষসী পিশাচী আয় --- তোর রক্তে আমি আজ সরলার রক্তের শোধ লইব------"

হেমচন্দ্র ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলাম; আবার তাহার মস্তকে জলসেচন করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ শুশ্রূষা করিবার পর, সে ধীরে ধীরে শান্তভাব ধারণ করিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল।

"যোগেশ যখন মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ারে (Third year) পড়ে, সেই সময় আমি তাহার বিবাহ দিলাম। বিবাহের দিন সরলার কথা মনে করিয়া আমি পাগল হইয়া উঠিয়াছিলাম, কত কাঁদিয়াছিলাম তাহা আর এখন মনে হয় না। আমি নিজে দেখিয়া শুনিয়া সেই বিবাহ স্থির করিলাম, অন্যের পছন্দের উপর নির্ভর করিলাম না। বৌমা ঘরের লক্ষ্মী হইয়া আমার ঘর আলো করিতে আসিলেন। মায়ের যেমন রূপ, তেমনি গুণ। লক্ষ্মীশ্রী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার ক্ষুদ্র কুটীরে বিরাজ করিতে লাগিল। মা মাধুরী--- আমার স্নেহের মাধুরী -- তুমি কোথায় আছ মা? না আর আমি কাঁদিব না। রাক্ষসী মোহিনীই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ওকি? তুমি ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছ কেন? শোন--- শোন, এখনও বাকি আছে। আমার সমস্ত জীবন যেন ঘোরতর অভিসম্পাতের সমষ্টি। আমি সেই তীব্র বিষের নিষ্ঠুর দহনে দিনরাত জ্বলিতেছি।

"আমার স্ত্রী--- না না--- আমার স্ত্রী নয়, আমার জীবননাশিনী স্ত্রীরূপিনী পিশাচী মোহিনীরও রূপ ছিল। কিন্তু বৌমা যখন ঘরে আসিলেন, তখন তাঁহার রূপে গৃহ আলোকিত হইল। নামটিও যেমন 'মাধুরী', তেমনি শরীরেও অপরূপ মাধুরী ছিল। তোমার কাছে সেই মোহিনী! ছি ছি! চন্দ্রের কাছে খদ্যোত --পারিজাতের কাছে কিংশুক, মন্দাকিনীর কাছে পার্ব্বত্য তরঙ্গিণী!

অল্পদিনের ভিতরেই সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা মাধুরী আমার সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিল।

"পুত্রঘাতিনী সেই পাষাণী মোহিনীর তাহাকে বড়ই হিংসা হইত। তাহার রূপের প্রশংসা আর কেহ করে না দেখিয়া, সে [illegible] জ্বলিয়া

রাগিয়া রাগিয়া ফুলিত, ফুলিয়া ফুলিয়া গর গর করিত। ক্রোধে অভিমানে হিংসায় সে অবশেষে বৌমাকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করিল। আমার ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু করিতে পারিত না। মুখের কথায় যতদূর হয় তাহার আর ত্রুটি করিত না। তথাচ মোহিনীর মন উঠিত না। সে কথায় কথায় বৌমাকে তাহার সৌন্দর্য্যের কথা তুলিয়া বিদ্রূপ করিত। বৌমা নীরবে কাঁদিত—নীরবে সহিত—প্রাণপণে তাহার পাষাণী শ্বাশুড়ীর চরণ সেবা করিত।

"আমি তখন নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতাম বলিয়া এ সকল কথা বড় বেশী জানিতে পাইতাম না। কিন্তু শোন—মোহিনীর মাতৃস্নেহের কথা শোন—ভ্রান্তিবশতঃ কোনদিন যদি ঘুমাইয়া পড়িলে, মোহিনী কখনও বৌমাকে ডাকিয়া তুলিত না। বৌমাকে অনাহারে থাকিতে দেখিলে হয়ত সেই পাষাণীর আনন্দ হইত। আমারই অর্থ, আমারই গৃহ, আমারই সব; আর সেই গৃহে থাকিয়া আমারই পুত্রবধূ কতদিন অনাহারে নিশিযাপন করিয়াছে। আমি কি ভাই সাধে পাগল হইয়াছি? আমার কথা শুনিতে শুনিতে তুমিও বুঝি পাগল হইয়া উঠিবে।

"তারপর একদিন কি অশুভ ক্ষণেই আমি একবার মফঃস্বলে গিয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। ফিরিয়া আসিতে আমার ৮ দিন হইয়াছিল। তখন রাত্রি প্রায় ১২টা হইবে, আমি বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। পৌঁছিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিলাম সাধ্বী আমাকে ফাঁকি দিয়া সরলার কাছে চলিয়া যাইতেছে!

"কয়েকদিন হইল বৌমার বড় জ্বর হইয়াছিল। কিন্তু অধিক মাত্রায় আর্সেনিক খাইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সে দিন তাহাই দেখা গেল।

"আমি ফিরিয়া আসিবার দুই দিন পূর্ব্বে যোগেশ কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়াছিল। আমার অনুপস্থিতির জন্য সে লজ্জায় ভাল ডাক্তার ডাকিতে পারে নাই। আমি ব্যাকুল আগ্রহে যোগেশের বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিলাম। সে শান্তভাবে বলিল—"Arsenic poisoning" হইয়াছে। আমি চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। সেই কালরাত্রি ফিরাইয়া দিবার জন্য আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলাম। যে ডাক্তার দুই এক দিন বাবুটীর চিকিৎসা করিয়াছিল, আমি তাহাকে ডাকিলাম।

ডাক্তারের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সে ভয়ে ভয়ে বলিল 'আমি ত কোন ঔষধেই আর্সেনিকের ব্যবস্থা করি নাই'।

"আমি তখন কতবার করযোড়ে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু নিষ্ঠুর দেবতা আমার কথা শুনিল না। আমি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে মার ব্যথিত মস্তক আমার কোলে তুলিয়া লইয়া ডাকিলাম---- 'মা মাধুরী---"

"মাধুরী একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। হায় সে দৃষ্টি কি করুণ—অথচ কি স্থির। সেই মর্মস্পর্শী নয়ন যেন তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাকে বলিতে লাগিল--- 'বাবা আর একটু আগে এলে না কেন'? আমি আবার ডাকিলাম -- "মাধুরী---- মা আমার" আমার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে মাধুরী বলিল - 'কি বাবা'?

"ভাই! তখনও আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল না। আমি তখনও মরিলাম না।"

হেমচন্দ্র আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া হৃদয় একটু শান্ত হইলে পর সে আবার বলিতে লাগিল—

"তার পরই সব শেষ হইল! মধুরী আর কথা কহিল না। সেই বালিকা বিরহিণী আমার কোলে মুখ লুকাইল। আমার কোলের উপরেই একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যথিত প্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল! আমার সর্ব্বনাশ হইল!

"আমি কত কাঁদিলাম—কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত ডাকিলাম। আমার মাধুরী আর কথা কহিল না। আমার বুকের ভিতর শত সহস্র তপ্তলৌহ প্রবেশ করিল। আমি মোহিনীর চরিত্র জানিতাম; তাই সেই মুহূর্ত্তেই তাহার বাক্স ভাঙ্গিলাম। আমি যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। মোহিনীর বাক্সের ভিতর দুই শিশি আর্সেনিক পাওয়া গেল! আমার চরণতল হইতে তখন ধরিত্রী—যেন সহসা সরিয়া গেল!

"ধর্ম্মের বন্ধন—স্নেহের বন্ধন—সকল বন্ধন মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিন্ন করিলাম, তারপর তৎক্ষণাৎ আমার ছোরা বাহির করিয়া রাক্ষসী পিশাচী মোহিনীর কুটিল নিষ্ঠুর বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলাম।

ঐ যে আবার সেই রাক্ষসী আসিয়াছে। ঐ দেখ এখনও তাহার বুকে আমার সেই শাণিত ছোরা! ঐ শোন রাক্ষসী হাসিতে হাসিতে বলিতেছে "আমাকে মারিয়াছ, বেশ করিয়াছ—আমি ত আমার কাজ করিয়াছি। মার মার ভাই তোমরা সকলে মিলিয়া মোহিনীকে মার। পতিঘাতিনী—পাপীয়সী—"

হেম বাবু বসিয়াছিলেন—মুহূর্তের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ বিশুষ্ক—চক্ষুঃ রক্তবর্ণ—হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ। আবার আমরা তাঁহাকে বসাইয়া নানা রকমে শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

এইবার প্রকৃতিস্থ হইতে অনেকক্ষণ লাগিল। প্রকৃতিস্থ হইয়া হেমবাবু আমাকে বলিলেন—"তুমি কাঁদিতেছ, কাঁদিওনা। এই দেখ আমার চোখে আর জল নাই। আরও শোন—আরও অনেক বাকি আছে। আমি কত সহিয়াছি কত সহিতে পারি তা, শোন।

মাধুরী স্বর্গে চলিয়া গেল—মোহিনী মরিল। কিন্তু পাড়ায় একটা খুন হইয়াছে দেখিয়া পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি অম্লান বদনে বলিলাম আমিই মোহিনীকে হত্যা করিয়াছি। কিন্তু আমার সম্মান—আমার বংশমর্য্যাদা—আমার সেই স্থানীয় পদগৌরব বিবেচনা করিয়া সে কথা কেহ বিশ্বাস করিল না।

পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই যোগেশ মোহিনীর রক্তাক্ত বক্ষ হইতে সেই ছোরাখানা খুলিয়া লইয়াছিল। আমার বিপদ দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি সেই রুধিররঞ্জিত শাণিত অস্ত্রখানি হস্তে করিয়া আসিয়া বলিল—

"তোমরা আমার বাবাকে ছাড়িয়া দাও। আমিই হত্যাকারী। আমার স্ত্রীকে যে বিষ দিয়া হত্যা করিয়াছে, আমি প্রতিহিংসার জন্য তাহাকে আজ মারিয়া ফেলিলাম। যদি ইহাতে দোষ থাকে ত সে দোষ আমার, বাবা বাড়ীতেই ছিলেন না, উনি এই মাত্র এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।"

যোগেশের কথার উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। আমি কত কাঁদিলাম—কত সাধিলাম—কত পায়ে ধরিলাম—শেষে আমার যথাসর্ব্বস্ব তাহাদিগকে দিতে চাহিলাম। তাহারা শুনিল না।

যোগেশ যেরূপ ভাবে অপরাধ স্বীকার করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল তাহাতে আমার কাতর ক্রন্দনের আর কোনই ফল হইল না।

আদালতে বিচার আরম্ভ হইল। আমার যাহা শক্তি তাহা করিলাম। কিন্তু যোগেশকে আর রক্ষা করিতে পারিলাম না। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার জন্য আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

এই দেখ, আমার গলায় যে নরমুণ্ড দেখিতেছ ইহা আমার সেই পিরতমের মস্তক। আমি যে কত সহস্রবার আমার নয়নবারি দিয়া এই মস্তক ধৌত করি তাহা বলিতে পারি না। যোগেশ— যোগেশ— আমার যোগেশ——"

হেমচন্দ্র সেই কঙ্কালসার নরমুণ্ড তাহার ব্যথিত বক্ষের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। তখন তাহার মূর্ত্তি এরূপ ভয়ানক হইয়াছিল যে আমরা সাহস করিয়া আর তাহার দিকে চাহিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ এক ভাবে থাকিয়া হেমবাবু 'হি হি হি' করিয়া একটি বিকট হাসি হাসিল। আমরা সকলে শিহরিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্ত্তে আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু দূরে নৈশগগন প্রতিধ্বনিত করিয়া যেন আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল— রক্ত—রক্ত বিষ!"

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(রাজসাহীর প্রাচীনত্ব।)

ইংলণ্ড একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। তাহার প্রতি পল্লীর ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষের ন্যায় মহাদেশের কোন ইতিহাস নাই। স্যর উইলিয়ম হণ্টার যখন এই সাক্ষ্যটিক লিপিবদ্ধ করেন, তখন বঙ্গসাহিত্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনায় নিযুক্ত ছিল। তাহার পর ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের দৃষ্টি ইতিহাসের প্রতি

শ্রীকালীনাথ চৌধুরী প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ টাকা।

নিপতিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বদেশের ঐতিহাসিক তথ্য সংকলন করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদের পথ কণ্টকাকীর্ণ তমসাচ্ছন্ন ও দুর্গম বলিয়া তাঁহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহারা যে সত্যানুসন্ধানের জন্যই ব্যগ্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লিখিত ইতিহাসের অভাবে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া নানারূপে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য ইতিহাসের প্রকৃত উপাদান সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময়ে যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রম একেবারে নিষ্ফল হইয়া যায়;--- কখন বা বহু পরিশ্রমের পর যৎসামান্য ফল লাভ হয়। এরূপ অবস্থায় পদে পদে পরিশ্রান্ত ও বিড়ম্বিত হইয়াও যাঁহারা স্বদেশের ইতিহাসের বিলুপ্ত তথ্যের উদ্ধারকল্পে সাহিত্যাশ্রমে অগ্রসর হইয়াছেন; তাঁহারা সর্ব্বথা ধন্যবাদের পাত্র।

বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার এক একখানি ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে, কালে তদ্দ্বারা সমগ্র বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার যথেষ্ট সহায়তা হইবে বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজী ভাষায় এই শ্রেণীর জেলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ঢাকা, যশোহর, ও রঙ্গপুরের ইতিহাস সর্ব্বজনপরিচিত। এই সকল গ্রন্থ কিন্তু রাজকীয় দপ্তরের সহায়তায় লিখিত, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। দেশের লোকে তথ্যানুসন্ধান করিয়া জেলার ইতিহাস লিখিলে এরূপ হইবে না বলিয়া আশা ছিল। এই আশার উপর নির্ভর করিয়া কংগ্রেস ও কনফারেন্স কত বার দেশীয় লোকের দ্বারা দেশের এক এক খানি বার্ষিক শাসনবিবরণী সঙ্কলন করাইবার কল্পনা করিয়াছে, অদ্যাপি তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এখন লিখিবার লোকের অভাব নাই---- অনেকেই মাতৃভাষায় গ্রন্থরচনা করিতেছেন। কিন্তু ইতিহাস লিখিতে বা ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করিতে হইলে, লিখিবার ক্ষমতা ছাড়া আরও অনেক সম্বল থাকা প্রয়োজন। তাহা বিদ্যা বুদ্ধি বা লিপিকৌশলের উপর নির্ভর করে না। সেই জন্য অনেকে উপযুক্ত সহায়তাভাবে নিরাশ হইয়া ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে বীতরাগ হন।

রাজসাহীনিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চৌধুরী মহাশয় এই সকল অসুবিধা

উপেক্ষা করিয়া বহুশ্রমে যে রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কাশীনাথ বাবু স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনেস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজসাহী ও অন্যান্য জেলার নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া এক্ষণে বিশ্রামবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বাটীতে বসিয়া জীবনসন্ধ্যা আলস্যে যাপন না করিয়া, রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা রাজসাহী কেন,--- সমগ্র বাঙ্গালার পক্ষেই আশার সংবাদ। এইরূপ পরিণতবয়স্ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপন আপন জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সহজে ফলবতী হইতে পারে।

রাজসাহীর কোন লিখিত ইতিহাস ছিল না। অতি পুরাকাল হইতে ইংরাজরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় পর্য্যন্ত রাজসাহীর কথা বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত অভিন্নভাবে বিজড়িত। স্বর্গীয় কিশোরী চাঁদ মিত্র কলিকাতা রিভিউপত্রে রাজসাহীর রাজ দর্পণের যে সংক্ষিপ্ত কাহিনী মুদ্রিত করেন, তাহা নানারূপ ভ্রমপূর্ণ হইলেও রাজসাহীর একমাত্র মুদ্রিত ইতিহাস বলিয়া পরিচিত। তাহাতে জ্ঞাতব্য তথ্য অধিক নাই;- কেবল কয়েকটি রাজপরিবারের কথায় গ্রন্থকলেবর পরিপূর্ণ, তাহাও কাগজপত্রের সহায়তায় লিখিত নহে,---- পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ জনশ্রুতি মাত্র! স্বর্গীয় গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "লঘুভারতম্" নামক সংস্কৃত ইতিহাসে প্রসঙ্গক্রমে রাজসাহীর কথা অনেক আছে; কিন্তু তাহারও ঐতিহাসিক ভিত্তি সেরূপ সুদৃঢ় নহে। এই দুই গ্রন্থ ব্যতীত আধুনিক কোন কোন ঐতিহাসিক চিত্রে, জীবনচরিতে বা মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে রাজসাহী সম্বন্ধে সময়ে সময়ে নানা কথা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় 'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" এই প্রথম;--- কেবল রাজসাহীতে ইহা নূতন নহে, বাঙ্গালাদেশেও নূতন। সুতরাং এরূপ গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নির্ভুল করিবার জন্য গ্রন্থকারকে যথাসাধ্য সহায়তা করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার তজ্জন্য বিজ্ঞাপনের উপসংহারে সকলের নিকটেই প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিব:---(১) অযুক্ত ঐতিহাসিক তথ্য, (২) মুদ্রাঙ্কণের ভ্রম। পুস্তকের মধ্যে যে সকল

ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা সংশোধিত হওয়া প্রার্থনীয় বলিয়াই তাহার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সময়াভাব বশতঃ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি এই ভার অর্পণ করিয়াছিলাম। তিনি কিয়ৎ পরিমাণে সহায়তা করিয়া, সময়াভাব বশতঃ সকল কথার আলোচনা করিতে পারেন নাই। সুতরাং এবার কেবল রাজসাহীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেই সমালোচনা লিখিত হইল।

একদা সমগ্র বাঙ্গালাদেশ রাঢ়, বরেন্দ্র বাগড়ী ও বঙ্গ নামক ভাগচতুষ্টয়ে বিভক্ত থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ বাগড়ী সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। সমুদ্রজল রাঢ় বরেন্দ্র ও বঙ্গের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিত। তখন পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নামই সমধিক সুপরিচিত ছিল; তাহার পূর্ব্বোত্তরে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের হিন্দুরাজ্য; এবং পশ্চিমে মিথিলা;—তাহার কথাও পুরাতন পুস্তকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাজসাহী জেলা পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত; কিন্তু এই জেলা এখন যেমন আয়তনে সংকীর্ণ, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না;—একদা রাঢ়, বাগড়ী, বঙ্গ বরেন্দ্র ও মিথিলার কিয়দংশ পর্য্যন্তও রাজসাহী রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালা দেশকে যে একাদশ চাকলায় বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে আট চাকলাতে রাজসাহীর জমিদারীর সম্পর্ক থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ভূভাগ তৎকালে রাজসাহী নামে খ্যাত হইয়াছিল, নানা সময়ে তাহার নানা নাম প্রচলিত থাকায়, বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা ঘটিয়াছে। কিন্তু মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী পদ্মাবতীর উত্তরাবস্থিত জনপদ যে বহুপুরাতন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিয়াই গ্রন্থকার পুস্তকের উপক্রমণিকা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে দ্বিবিধ দোষই প্রবিষ্ট হইয়াছে। রাজসাহীর প্রাচীনত্বের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই; জনশ্রুতিমূলক যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। গ্রন্থকার তাহারই উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন:—"রাজসাহী মৎস্যদেশের অন্তর্গত এবং রাজসাহীতে যে মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের রাজ্য ছিল, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না।" বলা বাহুল্য, মহাভারত এই মতের সমর্থন করে

মা। মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্বের পঞ্চমাধ্যায়ে পাণ্ডবগণের মৎস্যদেশ প্রবেশের যে পথ বিবৃত আছে, তদনুসারে তাঁহারা— কালিন্দী উত্তীর্ণ হইয়া উহার দক্ষিণতীর পশ্চাতে রাখিয়া উত্তরে দশার্ণ ও দক্ষিণে পাঞ্চাল দেশ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যকৃল্লোম ও শূরসেন দেশের মধ্য দিয়া গিরিদুর্গ ও বনদুর্গে বাস করিতে করিতে মৎস্যদেশে উপনীত হন।* বিরাট পর্ব্বের ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়ে দেখা যায়, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার মন্ত্রণাক্রমে দুর্য্যোধন যখন মৎস্যদেশ আক্রমণ করেন, তিনি তখন হস্তিনাপুরি হইতে কৃষ্ণা সপ্তমীতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে গমন করিয়া পর দিবস কৃষ্ণা অষ্টমীতে গোগৃহ আক্রমণ করেন। উদ্যোগ পর্ব্বের বর্ণনায় দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বিরাটনগর হইতে একদিনেই হস্তিনায় উপনীত হন। সুতরাং মহাভারতীয় প্রমাণে মৎস্যদেশ বঙ্গদেশের অন্তর্গত নহে;— তাহা হস্তিনার নিকটবর্ত্তী জনপদ। এই মৎস্যদেশ সুরাষ্ট্র (সুরাট) ও অবন্তি (উজ্জয়িনীর) নিকটবর্ত্তী।† রাজসাহী প্রদেশের জনশ্রুতির মূল কি? গ্রন্থকার তাহার তথ্যানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইতেন, যে সকল স্থানের সহিত লোকে মৎস্যদেশ ও বিরাটনগরের স্মৃতি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা সমস্তই পুরাতন বৌদ্ধকীর্ত্তিবিমণ্ডিত "মহাস্থানের" অন্তর্গত। বাঙ্গালাদেশ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণসমাজে

---

* সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ মারয়ন্তি চ সর্ব্বশঃ।
বসন্তো গিরিদুর্গেষু বনদুর্গেষু ধন্বিনঃ॥
বিধ্যন্তো মৃগযূথানি মহেষ্বাসা মহাবলাঃ।
উত্তরেণ দশার্ণাংস্তে পাঞ্চালান্দক্ষিণেন তু॥
অন্তরেণ যকৃল্লোমান্ শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবাঃ।
লুব্ধা ব্রুবাণা মৎস্যস্য বিষয়ং প্রাবিশন্ বনাৎ॥

বিরাটপর্ব্ব। ৫ম অধ্যায়।

† সন্তি রম্যা জনপদা বহ্বন্নাঃ পরিতঃ কুরূন্।
পাঞ্চালাশ্চেদিমৎস্যাশ্চ শূরসেনাঃ পটচ্চরাঃ॥
দশার্ণা নবরাষ্ট্রশ্চ মল্লাঃ শাল্বা যুগন্ধরাঃ।
সুরাষ্ট্রং সুবিস্তীর্ণং সুরাষ্ট্রাবন্তয় তথা॥ বিরাটপর্ব্বঃ ১ম অধ্যায়।

ছেদ হইয়াছিল;--- তীর্থযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে পদার্পণ করিলে ব্রাহ্মণকে পুনরায় উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিতে হইত। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের পর বাঙ্গালীরা স্বদেশের পবিত্রতা প্রচারের জন্য তাহাকে মহাভারত-বর্ণিত মৎস্যদেশ ও পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত বাসের পবিত্র স্থান বলিয়া উল্লেখ করা কিছুমাত্র বিস্ময়ের কথা নহে। এ দেশে একাধিক স্থান এইরূপে পূর্ব্বগৌরব লাভের জন্য লালায়িত থাকার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ কোন্ স্থানে আসিয়া মহারাজ আদিশূরকে আশীর্ব্বাদ করেন তদ্বিষয়ে এখনও মতভেদ বিদূরিত হয় নাই। বারেন্দ্রকুল-শাস্ত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন:--

"সুরসরিদবধৌতং যাস্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং।"

তদনুসারে পুরাতন গৌড় (লক্ষ্মণাবতী) সূচিত হয়; গঙ্গাহীন বঙ্গদেশের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর সূচিত হয় না। অথচ ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদিগের পঠিত আশীর্ব্বাদনির্ম্মাল্য বলে পুরাতন শুষ্ককাষ্ঠ মঞ্জরিত হওয়ার স্থান, এমন কি সেই শুষ্ককাষ্ঠযূপ পর্য্যন্তও পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে তুল্যরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে! হে মারের জন্মস্থান বলিয়া গৌরব লাভের জন্য পাশ্চাত্যদেশে সপ্তদ্বীপ কলহ করিয়াছিল; আমাদের দেশেও জনশ্রুতি এইরূপ বহুকলহের ভিত্তি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই সকল জনশ্রুতির উল্লেখ করিবার সময়ে যথাসাধ্য তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে কালীনাথ বাবু নিজেই রাজসাহী প্রদেশের মৎস্য-দেশাভিমান নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। সকল দেশেই এরূপ পূর্ব্বগৌরবমূলক ভিত্তিহীন অভিমান দেখিতে পাওয়া যায়,---দেশ যত পুরাতন হয়, অভিমানের সংখ্যাও তত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজসাহীর ন্যায় প্রাচীন জনপদের পক্ষে দুই চারিটি ভিত্তিহীন অভিমান পোষণ করা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু তাহাকে ঐতিহাসিক তথ্যরূপে প্রচার করা অসঙ্গত হইয়াছে।

রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে রাজসাহীর প্রাচীনত্বের যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা একরূপ ভ্রমসঙ্কুল হইলেও, রাজসাহীর প্রাচীনত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই। এই জনপদ একদা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত

ছিল--- পৌণ্ড্রদেশ বহুপুরাতন, পুরাণাদিতে পরিচিত। তথায় যে বৌদ্ধ-কীর্ত্তিসমূহ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, হিয়োঙ্গ থ্সঙ্গের ভ্রমণ কাহিনীতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তূপ অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দান করে। পালবংশীয় বৌদ্ধনরপালগণ এই জনপদের নানাস্থানে দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রদত্ত অনেকগুলি তাম্রশাসন এই জনপদের উত্তরাংশে বর্ত্তমান দিনাজপুরের অধিকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং বোদালের গরুড়স্তম্ভে এখনও পাল নরপালবর্গের মন্ত্রিবংশের কীর্ত্তিকাহিনী খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেনরাজবংশের সুবিখ্যাত বল্লালসেনের পিতা বিজয় সেন দেব যে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক মহাদেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার প্রস্তরফলকও রাজসাহীতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মোসলমানেরা আসিয়া এই জনপদেই প্রথম রাজ্য সংস্থাপিত করেন এবং একদা বহু পাঠান জায়গীরদারগণ ইহার নানাস্থানে অট্টালিকা রাজবর্ত্ম ও ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করান চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজসাহীর দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ পুরাকালে জলমগ্ন ছিল ক্রমে বাসোপযোগী হইয়াছে, তাহা এক্ষণে পদ্মা নদীর উত্তরে অবস্থিত পশ্চিমাংশই বরেন্দ্র নামে,--প্রাচীর অন্তর্গত। যাহা বরেন্দ্রের অন্তর্গত তাহার মৃত্তিকাস্তর কঠিন, রক্তাভ, বহু প্রাচীন এবং পূর্ব্বকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও বহুকাল রাজসাহীর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দান করিবে। এসিয়াখণ্ডের জনপদসমূহের প্রাচীন সভ্যতার গর্ব্ব করিবার স্পর্দ্ধা আছে। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া সার্দ্ধ সহস্র বৎসর হইল তাহার অবনতি ও সহস্র বৎসর হইল তিরোধান সাধিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এসিয়াখণ্ডের যে ভূভাগে বৌদ্ধকীর্ত্তি, মন্দির চৈত্য বিহার বা বৌদ্ধ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইবে, তাহা যে পুরাকালে সভ্যজনপদ ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ থাকিবে না। রাজসাহীতে এই শ্রেণীর প্রাচীনত্বের প্রমাণের অভাব নাই। কিন্তু প্রাচীনত্ব মূলক ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের অভাবে রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ইহার প্রমাণ অযুক্ত রহিয়া গিয়াছে; যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কিম্বদন্তী জনশ্রুতি মাত্র।

পুরাকালে ভারতবর্ষের কোন্ বিভাগে, বিরাটাধিকৃত মৎস্যদেশ অবস্থিত ছিল, মনুসংহিতায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥

এই বর্ণনায় উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগ আর্য্যাবর্ত্ত নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে আধুনিক বাঙ্গালার বহুস্থান সমুদ্রগর্ভে নিহিত ও আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা রূপে পরিজ্ঞাত থাকায় বঙ্গভূমি আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে "ম্লেচ্ছদেশের" মধ্যে পরিগণিত হইত; কারণ বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থিত প্রদেশই আর্য্যাবর্ত্ত,—বাঙ্গালা বিন্ধ্যের উত্তরে অবস্থিতি করে না। এই আর্য্যাবর্ত্তই "যজ্ঞীয়দেশ" বলিয়া কথিত হইত। ইহার মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ, ব্রহ্মর্ষিদেশ ও মধ্যদেশ সবিশেষ সুপরিচিত।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥

সরস্বতী দৃষদ্বতী নদীমধ্যস্থ প্রদেশ ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ, উহা বর্ত্তমান পঞ্চনদ প্রদেশে অবস্থিত ছিল। তাহার পরই ব্রহ্মর্ষিদেশ, যথা :—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্ ॥

ব্রহ্মাবর্ত্তের পরেই ব্রহ্মর্ষিদেশ—তদ্দেশে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য পঞ্চাল এবং শূরসেনক রাজ্য অবস্থিত ছিল। শূরসেনক রাজ্যের প্রধান নগর মথুরা। সুতরাং ব্রহ্মর্ষিদেশ গঙ্গা যমুনার উভয়তীরবর্ত্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সরস্বতী নদীর অন্তর্ধান স্থানের পূর্ব্বে, প্রয়াগের পশ্চিমে, হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান মধ্যদেশ নামে কথিত হইত। যথা :—

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

এই বর্ণনা অনুসারে প্রয়াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ, তাহার পশ্চিমে ব্রহ্মর্ষিদেশ, এবং তাহারও পশ্চিমে ব্রহ্মাবর্ত্ত;—এই সকল স্থানের কোন অংশই বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত নহে। রাজসাহীনিবাসী পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মন্বর্থমুক্তাবলী নামক টীকাকার কুল্লুকভট্টই সকলের শীর্ষস্থানীয়। তিনি মনুসংহিতার টীকায় পঞ্চালকে কান্যকুব্জ ও শূরসেনককে মথুরাদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—মৎস্যদেশ তাহারই সীমাসন্নিহিত। মৎস্যদেশ বাঙ্গালার

অন্তর্ভুক্ত রাজসাহী রাজ্যের একাংশ হইলে, কৃষ্ণকান্ত সর্বাগ্রে তাহা সগৌরবে প্রচারিত করিতেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

ভারতী।

বৈশাখ, ১৩০৮।

মহিলা-সম্পাদিত মাসিক পত্র ভারতীর বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের মধ্যে সমধিক প্রবীনত্ব লাভ করিয়াছে। শ্রীমতী সরলা দেবীর হস্তে সম্পাদনভার ন্যস্ত হইয়া অবধি ভারতী ক্রমশঃ নূতন উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বৈশাখের ভারতীতে কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'সাগর সঙ্গম' কবিতা নববর্ষের নূতন দিবসের উপযোগী হইয়াছে। এবারকার প্রবন্ধ, উপন্যাস, সমালোচনা সমস্তই সুখপাঠ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিতের "উমর খাইয়ামের" পদ্যানুবাদ বঙ্গসাহিত্য-পাঠককে রুবায়াতের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচিত করিতে পারিবে। উমর খাইয়াম উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের উন্মত্ত প্রলাপ—স্থানে স্থানে নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল। কেবল সৌন্দর্য্যের খাতিরে যাঁহারা রুবায়াৎ পড়িবেন না, তাঁহারা বলিবেন—ভারতীর পত্রে এ সকল কবিতা মুদ্রিত হইতেছে কেন?

সাহিত্য।

বৈশাখ, ১৩০৮।

সাহিত্য দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। এবার ছবি ছাপা ও প্রবন্ধ-গৌরবে সাহিত্য নববর্ষে নবীনবেশে দর্শন দিয়াছে। ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবীর ও হিতবাদীলেখক শ্রীযুক্ত রামানন্দ ভারতীর ছবি বড় সুন্দর

হইয়াছে। মাতৃমূর্ত্তির ছবিখানি কলানৈপুণ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। চিত্রগৌরবের ন্যায় প্রবন্ধ গৌরব বর্দ্ধিত হইলে, সাহিত্য সুখপাঠ্য হইবে। কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কল্যাণী' কবিতাটি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

প্রবাসী।

বৈশাখ, ১৩০৮।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রবাসী বাঙ্গালীর উদ্যোগে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনকৌশলে নববর্ষের প্রারম্ভে এলাহাবাদ হইতে 'প্রবাসী' নামক একখানি নূতন মাসিক পত্র অভ্যুদিত হইয়াছে। নবীন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করি। আকারে প্রকারে প্রবাসী প্রায় প্রদীপের মতই মনোজ্ঞ বেশে সাহিত্যক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছে। এই মাসিকপত্র বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ উৎসাহলাভের যোগ্য। ইহা প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য চর্চ্চার সহায়তা করিবে,— আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশবাসী সমগ্র বাঙ্গালীসন্তানকে একসূত্রে বাঁধিবে এবং বঙ্গসাহিত্যের অধিকার সমধিক বিস্তৃত করিবার সহায়তা করিবে। রামানন্দ বাবু সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত, পত্রসম্পাদনেও অভ্যস্ত; তাঁহার পরিচালনাগুণে প্রবাসী যে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রদীপ।

বৈশাখ, ১৩০৮।

প্রদীপ ছবি ও ছাপা লইয়া নববর্ষেও গত বর্ষের ন্যায় জাঁকজমকে বাহির হইয়াছে। কিন্তু নববর্ষের প্রথম প্রবন্ধই শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের "কত দিন" নামক কবিতা— এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসপূর্ণ বিষাদব্যাকুলতা লইয়া কাব্যক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর 'কবিসম্ভাষণ' নামক কবিতা কবিবর রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লিখিত— স্নেহ ও সদ্ভাবে ইহার প্রত্যেক ছত্র সুরস ও সুকোমল হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে সহযোগী লেখকবর্গের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হওয়া এবং একে অন্যের সাহিত্যশ্রমের

মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারা বিলক্ষণ প্রয়োজন! দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালীর গালাগালি ও দলাদলি সাহিত্যক্ষেত্রেও দেদীপ্যমান। তাই মাঝে মাঝে একের লেখনী হইতে অন্যের উদ্দেশে লিখিত এইরূপ স্নেহ ও সদ্ভাব পূর্ণ রচনা পাঠ করিলে আনন্দ লাভ হয়।

নব্যভারত।

বৈশাখ, ১৩০৮।

নব্যভারত অষ্টাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। পুরাতন লেখকদলের সঙ্গে নূতন লেখকদল মিলিত হইয়াছেন,— কিন্তু নব্যভারত সেই পুরাতন ভাবেই বিভোর;— বিষয়নির্ব্বাচনে দার্শনিক প্রবন্ধের বাহুল্য নব্যভারতের একটি সুপরিচিত বিশেষত্ব!

আশ্রয়।

কার কোলে ধরা লভে পরিণতি ?
(সেই) অপার করুণা-সিন্ধু।
কারজ্যোতিঃ-কণা ব্রহ্মাণ্ড উজলে ?
(সেই) চির নির্ম্মল ইন্দু।
কারপানে ছোটে রবি-শশী-তারা ?
নাহিপথ ভ্রান্তি স্থির আঁখি তারা,
ভ্রমে যেন সাধু হ'য়ে আত্ম হারা ?
সে সচ্চিদানন্দ— বিন্দু।
কার নাম স্মরি দুখে পাই শান্তি ?
বিপদে পাই অভয় শোকে যায় ভ্রান্তি ?
কার মুখ কান্তি হরে ভব শ্রান্তি !
সেই নিখিল পরম বন্ধু।

শ্রীরজনীকান্ত সেন

এই শ্রেণীর পক্ষীগণের স্মরণ শক্তি অতীব বিস্ময়কর। ইহারা যে দেশ হইতে যে পথে একবার আইসে বর্ষে বর্ষে সেই একই পথে আসিয়া থাকে। আগমন পথের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাদিগের এই বৃত্তির প্রতি ভূগোল-বেত্তা ও ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের এতই বিশ্বাস যে ইহাদিগের ভ্রমণ পথের প্রতি লক্ষ্য করতঃ তাঁহারা ভূ পৃষ্ঠের প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে অনেক গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ভ্রমণকারী পক্ষীগণের মধ্যে কেহ বা জলরাশির ঊর্দ্ধ দিয়া কেহ বা স্থল ভাগের ঊর্দ্ধ দিয়া স্বীয় ভ্রমণ পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শেষোক্তগণের মধ্যে কেহ বা পর্ব্বত কেহ বা অরণ্য কেহ বা সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া আসিয়া থাকে। কালক্রমে ভূপৃষ্ঠের জলস্থলাদির অবস্থান পরিবর্ত্তন হইলেও ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং ইহাদিগের ভ্রমণ পথ পর্য্যালোচনা করিলেই ভূ পৃষ্ঠের প্রাচীন অবস্থা একাংশে অবগত হওয়া যাইতে পারে। জলরাশির ঊর্দ্ধদিয়া ভ্রমণ পথ নির্দ্ধারিত করা যে পক্ষীর স্বভাব, অদ্য তাহাকে স্থল ভাগের উপর দিয়া আসিতে দেখা গেল, ভুরা অবস্থায় অনুমান করা যাইতে পারে যে অত্রকার ঐ স্থল ভাগ গত কালে জল রাশি ছিল। এই রূপে নির্দ্দিষ্ট ভ্রমণকারী পক্ষীগণের ভ্রমণ পথ পর্য্যালোচনা করিলে ভূ পৃষ্ঠের অনেক প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। ক্রমশঃ।

শ্রীশশধর রায়।

প্রবাদপ্রসঙ্গ।

বহুপূর্ব্বে "ভারতীতে" প্রবাদপ্রসঙ্গশীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেখিয়া, কাব্য, পুরাণেতিহাস, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রভৃতিতে যে সকল প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। কিন্তু সমগ্র প্রবাদবাক্য ও যে প্রসঙ্গ হইতে উহার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মূল অনুসন্ধান করা সাধ্যা-

জনেরপক্ষে কতদূর অনায়াসসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। অদ্যাবধি আমি প্রায় সহস্রাধিক প্রবাদ বচন সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু সবগুলির মূল উদ্ধার করিতে পারি নাই। একজন কর্তৃক এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, তাই সুধী পাঠকগণ সমীপে আমার সানুনয় অনুরোধ— তাঁহারা যে সকল প্রবাদবাক্যের মূল জানেন, কৃপা করিয়া আমাকে লিখিলে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইব। অদ্য আমরা কতিপয় প্রবাদবাক্য উৎসাহের পাঠকগণকে উপহার দিলাম, সবগুলিই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। আমি লোকমুখে এবং পুস্তকাদিতে যখন যে প্রবাদটী শুনিতে বা দেখিতে পাইয়াছি, তখনি সেটী লিপিবদ্ধ করিয়াছি,— সাজাইয়া লিখিবার সময় ও সুযোগ পাই নাই। তাই আপাততঃ পাঠ করিতে কিছু খাপছাড়া লাগিতে পারে কিন্তু পাঠকগণের রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা অতি কম। হইলেও তৎপ্রতীকারে যত্নবান্ হওয়া এখন আমার পক্ষে অতীব দুরূহ। প্রবাদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বাসনা আছে, যদি ঘটিয়া উঠে তবে সেই সময় একের সহিত অপরের মিল রাখিয়া সাজাইয়া দিব।

ইংরাজী প্রোভার্ব (Proverb) আর বাঙ্গালা প্রবাদ এক নহে। Proverbকে প্রবচন বলা যাইতে পারে। প্রবচনও প্রবাদ হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত প্রবচনই প্রবাদ নহে। বড় বড় কোবিদ্গণ লোকশিক্ষার্থে যাহা বলিয়া গিয়াছেন (Sayings of greatmen) তাহাই প্রবচন, আর কোন ঘটনা উপলক্ষ করিয়া যে কথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই প্রবাদ। যেমন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"কে প্রবচন বলে এবং "গোবধের সময় খুড়ো কর্ত্তা"কে প্রবাদ বলে। খুড়ো (খুল্লতাত) কি কর্ত্তা হইতে পারে না? অবশ্য পারে। কিন্তু এই উক্তি সংসৃষ্ট ঘটনা জানিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে না।

প্রবাদ এবং প্রবচনের মধ্যে আর একটু পার্থক্য এই যে, প্রবাদ সাধারণতঃ সকল শ্রেণীর লোকের নিকটেই পরিচিত কিন্তু প্রবচন কেবল শিক্ষিত সমাজে সীমাবদ্ধ।

আমি ভিন্ন ভিন্ন জেলার লোকের নিকট হইতে প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছি, যে প্রবাদ এবং তৎসংসৃষ্ট গল্পটী তিনচারি জেলার লোকের নিকটই

শুনিয়াছি সেইটী প্রবাদরূপে গ্রহণ করিয়াছি। প্রবাদ বাক্যের মূল উদ্ধার করিতে পারিলে বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ উপকার সংসাধিত হইবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চপাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে একদা তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে এক গহন কাননে প্রবিষ্ট হন। অত্যন্ত পরিশ্রমহেতু তাঁহারা সকলেই তৃষ্ণানুভব করেন কিন্তু নিকটে কুত্রাপি পানীয় না থাকায়, যুধিষ্ঠির অনুজভীমকে অন্বেষণ করিয়া জলমানার্থে আজ্ঞা করেন। ভীম ভ্রাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তে অম্বু অন্বেষণে নির্গত হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, প্রস্ফুটিত শতদলবিরাজিত স্বাদু-স্বচ্ছ সুনির্মল সলিল সমান্বিত একটি সুবিস্তৃত সরোবর দেখিতে পাইলেন। ভীম তদ্দর্শনে পুলকিতান্তঃকরণে পানার্থ সলিল স্পর্শ করিলে এক যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করে। তিনি তাহার যথাযথ উত্তর দিতে না পারায় যক্ষ তাঁহাকে ভক্ষণ করে। এদিকে ভীমের প্রত্যা-গমনে বিলম্ব দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে সেই সরোবর তীরে উপনীত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পানার্থ অঞ্জলি পূরিয়া জলোত্তোলন করিতে উদ্যত হইলে, পুনরায় সেই যক্ষ আসিয়া ধনঞ্জয়কেও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিরীটিও তাহার উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায় যক্ষ-উদর-বিবরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই প্রকারে নকুল সহদেবকেও যক্ষ তাহার অতল-উদর-নিশাদে স্থান দান করে। সকলেরই ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই সরোবরতীরে উপনীত হন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া যক্ষ বলিল,—'যদি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হও, তবে তুমি জলপান করিতে ও তোমার ভ্রাতৃগণের মুখাবলোকন করিতে পারিবে; নতুবা তোমাকেও তাহাদের পথের পথিক করিব'। তৎপরে যক্ষ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, ধর্ম্মরাজ পাণ্ডবকুলের জীবন মরণের সমস্তাস্থলে— উত্তর করেন,—

বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ
নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥*

ন যযৌ ন তস্থৌ।

মহাদেব কর্ত্তৃক কন্দর্প ভস্মীভূত হইলে পার্ব্বতী স্বীয় রূপের নিন্দা করতঃ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ধূর্জ্জটীর প্রতি আসক্তচিত্তে হিমাচলশিখরে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। কিয়দ্দিবস পর স্মরে পরিতুষ্ট হইয়া শম্ভু কৃষ্ণমৃগাজিন পরিধান ও হস্তে পলাশদণ্ড ধারণ করতঃ ব্রহ্মতেজে উদ্ভাসিত হইয়াই যেন গৌরীসকাশে উপনীত হইলেন। গঙ্গাধর সতীর মন পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ত্রিলোচনের নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। তচ্ছ্রবণে পার্ব্বতী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যে ব্যক্তি সাধুগণের নিন্দা করে, কেবল সেই প্রত্যবায়গ্রস্ত হয় তাহা নহে, যে শ্রবণ করে তাহাকেও পাপের ভাগী হইতে হয়। অতএব এই মূঢ়কে ভোলানাথের নিন্দা করিতে নিষেধ কর। অথবা "আমি এ স্থান ত্যাগ করি" এই বলিয়া গমনোদ্যতা হইলে, তাঁহার স্তন হইতে বল্কল খসিয়া পড়ে। মহাদেব ও সেই সময় নিজমূর্ত্তি ধারণ করেন। শৈলরাজদুহিতা তখন—

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টিং
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥†

তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতা ও স্বেদসলিলসিক্তা হইয়া গমনের নিমিত্ত উত্তোলিত চরণ তদবস্থায় রাখিয়া, পথিমধ্যে শৈলপ্রতিঘাত প্রতিহত তরঙ্গিণীর ন্যায় অগ্রসর হইতে কিম্বা প্রস্থান করিতে পারিলেন না।

যাঁহা ৫২ তাঁহা ৫৩।

এক তস্কর ব্রাহ্মণ, নারী, বালক প্রভৃতিতে ৫২টী প্রাণী বধ করনান্তর মনে মনে চিন্তা করিল,— অনেক হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ৫২টী হত্যা করিয়াছি।

---

* মহাভারত।

† কুমার সম্ভব।

এখন একবার তপস্যার মনোনিবেশ করি। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তস্কর গৈরিক বসন পরিধান পূর্ব্বক গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, এক পাপিষ্ঠ এক অসহায়া রমণীর সতীত্বরত্ন লুণ্ঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছে, আর সেই কামিনী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। তস্কর-সাধু এদৃশ্য দেখিতে পারিল না;—সতীর করুণ আর্ত্তনাদ তাহার অন্তস্তল বিদ্ধ করিল। সে একখণ্ড কাষ্ঠ উত্তোলন পূর্ব্বক "যাহা ৫২ তাঁহা ৫৩" বলিয়া পাপিষ্ঠের শিরোপরি সবেগে নিক্ষেপ করিল,—নরাধম পাপকলেবর ত্যাগ করিল। এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ৫২টা খুন করিলেও যে পাপ হয় ৫৩টিতেও সেই পাপ হয়। কেমন ৫২র পরবর্ত্তী অঙ্কই ৫৩।

স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।

(মূর্খঃ পুত্রো বসৈঃ সমঃ।)

এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সারাদিন ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইত তদ্দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উদর পূর্ণ হইত না। অনন্তর একদা ব্রাহ্মণ পত্নীকে বলিল,—"চল আমরা সঙ্গীত গাহিয়া জীবন ধারণের উপায় করি গে। ভিক্ষাতে আর দিনপাত হয় না,—কষ্টও আর সহ্য করা যায় না।" পেটের দায় বড় দায়, স্ত্রী স্বীকৃতা হইল।

ব্রাহ্মণ পত্নী সমভিব্যাহারে এক রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাজ সমীপে স্বীয় মনোগত ভাব ব্যক্ত করিল। রাজা ব্রাহ্মণের কাতর অনুনয়ে তাহার সঙ্গীত শ্রবণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সন্ধ্যা পর গান আরম্ভ হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান হইল। ব্রাহ্মণ পেটের দায়ে অতি উৎসাহের সহিত সঙ্গীত গাহিতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণী আর পারে না। একেত কোন দিন অভ্যাস নাই তদুপরি তিন প্রহর কাল ক্রমাগত গাহিতেছে, কাজেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ দেখিল ঘোর বিপদ, এখন যদি গানে ভঙ্গ দিই তবে পুরস্কার পাইব না,—সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইবে। তাই তিনি পত্নীকে সান্ত্বনাছলে বলিলেন,—

গতা বহুতরা কান্তে স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্ব্বরী।
ইতি চিত্তে সমাধায় কুরু সঙ্গীত রঞ্জনং॥

হে প্রিয়ে! রজনী আর অধিক নাই, অধিকাংশ ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া সজ্জনদিগের মনোরঞ্জন কর।

ব্রাহ্মণ এই শ্লোক বলিবামাত্র, রাজপুত্র তদীয় গাত্র হইতে বহুমূল্য শাল উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিলেন। রাজকুমারী তাঁহার কণ্ঠের মুক্তার হার প্রদান করিলেন এবং কোটাল—(নগর রক্ষক) পুত্র ইদৃশদ্রুত-বেগে আসিয়া তাহার পিতার গণ্ডস্থলে এক ভীষণ চপেটাঘাত করিল আর কোটাল অমনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাজা এই বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া গান ভঙ্গ করিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ আদেশ পালিত হইল। পরে রাজা পুত্রকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি এই শ্লোকের দ্বারা এমন কি শিক্ষা পাইলে যে, তুমি বহুমূল্য বস্ত্রখানি ব্রাহ্মণকে দান করিলে?

পুত্র বলিলেন,— "আমি স্থির করিয়াছিলাম যে অদ্য রজনীতে আমি আপনাকে নিহত করিব, কারণ আমি উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন না। আমি এই শ্লোকের দ্বারা এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, অনেক দিবসই গত হইয়াছে, আপনি আর কত দিবসই বা জীবিত থাকিবেন। এই স্বল্প কালের নিমিত্ত আপনাকে হত্যা করিয়া কেন পিতৃ-হত্যা পাপে পরিলিপ্ত হই।"

তৎপর রাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তুমি কেন ব্রাহ্মণকে মালা প্রদান করিলে?"

রাজদুহিতা বলিলেন,— "আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, অদ্য রাত্রিতেই আমি গৃহ ত্যাগ করিব, কারণ আমি বিবাহের বয়স্থা হইলেও আপনি আমাকে সৎপাত্রে অর্পণ করেন নাই কিম্বা সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করিতেছেন না। আমি এই শ্লোকের দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করিলাম যে, অনেক দিনই অতীত হইয়াছে, অচিরেই বিবাহ হইবে। সুতরাং এই অল্পকালের নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কেন কুলে কলঙ্ক কালিমা লেপন করি।"

তাহার পর রাজা কোটাল পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তুমি কেন

তোমার পিতাকে প্রহার করিলে ?"

কোটাল পুত্র বলিল,—"মহারাজ! পিতা আমাকে বাল্য কালে লেখা পড়া শিখান নাই। ব্রাহ্মণ এই শ্লোকটি বলিলে রাজপুত্র ও কন্যা তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন, কিন্তু আমি তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেও পারিলাম না। ইহাতেই আমার ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল এবং তজ্জন্য আমি তাঁহাকে প্রহার করিয়াছি।"

অবশেষে রাজা কোটালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে পুত্র তোমাকে প্রহার করিল তুমি সেই পুত্রকেই ক্রোড়ে লইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে কেন ?"

কোটাল বলিল—"মহারাজ! মূর্খপুত্র যমের সমান। তবে আমাকে একেবারে হত্যা না করিয়া কেবল এক চপেটাঘাত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছে ইহাতেই আমি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি।"

* *
*

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

একদা রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার প্রজাকুলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার নিমিত্ত ছদ্মবেশে রওনা হইলেন। দুই দিবস পর এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া 'কার্ত্তিক' নামে পরিচয় দিয়া খানসামাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কার্ত্তিক আছে,—খানসামার কার্য্য করে, আর গোপনে সকলের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করে। সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে অন্যদেশের এক রাজার কন্যা আসিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। একদা গ্রামান্তর হইতে ব্রাহ্মণের এক খানি নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। ব্রাহ্মণ পুত্রকে বলিল, "বাবা, একটি নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, গেলে কিঞ্চিৎ পাওনা হইবে,—সেইজন্যই আমি যাইতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। কল্যই আসিব তুমি আজকার দিনটা রাজকুমারীকে পড়াইও।" পুত্র সম্মত হইল, ব্রাহ্মণ রওনা হইল।

অপরাহ্নে ব্রাহ্মণতনয় রাজনন্দিনীকে পড়াইতেছেন। নৃপদুহিতা এক উচ্চাসনে আসীনা, আর এ যুবা কুমার নিম্নে কম্বলাসনে উপবিষ্ট। নিদিষ্ট

লিখিতে হঠাৎ রাজকুমারীর হস্ত হইতে লেখনী স্খলিত হইয়া নিম্নে পতিত হইল। ব্রাহ্মণকুমার উহা উত্তোলন করিয়া তাঁহার হস্তে দিলে, কুমারী বলিলেন,— "আমি বড় উপকৃত হইলাম।"

"উপকারের প্রত্যুপকার করা বিধেয়।"

"প্রত্যুপকার কি করিব?"

'যদি আপনি প্রতিপালন করিবেন প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি।'

'নিশ্চয়ই প্রতিপালন করিব,— আপনি আদেশ করুণ।'

'আমি আপনাকে বিবাহ করিব।'

'তথাস্তু।' অনন্তর অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, তিন দিবস পর নিকটবর্ত্তী এক শিবমন্দিরে রজনীতে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ বন্ধনে নিগড়িত হইবে, স্থির হইল। কার্ত্তিক গোপনে সব শুনিলেন ও দেখিলেন।

পরদিবস ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিল। কার্ত্তিক তাহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। বিবাহের ধার্য্যদিবসে সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণ পুত্রকে বলিল,— "বৎস, বাক্স হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া আন কার্য্য বাধিয়াছে।" পুত্র টাকা আনিতে গৃহে প্রবেশ করিলে, কার্ত্তিক বাহির হইতে গৃহের শিকল বদ্ধ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণতনয় অবরুদ্ধ হইল।

তৎপর কার্ত্তিক সেই পূর্ব্বকথিত শিবমন্দিরে যাইয়া এক কোণে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর রাজকন্যা তথায় উপস্থিত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণের জ্ঞানে কার্ত্তিকের গলায় বরমালা প্রদান করিলেন। কার্ত্তিক কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—

গুণোচ্ছন্নং বরমালা দানে
দ্বিজায় প্রদত্তং খলু কার্ত্তিকায়।
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥

কাব্যে ইতিহাস।

কোনও একজন সহৃদয় ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, যে ইংলণ্ডের প্রত্যেক বিভাগ এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগুলির পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ইংলণ্ড অপেক্ষাও বিস্তৃত জনপদগুলির কোনও ইতিহাস বর্ত্তমান নাই।* প্রকৃত জাতীয় ইতিহাসের অভাবেই আমরা যে অধঃপতনের নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে অবতরণ করিতেছি তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের প্রকৃত ইতিহাস নাই বলিয়া বিদেশীয় মনস্বীগণ কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে আমরা বল্কল পরিধান তৃণ পত্রে শয়ন এবং মৃৎপাত্রে ভোজন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেও দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। আমরা ইতিহাস লিখি না— লিখিবার চেষ্টাও করি না। অতীত ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব পুনরুদ্ধার কার্য্যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রম অপব্যয় না করিয়া, যাহাতে বরং দুই দশ পয়সা রোজগার করিয়া, দশের মধ্যে একজন হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারি, তদ্বিষয়েই সচেষ্ট হই। যাহা হইয়াছিল তাহা হইয়াছিল, যাহা হয় নাই তাহা হয় নাই, এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকিয়া আমরা বেশ আছি— কি হইয়াছিল এবং কি না হইয়াছিল—হইয়া থাকিলে কেন হইয়াছিল, এবং না হইয়া থাকিলে কেন হইয়াছিল না, তাহার মূলানুসন্ধান করিতে যাইয়া মস্তিষ্ক কণ্ডূয়ন উৎপাদন করিতে আমরা বড়ই নারাজ। দুই একজন চেষ্টা এবং যত্ন করিয়া যে দুই এক পাতা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারও জীর্ণ কঙ্কাল উপেক্ষা এবং অনাদরে কীটদষ্ট হইয়া, ধূলিরাশিতে পরিণত হইতেছে। দুই এক ছত্র যাহা কুড়াইয়া পাইতেছি তাহা পড়িয়াই আমরা কত না বিস্ময় প্রকাশ করিতেছি।

---

* "Every county, almost every parish in England, has its annals; but in India, vast provinces, greater in extent than the British Islands, has no individual history whatever."

Sir W. W. Hunter.

দেশের প্রকৃত ইতিহাসের এইরূপ অভাব যে জাতীয় অবনতির একটি প্রধান কারণ তাহা বোধ হয় এখন আমরা দেখিয়া শুনিয়া কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইতিহাসের অভাব অপেক্ষা, অনুদার, পক্ষপাতি, বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের স্বার্থসিদ্ধি কল্পে সূচিত, কিম্বদন্তী অবলম্বনে রচিত, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত পূর্ণ ইতিহাস সকল বিদেশীয়দিগের নিকট আমাদিগকে আরও হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে। আমরা আবার তাহারই দুই এক খানির অন্ধ অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করিয়া আত্মজ্ঞান গরিমায় কত না আস্ফালন করিতেছি, এবং তাহারই জয়পতাকা উড়াইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস [illegible] [illegible] নিতান্ত একখানি অনুবাদ বাহির হইল না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বয়স বিবেচনা করিয়া দেখিলে [illegible] উপন্যাস ও কাব্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দিন দিন কত উপন্যাস কত নাটক প্রকাশিত হইতেছে [illegible] কত ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় চরিত্র সংগঠনের একটি প্রধান উপায়। সাহিত্য যেরূপ বীজ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিবে পাঠকদিগের হৃদয়ে সেইরূপ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। আমাদের দেশের সাহিত্যসেবী কৃতবিদ্যগণ, যে দিন দিন কত না উপন্যাস ও নবন্যাস সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং বংশধরদিগের তৎপ্রতি অপরিসীম অনুরাগ, এবং ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর অনুচিত বিরাগ, জন্মাইয়া দিতেছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবদেহের কোনও একটি অঙ্গ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। উপন্যাস ও কাব্য যে সাহিত্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিবে, যে সাহিত্যে বিজ্ঞান কিম্বা ইতিহাসের কখনও উপযুক্ত আদর হইবে না—চিরকালই অনাদৃত থাকিবে। জাতীয় সাহিত্য একদেশদর্শী হইলে, জাতীয় ভাষা ও জাতীয় প্রতিভা ও একদেশদর্শিনী হইবে। ভাষা ও প্রতিভা সর্ব্বপথগামিনী না হইলে, জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? "কাব্য ও উপন্যাসে অনুরাগোদ্দীপিকা, এবং ইতিহাস ও বিজ্ঞানে অযথা বিরাগ ভাষা ও সাহিত্যকে একদেশদর্শী করিয়া, বঙ্গীয় পাঠকের মনোবৃত্তি

যেরূপ সঙ্কীর্ণতা সাধন করিতেছে, অন্য দিকে কাব্য ও উপন্যাসে বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের বিকৃত আলোচনা, তাহাদের মনে [illegible] প্রেম এবং অলীক বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতেছে। কাব্য ও উপন্যাস [illegible]নের সমাজের অনেক সংস্কার সাধন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা বলিয়া, কবি যদি ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য লিখিতে বসিয়াও, "কবির পথ নিষ্কণ্টক" এই সমর্থন বাক্যে নির্ভর করিয়া, কল্পনা কৌশলে মূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলেন, তবে তাহা অমার্জ্জনীয়। "ঐতিহাসিক চিত্রচয়নে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ" হওয়া, কোনও ক্রমেই উচিত নহে। ভারতীর বরপুত্র নাটকুল চূড়ামণি মহাকবি সেক্সপিয়র যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি কোনও মূল ঐতিহাসিক ঘটনার কিছুই পরিবর্ত্তন করেন নাই। যে ঘটনা সমসাময়িক সমাজের অথবা ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের পরিচায়ক, তাহার কোনও রূপ পরিবর্ত্তন অনুমোদন করিতে পারা যায় না। ক্রমওয়েল বলিয়াছিলেন, "আমি যেমন আছি ঠিক সেইরূপ চিত্র কর, নতুবা আমি তোমাকে এক পেনিও দিব না।" * ঐতিহাসিকচিত্র চয়নেও এই মহাবাক্য স্মরণ রাখিয়া, আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

আদর্শ ভাল হইলে তাহার অনুকরণও ভাল হয়। মহাকবি সেক্সপিয়রের আদর্শে, পরবর্ত্তীযুগেও যে সমস্ত [illegible] মনস্বীগণ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক অথবা উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও স্বপ্রণীত পুস্তকে সেই সমুদয় ঘটনায় ঐতিহাসিকতা রক্ষা করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। ইতিহাস অবলম্বনে উপন্যাস লিখিতে বসিয়া, "গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে", ইত্যাদিরূপ ভূমিকা গাহিয়া, যথেচ্ছারূপ ঐতিহাসিক-

* "Paint me as I am" said Oliver Cromwell white sitting to young Lily. 'If you leave out the scars and wrinkles, I will not pay you a shilling'.... ... ... If men truly great knew their own interest, it is thus that they would wish their minds to be portrayed.

Macaulay.

তার ব্যতিক্রম করিলে, ইতিহাস কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা উদ্দেশ্য না হইলে, উপন্যাসলেখক মহাশয়েরা যদি ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া, কল্পনা প্রসূত উপকরণ লইয়া, গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে অনেক মৃত মহাত্মার প্রেতাত্মা কত অলীক এবং কঠোর আক্রমণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। "উপন্যাস লেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ" না হইতে পারেন, কিন্তু "ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, সত্যের আশ্রয় লইতে পারেন" কি না, সন্দেহ। "উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন" না হইতে পারে; কিন্তু কল্পনা প্রভাবে কবি যদি অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা সমূহ সৃজন করিয়া, পিশাচকে নরদেবতারূপে, এবং দেবতাকে নরপিশাচরূপে, সাধারণের নিকট উপস্থিত করেন, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে, যে মহাত্মা জনসাধারণের নিকট স্বয়ং ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া পূজিত, সেই আদর্শ চরিত্র শ্রীকৃষ্ণও যখন পৌরাণিকদিগের এবং উত্তরকালে রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ এবং যাত্রার অধিকারী মহাশয়দিগের হস্তে পড়িয়া, কত [illegible] হইয়াছেন, তখন যাঁহারা সামান্য মানুষ [illegible] যে কল্পনাকুশল উপন্যাসিক মহোদয়দিগের উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা প্রভাবে [illegible] বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? মহম্মদ এবং খ্রীষ্টকে রঙ্গালয়ে নট সাজাইয়া উপস্থিত করিলে, মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয় সমাজ কিছুতেই তাহা সহ্য করিত না। আর আমরা কি করিতেছি----- বেশ্যাভিনীত রঙ্গমঞ্চে [illegible], ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মদিরাক্ত নেত্র যুবক শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া, যমুনাবিলাসিনী, গোপিনীবেশিনী বারবিলাসিনীগণের বসনাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে, এবং তাহা দেখিয়াই উচ্চ করতালিধ্বনিতে রঙ্গালয় নিনাদিত করিতেছি; এবং বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে সহস্রকণ্ঠে বাহবা দিতেছি। হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিনব এবং অত্যাশ্চর্য্য এবং উপন্যাস সৃজন করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তীযুগের কবি এবং কেরা স্ব স্ব পুস্তকে তাঁহারই ছড়াছড়ি করিয়া, "ঈদৃশ সর্ব্ব" পাপ সংস্পর্শশূন্য আদর্শ চরিত্র'কেও 'বাল্যে চোর, কৈশো

এবং পরিণত বয়সে বালক ও শঠ করিয়া তুলিয়াছেন।* ইতিহাস লিখিতে বসিয়াও, কল্পনার তীব্র তাড়নায় দুই দশটা নূতন কথা বসাইয়া দেওয়া অভ্যাসটা আমাদের দেশের লেখকদিগের মধ্যে অতি পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, ও সেই জন্যই রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থও এত অনৈসর্গিক ঘটনায় পরিপূর্ণ যে অনেকেই ঐ দুইখানি পুস্তককেও ইতিহাস বলিয়াই গ্রহণ করিতে চাহেন না। যে টুকু বাকী ছিল কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস পূরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইউরোপে কাব্য ও উপন্যাস ইতিহাস চর্চ্চার সহায়তা করে, কিন্তু এই হতভাগা দেশে কাব্য ও উপন্যাস ইতিহাস অনুশীলনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও সেই জন্যই আজ ইউরোপীয়েরা এত উন্নত, এবং আমরা এত অবনত।

কোন ব্যক্তি অথবা জাতির ইতিহাস লইয়া উপন্যাস লিখিতে হইলে, মূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি বিপর্য্যস্ত না করিয়া, উপন্যাসের খাতিরে একটু রঞ্জিত করিলে বিশেষ দোষের কারণ হইতে পারে না --- বরং না করিলে উপন্যাস, ইতিহাসের ন্যায়, নীরস ও কর্কশ হইয়া পড়ে। কিন্তু "ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, কল্পনার আশ্রয়" লইতে যাইয়া, কবি ঐতিহাসিক জাজ্জ্বল্যমান সত্যের কতদূর অপলাপ করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা যথেষ্ট দেখিতে পাই। হিন্দুকুলগৌরব পুণ্যকীর্ত্তি মহারাণা প্রতাপ সিংহ স্ত্রী-পুত্র ক না লইয়া পর্ব্বত কন্দর অরণ্যে বাস ও ফলমূল ভক্ষণ

---

* "পুরাণকারের অভিপ্রায় কদর্য্য নয়। ঈশ্বর প্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং ইতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। তাঁহার প্রণীত ভগবদ্ভক্তি পঙ্কজের মূল অতল জলে ডুবিয়া রহিল উপরে কেবল বিকসিত কামকুসুমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে — তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুসুমদামের মালা গাঁথিয়া ইন্দ্রিয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেবের হাতে তাহা মদন ধর্ম্মোৎসব। এক কাল আমাদের দেশ সেই ভারাক্রান্ত।" কৃষ্ণ চরিত্র ১৫৬ পৃষ্ঠা।

করিয়া, অন্তিমে সমস্তজীবন প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলসম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া, "তুর্কিকে কখনও কন্যাদান করিব না" এই মহাপ্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, আর কবি উদ্দাম কল্পনা প্রভাবে তাঁহারই কন্যা* সৃজন করিয়া, তাহাকে ভীল গৃহে লালন পালন করিয়া অবশেষে মহাবাণার চিরশত্রু যবনসম্রাট আকবরের পুত্র সেলিমের প্রেমোন্মাদিনী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কায়স্থকুলতিলক সীতারাম রায় বঙ্গদেশে মোগল শাসনের শৈথিল্য দেখিয়া, পুনরায় হিন্দুরাজ্যসংস্থাপনের আশায় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, অবশেষে মুর্শিদ কুলী খাঁর শাসন সময় মন্ত্রণাকুশল দেওয়ান রাইরাইয়ান রঘুনন্দনের বুদ্ধি কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিলেন; কবি সেই বাঙ্গালী বীরকেও আধুনিক কুবের সন্তানদিগের ন্যায় অত্যাচারী প্রমোদউদ্যানবিহারী বিলাসলোলুপইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছেন।[১]

হতভাগ্য তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলা মোগল সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমরণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, বিদ্রোহী দলের চক্রান্তে রাজ্যভ্রষ্ট এবং নিহত হইয়াছিলেন; কিন্তু কবি "সময় স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া" সরফরাজ (১

---

* অশ্রুমতী

(১) "লোকে বলে, নবাব সরফরাজ খাঁ আশাস্তহৃদয়ে জগৎশেঠের পুত্রবধুর মুখাবলোকন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গিরিজার যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন;— কবি সেই জনশ্রুতি লতাপল্লবে সুশোভিত করিয়া সিরাজদ্দৌলার স্কন্ধে আরোপ করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন

"————কি বলিব আর,
শেঠেদের বংশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল ফুল সব—— প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন ভাস্কর-সম ভূভারত জুড়ে
প্রজ্জ্বলিত,— সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা সঞ্চার।"

সিরাজদ্দৌলা ৩৬ পৃষ্ঠা।

সকতজঙ্গ (২) মীরজাফর (৩) এবং মীরকাশিমের (৪) অপকীর্ত্তিগুলিও তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া, তাহাকে কামাসক্ত, সুরাসক্ত, পরস্বাপহারী, এবং নরশোণিত লোলুপ নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।* কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেরই এক কৈফিয়ত—"আমাদের গ্রন্থ কাব্য অথবা উপন্যাস-ইতিহাস নহে।" এরূপ কৈফিয়তের পর, ইতিহাস প্রচার

"শেঠবংশধর দিগের মধ্যে কেহই এ কলঙ্ক কাহিনী স্বীকার করেন নাই।" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য বোধে আমরা আর উল্লেখ করিলাম না।

(২) "সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই সিরাজদ্দৌলা পান দোষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পলাশীর পটমণ্ডপে তিনি যখন একাকী চিন্তামগ্ন, সেই সময়ের চিত্রপট উদ্ঘাটন করিবার জন্য কেবল তাঁহার স্বদেশীয় কবিই লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

'ঢাল সুরা স্বর্ণপাত্রে ঢাল পুনর্ব্বার
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান;
খাও ঢাল, ঢাল খাও, প্রেম পারাবার
উথলিবে, লজ্জাদীপ হইবে নির্ব্বাণ' ইত্যাদি।

ষ্টুয়ার্ট গোলাম হোসেনের পদানুসরণ করিয়া নবাবগঞ্জের যুদ্ধ শিবিরে শওকত জঙ্গের যে অসাধু চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন ইহা কি তাহারই প্রতিবিম্ব নহে? কিন্তু সিরাজদ্দৌলার কপাল! ষ্টুয়ার্ট পড়িয়াও তাহার স্বদেশের কবি নবাবগঞ্জের শওকত জঙ্গের চিত্রপটখানি পলাশীর সিরাজ-দ্দৌলার চিত্রপট বলিয়া প্রচার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না।" সিরাজদ্দৌলা ৩৬৩, ৩৬৪ ও ৩৬৫ পৃষ্ঠা।

স্বনাম খ্যাত ঐতিহাসিক Beveridge সাহেবও বলেন :—

"He used to drink, but he gave up this habit in accordance with a promise which he made to Alivardi on his death-bed."

(৩) "সিরাজদ্দৌলার অদৃষ্ট বিড়ম্বনা! ঘসেটি বেগম সিরাজদ্দৌলার

করাও যে তাঁহাদের কতকটা মনোগত উদ্দেশ্য, এরূপ সিদ্ধান্ত করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাদের মুখেও কখন কখন আমরা অন্যরূপ কথা শুনিতে পাই, যথা :—

"বঙ্গ ইতিহাস হায় মণি পূর্ণ খনি;
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি বল কুহকিনি!
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত?"*

একটা কিছু কৈফিয়ত দিয়া কবি বেকসুর খালাস পাইতে পারেন, কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি সঙ্কল্পে তাঁহারা জাতীয় ইতিহাসের যে ক্ষতি করিয়া যাইতেছেন,

---

* পলাশীর যুদ্ধ ২য় সর্গ ১৭শ শ্লোক।

জননীর সহিত সসম্ভ্রমে রাজান্তঃপুরে বসতি করিলেন, পলাশীর যুদ্ধাবসানে মীরজাফরের সুশাসনে ঢাকায় কারারুদ্ধ হইলেন, অথচ ইতিহাসে তাহার সমুচিত সমালোচনা না হওয়ার কল্পনাকুশল বাঙ্গালী কবি অবলীলাক্রমে সিরাজশিবিরে ঘসেটি বেগমের প্রেতাত্মাকে উপনীত করিয়া তাঁহার মুখে সিরাজদ্দৌলাকে শুনাইয়া দিলেন :—

'সিরাজ, তোমার আমি পিতৃব্য কামিনী;
হরি মম রাজ্যধন, করি দেশান্তর,
অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী;
কেমনে রাখিবি ধন, এবে চিন্তা কর'।

সিরাজদ্দৌলা ২২৪ ও ২২৫ পৃষ্ঠা।

(৪) "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার শিবচন্দ্র ইংরাজের পক্ষাবলম্বী বলিয়া নবাব মীরকাশিমের আদেশে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় মঙ্গীর দুর্গে কারারুদ্ধ থাকিয়া ইংরাজকৃপায় মুক্তি লাভ করেন। কবি সময় স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া সিরাজদ্দৌলাকেই তাহার জন্য অপরাধী সাজাইয়া "কোনও একজন বঙ্গসাহিত্য সমাজে সুপরিচিত বন্ধুর মুখে" শুনিয়াছেন বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।" সিরাজদ্দৌলা ৩৬৬ ও ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

তাহা সংশোধিত হইয়া প্রকৃত ইতিহাস প্রচার হইতে এখন বহুকাল গত হইবে। বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কত না অলীক ঘটনা-বলীর অবতারণা করিয়া, এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাস বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। যেটুকু বাকী ছিল, অস্মদ্দেশীয় ভারতীয় বরপুত্রগণ কল্পনা প্রভাবে পূরণ করিয়া দিতেছেন। জাতীয় ইতিহাস এরূপে বিকৃত হইলে, আমাদের জাতীয় উন্নতি সুদূর পরাহত।

বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু আবার একটু স্রোত ফিরিয়াছে। দুই একজন কৃতবিদ্য বঙ্গসন্তান দেশের প্রকৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধার কল্পে যেরূপ স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া, কোন ভবিষ্যৎ বংশধর যে এই হতভাগ্য জাতির করুণ কাহিনী গাহিয়া, নিদ্রিত বঙ্গসন্তানকে সজাগ করিয়া তুলিবে না, তাহা কে বলিতে পারে!

শ্রীজ্ঞানদানন্দ সেন।

"সীতা।"*

তৃতীয় দৃশ্য--- শ্রুতকীর্ত্তির পিত্রালয়।

(সমালোচনা)

যে জাতি যতই সভ্য হয় তাহার সাহিত্যও ততই উন্নত হইতে থাকে। জাতির অঙ্গপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যেরও অঙ্গপুষ্টি হয়। রুচিই সভ্যতার পরিচায়ক। সুরুচি সম্পন্ন সভ্যজাতির সাহিত্যেও সুরুচিপূর্ণ। তাই জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় চরিত্রের পরিমাপক। কিন্তু জাতীয় সাহি-

* নব্যপ্রভা, ভাদ্র ১৩০৮।

তের উদ্দেশ্য জাতীয় শিক্ষা-বিধান; জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য জাতীয় উন্নতি।

বঙ্গভাষায় "উন্নতি" শব্দের ঠিক অর্থ করিতে পারেন এমন পণ্ডিত বোধ হয় জন্ম গ্রহণ করেন নাই। "উন্নতি"কে যখন যেভাবে লাগাইবে, উহা তখন সেই ভাবেই লাগিবে। আমি এস্থলে "জাতীয় উন্নতি" বলিয়া জাতীয় অর্থোন্নতি বা অন্য কোন প্রকার উন্নতি বুঝাইতে চাহিতেছি না। আমি বলিতেছি জাতিবিশেষের চরিত্রোন্নতি। চরিত্রের উন্নতি না হইলে শক্তি সঞ্চয় অসম্ভব। শক্তিহীন জাতি মৃতের তুল্য—তাহার সাহিত্যই বা কি আর ভাষাই বা কি? জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য জাতীয় চরিত্রের উন্নতি। কিন্তু আবর্জ্জনার অভাব কোন স্থানেই নাই। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে—গৃহস্থের প্রাঙ্গনে—রাজাধিরাজের মর্ম্মরপ্রস্তরবিনির্ম্মিত রম্যহর্ম্ম্যতলে—আবর্জ্জনার কোথাও অভাব নাই। তবে যেখানেই আবর্জ্জনার পরিমাণ অল্প, সেই খানেই সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট—যাহাই আবর্জ্জনাবিহীন তাহাই দেখিতে মনোরম। আবর্জ্জনারাশি সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বপাত্রেই সুসংস্কারের পথের কণ্টক।

আবর্জ্জনা দূর করিবার উপায়ের অভাব নাই। ওই যে মল্লিকদের বাড়ীর ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে জুতা দেখিতেছ, উহাতে ধুলা কাদা লাগিলে বুরুষ দিয়া ঝাড়িতে হয়—আবার ওই যে দ্বিরদরদনির্ম্মিত টেবিল দেখিতেছ বা ফ্রেঞ্চ পালিশ দেওয়া মেহগেনির আরাম চেয়ার দেখিতেছ উহাকে ঝাড়িতে হয় "ঝাড়ন" দিয়া—ঝাড়ন সূত্রনির্ম্মিত। আর ওই যে দেখিতেছ গৃহকোনে এক রাশি ছাই, উহাকে দূর করিতে হইলে শক্ত সম্মার্জ্জনীর সবল সঞ্চালন আবশ্যক—আর মিউনিসিপালিটির দুর্গন্ধময় ড্রেনগুলি পরিস্কার করিবার সেই লম্বা লম্বা অদ্ভুত যন্ত্র ত সকলেই দেখিয়াছ—সেও এক প্রকারের বুরুষ। অবস্থাভেদে চিরদিনই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

আমাদিগের বঙ্গসাহিত্যের আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার জন্য যে কোন্ শক্তির সাহায্য লওয়া আবশ্যক তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন, ঝাড়ন—না বুরুষ—না সম্মার্জ্জনী?

কিছুদিন হইল জ্ঞানেন্দ্র বাবু ও হরেন্দ্র বাবুর "নবপ্রভায়" আমরা 'সীতা' পড়িতেছিলাম। এসীতা বাল্মীকির নহে—কৃত্তিবাসের নহে। "সীতা"

একখানি ক্রমশঃ প্রকাশ্য নাটক--- আমাদিগের হাস্যরসের রসিক কবি দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার লেখক। যাহা হউক, সেই "সীতা" আমরা পড়িতে-ছিলাম, পড়িতে পড়িতে এমন একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে দুর্গন্ধের জ্বালাময় তীব্র তাড়নায় আমরা অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। তাই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি 'সাহিত্যের সাধের উদ্যানে এমন বিকট পূতিগন্ধের স্থান কেন?'

শত্রুঘ্ন "পিশাচ ম্লেচ্ছ যবন, পরাক্রান্ত সংদৈত্য" লবণকে সংহার করিতে যাইতেছেন। যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে স্ত্রীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া-ছেন। আসিয়া ব্যাকুল আগ্রহে ডাকিতেছেন--- "শ্রুতকীর্ত্তি! শ্রুতকীর্ত্তি!"

রামায়ণের শ্রুতকীর্ত্তি-- শত্রুঘ্নপত্নী শ্রুতকীর্ত্তি উত্তর দিতেছেন---

"চিৎকার করে কে সে

গাধার মত এ সময়ে আমার ঘরে এসে?"

আহা! হিন্দুস্ত্রীর মুখে, বিশেষ ত্রেতাযুগের হিন্দুস্ত্রীরমুখে, রাজা দশরথের পুত্রবধূর মুখে কি সোহাগভরা সুন্দর স্বামী সম্ভাষণ!

শত্রুঘ্ন বেচারী নেহাইৎ ভালমানুষ--- দাদার শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার পূর্ব্বে একবার 'বিদায় রোদনের' জন্য পত্নীর কাছে আসিয়া যেমন মধুর সম্ভাষণ শুনিলেন তাহাতে তাঁহার উষ্ণরক্তে যেন বরফজল পড়িল---- অমনি সব ঠাণ্ডা! মনে মনে ভাবিলেন 'এ ইয়ারকীর শোধ লইতেই হইবে' --- তাই বলিলেন,----

"শ্রুতকীর্ত্তি! বল্‌তে কি আজ বেড়িইছি ভোরে

তোমায় আমি পাড়ায় পাড়ায় গোরুখোঁজাকরে।"

কেন, এত "খোঁজা" খুঁজি কেন? শ্রুতকীর্ত্তি কি তখন পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া কোন কুসুমিত উপবনে নির্জ্জনভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন?

সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজ-শিক্ষকের উচ্চআসন গ্রহণ করিবার স্পর্দ্ধা যাঁহারা রাখেন, এমন চিত্র অঙ্কন করিবার অসীম ধৃষ্টতা ও সাহস তাঁহাদিগের কেন হয়?

শিক্ষিত সমাজের কথা বলিতে পারিনা কিন্তু অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বঙ্গকুলবধূ---- হিন্দুললনা রামায়ণের শ্রুতকীর্ত্তির এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব পতিপূজা;

স্বামী সন্তানগণ প্রভৃতি দেখিলে হয়ত লজ্জায় মরিয়া যাইবে! আর যদি চিত্রকরের গুণে এই চিত্র তাঁহাদিগের পছন্দ হয় তবেত কথাই নাই! আমরা তাহা হইলে শুষ্ক মুখে বলিব---- "বরাং"!

অতবড় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ---- তাহাতে অবশ্য শত্রুঘ্নের ফুট হইয়া তুলিবার বা শ্রুতকীর্ত্তির বিকাশ দেখাইবার মত অধিক কথা নাই। রামায়ণের কবি ইঁহাদিগকে একেবারেই অন্তরালে রাখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় সেই জন্যই দ্বিজেন্দ্র বাবুর এত অসীম সাহস! তাই তিনি নির্ভয়ে এমন সরস রসিকতার বোঝা শত্রুঘ্নের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া দূরে বসিয়া হাসিতেছেন। তিনি বোধহয় এ টুকু বিবেচনা করেন নাই যে রামের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন বলিয়া পরিচয় দিলেই কলির মানুষ শত্রুঘ্নকেও দেবভাবাপন্ন বলিয়া মনে করিবে---- তাহার আর অন্য পরিচয় আবশ্যক নাই। পৌরাণিক চরিত্রগুলির উপর এইরূপ কালিমা অর্পণ করিয়া জনসাধারণের চক্ষের সমক্ষে তাহাদিগকে বাহির করিবার অপরাধ ক্ষমার্জ্জনীয়!

স্বামী ও স্ত্রীর ভিতর স্বল্প দ্বন্দ্ব অনেকে গভীর প্রেমের চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুও শ্রুতকীর্ত্তি এবং শত্রুঘ্নের কথাবার্ত্তায় তাহার কতকটা প্রমাণ দিতে গিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ করিবার সে শক্তি কোথায়? তাই লিখিতে লিখিতে তুলি কম্পিত হইয়াছে---- আর পরক্ষণেই চিত্রপটে শিব গড়িতে আর কিছু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কথা পরে বলিব।

স্বামী স্ত্রীতে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল---- সে অনেক কথা। "শ্রুতকীর্ত্তি" নামটা "বিষম লম্বা" হওয়ার জন্য অনেক "খাঁটি প্রেমের কথা" বলিবার থাকিলেও সে শত্রুঘ্ন সে সমুদয় বলিতে পারিলেন না — সমস্তই ভুলিয়া গেলেন তাহাও তিনি বলিলেন। তারপর, লবনের মৃত্যু হইলে শ্রুতকীর্ত্তি রাণী হইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইলে তখন কেমন দেখাইবে, শ্রুতকীর্ত্তি একবার শত্রুঘ্নের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাও দেখিয়া লইলেন। কিন্তু শত্রুঘ্নের বড় ভয়। বুঝি রাজা হওয়া অদৃষ্টে নাই। তাই বলিলেন —

"----বলছিলাম কি---- লবনদৈত্য পরাক্রান্ত বড়
যুদ্ধে যদি মারাই পড়ি।"

শ্রুতকীর্ত্তির মত রসিকা স্ত্রীর কি এ কথার উত্তর দিতে বিলম্ব হয়? তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন—

"মারাই যদি পড়,
যথারীতি শ্রাদ্ধ কর্ব্বে*,—নিশ্চিন্ত থাক—
ত্রুটি হবে নাক— কোন ত্রুটি হবে নাক।
বাজনা, কাঙ্গাল বিদায়, ফলার নানাখাদ্যান্তর
আয়োজন আর নিমন্ত্রণ আর অর্থাৎ যা যা দস্তুর
কিছুর ত্রুটি হবে নাক শেষে "হুলু"ধ্বনি"

পাঠক দেখিলেন কবির কি সুন্দর রসিকতা! রসিকতা করিয়া পত্নী বলিতেছেন 'তুমি মরিলে যথারীতি তোমার শ্রাদ্ধ হবে বাজনা, কাঙ্গাল বিদায়, ফলার প্রভৃতি এর কিছুরই ত্রুটি হবে না!' বাঙ্গালীর ঘরের লক্ষ্মীরা বোধ হয় স্বপ্নেও এমন কথা ভাবিতে পারেন না মুখে ফুটিয়া বলা ত দূরের কথা!

এমন চিত্র না আঁকিলে কি হইত না? যদি নিতান্তই সখ হইয়াছিল 'রামায়ণ লিখিব', তবে লিখিয়া আপনারা নিজেরা দেখিলেই পারিতেন। দশজনকে না দেখাইলে কি আর হইত না?

সে যাহা হউক, স্ত্রীর কথা শুনিয়া নিতান্ত নিরীহ শত্রুঘ্ন বোকা বনিয়া গেল। ভাবিল, শ্রাদ্ধের কথাত হইল ভাল, একটা পরকালের কাজ কিন্তু শ্রুতকীর্ত্তি বলে কি? আমি মরিলে পরে আবার হুলুধ্বনি কিসের?

তখন রঙ্গিণী শ্রুতকীর্ত্তি এক গাল হাসি হাসিয়া বুঝি শত্রুঘ্নের হস্ত ধারণ করিল, করিয়া বলিল—

"তুমি যাদুমণি
যদিই নিষ্ঠুর ভাবে মর তোমার নেইক ভাবনা
শত্রুঘ্নের শত্রুতা সাধন কর্ত্তে আমি যাবনা,
খর্চ্চার জন্য নালিশ কর্ত্তে।"

শত্রুঘ্ন। "বটে! বল কি হে,"

---

*'কর্ব্বে' 'কর্ব্বো' হওয়াই উচিত!

এইবার গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হইল! শ্রুতকীর্ত্তি [চোখ দুয় ঠোঁটের দিয়া] বলিল—

"আমি একটা বৈনদি হ'ক না দেখেনেব গিয়ে।"

এই খানেই কবিত্বের চরমোৎকর্ষ— দ্বিজেন্দ্র বাবুরও বাহাদুরী— সুরুচিরও যথেষ্ট পরিচয়!

কবিকে আমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, 'শ্রুতকীর্ত্তি কি তখন মনে মনে ভাবিতেছিল শত্রুঘ্ন পুরাতন হইয়াছে— ইহাকে আর ভাল লাগে না। এখন একজন নূতন চাই, নহিলে জীবনের বৈচিত্র কোথায়?' তা না হইলে কোন্ হিন্দুপত্নী পতীর সমক্ষে বিদ্রূপচ্ছলেও বলিতে পারে যে তুমি মরিলে আমি আবার আর একজন বাছিয়া লইব? হিন্দুর স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে মরিতে জানে, কিন্তু স্বপ্নেও এমন কথা ভাবিতে জানে না।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই নূতন ধরণের নূতন 'ইয়ারকি' সাহিত্যে শোভা পায় না— ভদ্র গৃহস্থের গৃহেও শোভা পায় না। ভদ্র গৃহস্থের কুলবধূগণ, যাহারা স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে ভয় ভক্তি করে, তাহাদিগের মুখে এমন কথা শোভা পায় না— তাহারা ইহা বলিতেও পারে না। স্বামীর সহিত তাহারা এই রূপ রুচিবিগর্হিত জঘন্য রসিকতা করিয়াছে বা করিতে পারে বলিলে বঙ্গকুল-ললনাদিগকে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত, নিতান্ত নির্লজ্জের মত অপমান করা হয়।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা এতই বুদ্ধিমান যে আপন পিতাকে "শালা" সম্বোধন করিয়া একটা ভারি মস্তরকমের রসিকতা করিলাম বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়ে।

যাহা হউক, দ্বিজেন্দ্র বাবু ভারি একটা ভুল করিয়াছেন। এইখানে শ্রুতকীর্ত্তির একটা গান দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে 'ষ্টেজ এফেক্ট' আরও ভাল হইত— দর্শকের প্রাণ মোহিত হইত। অমৃত বাবুর "বাবু" প্রহসনে শুনিয়াছি কতকগুলি শিক্ষিতা রমণী গাহিতেছেন—

"পতি মলে হাতের বালা খুলবোনালো
খুলবোনা।"

বিচ্ছেদ আগুণ প্রাণে আরত জ্বাল্‌বোনালো
আল্‌বোনা।
* * *
আমরা সবাই বিম্বাবতী
আস্‌লে পরে দোস্‌রাপতি
টান্‌লে প্রাণ তার পানে সই—
কেন চল্‌বোনালো
চল্‌বোনা।"

দ্বিজেন্দ্র বাবুরও উচিতছিল এইরূপ একটি গীত গাওয়াইয়া শ্রুতকীর্ত্তির চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ করা!

সাহিত্য সুশিক্ষার স্থান—সেখানে এমন করিয়া কুশিক্ষা দিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। ইহাতে সমাজের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই। এমনিতে গৃহ আর বাঁধন মানে না—তাহার উপর এত প্রলোভন—পৌরাণিক চরিত্রের এমন 'জোর দোহাই' দিলেত সোণায় সোহাগা! তাহার উপর আবার চিত্রকরের নামের দোহাই!!

অভিনয় দর্শনকালে দর্শক মণ্ডলী এক একবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিয়া কবির witএর পরিচয় দিবে, দ্বিজেন্দ্র বাবুর যদি এইরূপই ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে তিনি অন্য উপায়ে তাহা করিতে পারিতেন। রাম লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন—সীতা, শ্রুতকীর্ত্তি, উর্ম্মিলা প্রভৃতিকে তাহার ভিতর না আনাইত দ্বিজেন্দ্র বাবুরও মঙ্গল—আর বঙ্গসমাজেরও মঙ্গল।

দ্বিজেন্দ্র বাবু নূতনের বড় পক্ষপাতী। তাই তিনি গাহিয়া থাকেন "একটা নূতন কিছু করো—একটা নূতন কিছু করো"। নাটক লিখিতে যাইয়াও তিনি নূতনই করিয়াছেন।

"মাতৃক্রোড় হইতে বহির হইয়াই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা, বিলাতী ভাব চিন্তাধারা এবং পাশ্চাত্য দাপটের পেষণে আমরা জাতীয় ভাব সমূহ বিস্মৃত হইয়া অর্দ্ধ ইউরোপীয় চেহারায় এক আজব দৃশ্য দেখাইতেছি।" বর্ত্তমান শ্রুতকীর্ত্তির চিত্র তাহারই ফল।

শ্রীমতী এনি বেসান্ত বাস্তবিক সত্যই বলিয়াছেন "কোন জাতি জাতীয়

বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে না—" একথা কোনদিনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

শুধু দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিয়া কেন, অধুনা অনেক বঙ্গীয় কবিই উক্ত কথা বিস্মৃত হইয়া যান। ইহার কি একটা প্রতিকার হইবে না? এ ব্যাধির কি ঔষধ নাই? যাহারা অম্লান বদনে সাহিত্যকে বধ করিয়া, জাতীয় চরিত্রকে কলঙ্ককালিমা মণ্ডিত করিয়া এই সকল নিতান্ত কুরুচিপূর্ণ মসিমলিন অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজের চক্ষের সম্মুখে রাখিতেছে তাহাদিগের কি কোন দিনই বিচার হইবে না?*

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

---

* সর্ব্বজন পরিচিত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক চরিত্রের আদর্শ নষ্ট করিয়া কাব্য বর্ণনায় সমবতারের চেষ্টা করিলে সাহিত্যে কিরূপ কুফল ফলিতে পারে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত বঙ্গসাহিত্যে বর্ত্তমান। তাহার সংখ্যা আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। এই প্রবন্ধ যেরূপ তীব্র ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই; কিন্তু নিরঙ্কুশ কবিকুলের তাড়নায় নিতান্ত শান্ত সুশীল পাঠকবর্গ কিরূপ উত্ত্যক্ত হইয়া থাকেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ এই প্রবন্ধ পত্রস্থ হইল। উৎসাহ সম্পাদক।

কবি কুঞ্জ।

শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

সংসার অসার শুধু পড়ি মায়াঘোরে
বাড়িছে পাপের বোঝা বহুদিন ধ'রে;—
একদিন শুভক্ষণে স্মরি দুর্গানাম
দেব-দ্বিজে বয়োবৃদ্ধে করিয়া প্রণাম
করিলাম তীর্থযাত্রা। উৎসাহে উল্লাসে
ভ্রমিনু অনেক তীর্থ বহু পুণ্য আশে।
অনাহারে অনিদ্রায় শীর্ণ দেহখানি
ফিরাইতে হ'ল শেষে গৃহমুখে টানি!
অমনি সকল ভুলি, বঙ্গপল্লী কোণে,
মোর ক্ষুদ্র বাস্তুখানি প'ড়ে গেল মনে।
সুদীর্ঘ বিরহ মাঝে, ওহে পুণ্যভূমি,
কবে জানাইলে মুগ্ধে কে আমার তুমি!
মিথ্যা ব'লে মনে হ'ল কাশী হরিদ্বার,
আমার সে বাস্তু ভিটা সব তীর্থসার।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

আমি কে!

আমি কে, জগতে বিভু, আমি কে আবার?
'আমার' 'আমার' বলি
কেন সদা মোহে ভুলি
জগতে কিসের মোর আছে অধিকার?
তোমারি আদেশ মতে
আসিয়াছি এ জগতে

নিজে যে জানি না কিছু উদ্দেশ্য তাহার,
যা তোমার ইচ্ছা হয়
তাই কর যোগ্য ময়
তাহাতে আমার কিবা আছে বলিবার ?
সকলেই এ জগতে
তোমারই ইচ্ছামতে
সাধিতেছে নিজ নিজ কাজ আপনার,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য চয়
তারি সমষ্টিতে হয়
বিরচিত এত বড় এ বিশ্ব সংসার !
ক্ষুদ্র পল অনুপলে
যুগ যুগান্তর চলে,
ক্ষুদ্র জলবিন্দু চয়ে হয় পারাবার,
ক্ষুদ্র বালুকণা লেশ
তাতেই গঠিত দেশ,
ক্ষুদ্র বীজে জন্মে তরু ভূধর আকার,
মৃদুল নিশ্বাস ভরে
জগত জীবন ধরে
ক্ষুদ্র অগ্নি কণা পারে বিশ্ব দহিবার।
যদি তব ইচ্ছাময়
যা করিছ তাই হয়,
উপাদান মাত্র শুধু এ সব তোমার !
আমি কে জগত মাঝে
কি মোর 'আমিত্ব' আছে
'আমার' বলিয়া কেন করি অহঙ্কার ?
কি শক্তি আছে আমার
কোন কাজ সাধিবার
পতঙ্গ সমান ক্ষুদ্র মোর অধিকার।

উৎসাহ।

তবুও আমার তরে
যদি কিছু এ সংসারে
কারো কিছু কভু হয়ে থাকে উপকার,
তা তে ও তো অহঙ্কার
নাহি কিছু করিবার
আমি উপলক্ষ মাত্র, সে কাজ তোমার!

শ্রীমতী——

সিন্ধু।

কবে কোন্ শান্ত স্নিগ্ধ সরোবর তীরে
হে সিন্ধু! সিন্ধুর ভ্রমে নৃপ দশরথ
কোদণ্ড বিস্ফারি সহ শব্দভেদী শরে
বিঁধিল তোমারে; হেথা চাহি তব পথ
জনক জননী অন্ধ—ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
প্রতি শুষ্ক পত্রধ্বনি গণিছে অন্তরে।
কি অব্যক্ত মর্ম্মভেদী তীব্র বেদনায়
বেজেছিল বক্ষ তব!— নিষ্ফল তা নয়
—এই অশ্রুমুক্তা সিক্ত যাতনায় সূত্রে
সীতার নিয়তি সূত্র হইল গ্রথিত!
—এই এক বিন্দু রক্তে ধীরে ধীরে ধীরে
মহারুদ্র রক্তনদী হ'ল প্রবাহিত।

যাহে পরিপূর্ণ আজি সাহিত্য ভাণ্ডার—
কাব্য, গল্প, ইতিহাস—অন্ত নাহি তার।

বিজয়।

হরিনাথ বাবুর পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত শীর্ণ দেহ নিমতলার ঘাটে ভস্মীভূত করিয়া বিজয় যখন শোক তরঙ্গায়িত হতাশ হৃদয়ে, একটি দুঃখময়ী বেদনাময়ী নিরাশার ব্যথিত স্মৃতি বুকে করিয়া শব্দহীন হাহাকারের ভিতর দিয়া, সেই শ্রান্ত সন্ধ্যার মলিন অন্ধকারে আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন বেদনাক্লিষ্টা বিহ্বলা রোরুদ্যমানা শান্তি উন্মাদিনীর মত দুই হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

"এলে ?-- আমার বাবা কৈ- তাঁকে কোথায় রেখে এলে ?"

এইবার বিজয় কাঁদিল। সেই চিরমঙ্গলময় পরমদয়ালের পবিত্র পাদ-প্রান্তস্পৃষ্ট বারিই পৃথিবীর পবিত্র অশ্রু। তাই বুঝি আমরা হর্ষে কাঁদি, বিষাদে কাঁদি--- পাপের পঙ্কিল হ্রদে পতিত হইয়া পরিত্রাণের পথের জন্য কাঁদি, আবার পরিত্রাণ লাভ করিলে যখন হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হয় তখন আমরা সকল ভুলিয়া আবার কাঁদি। তাই বুঝি অশ্রু পুণ্যময় পবিত্র--- তাই বুঝি সব ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ বাঞ্ছিতের জন্য অশ্রুপাত।

পিতার মৃত্যুতে শান্তি কাঁদিল-- শ্বশুর বিয়োগে বিজয় কাঁদিল। হরিনাথ বাবুর জন্য কাঁদিবার আর কেহ ছিল না।

সে [illegible] শান্তিশূন্য বিজয় এখন নিতান্ত উদ্বেগপূর্ণ অশান্ত অসুখী। ঠিক এই অবস্থা [illegible] আমরা বলিয়া থাকি পরমেশ্বর আছেন।

বিজয় রেলের বাড়ীর একজন সামান্য কেরাণী মাত্র। ৩০ টাকায় তাহার সংসার খরচ চলিত না--- একদিক ঢাকিতে আর একদিক আবরণ হীন হইয়া পড়িত।

সংসার সম্বন্ধে পুরুষ যত ভাবে স্ত্রী তত ভাবে না। বিজয় যত ভাবিত, শান্তি তত ভাবিত না। শান্তি জানিত তাহার স্বামী আছে। যতক্ষণ আলোক ততক্ষণ ছায়া--- যতক্ষণ বিজয় ততক্ষণ শান্তি। কিন্তু বিজয়ের পরিবর্ত্তন [illegible] বেশ বুঝিতে পারিতেছিল--- আলোকে কম্পন উপস্থিত হইলে ছায়াও কাঁপিতে থাকে।

বিজয়ের সহস্র অনুরোধেও কোন ফল হইল না। সংসারের টানাটানি দেখিয়া শান্তি অবশেষে কার্পেট বুনিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। বিজয় তাহা দেখিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিল--- নীরবে একটী বুককাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপনমনে বলিল--"শান্তি, তুমি শান্তিময়ী। কেন আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়াছিল!"

যাহা হউক, এমনি করিয়া দিন যাইতে লাগিল। তোমার দিনও যায়--- আমার দিনও বসিয়া থাকে না -- বিজয়ের দিনও যাইত।

বাল্যকাল হইতেই বিজয় বড় সঙ্গীত প্রিয়, নিজেও একরকম গাহিতে পারিত। তাই দেশির বাড়ীর দ্বিতীয় কেরাণী অবিনাশ বাবুর সহিত বিজয়ের বড় সদ্ভাব। অবিনাশ বড় সুন্দর এস্রাজ বাজাইতে পারিত। বিজয় তাহার নিকট গোপনে এস্রাজ শিক্ষা করিতেছিল। অশ্রু যেমন বেদনা লাঘব করে, সুসঙ্গীত তেমনি বেদনার উপর একটা বিস্মৃতির আবরণ আনিয়া দেয়। সেই জন্যই বিজয় সঙ্গীতে এত মনোনিবেশ করিয়াছিল।

(২)

একদিন দেশের আপিসে ডার্বি সুইপের (Delby sweep) কতকগুলি বিজ্ঞাপন আসিয়া উপস্থিত হইল। কেরাণী কুলের ভিতর অনেকেই দুই একখানা করিয়া টিকেট ক্রয় করিল। শান্তির সহিত পরামর্শ না করিয়া বিজয় কোন কাজ করিত না। তাই অবিনাশ বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও বিজয় তখন টিকেট কিনিল না।

বড় সাহেবের নিকট একখানি কার্পেট বিক্রয় করিয়া সেই দিনই বিজয় দশটি টাকা পাইয়াছিল। শান্তির পরিশ্রমোপার্জ্জিত ধন দিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না।

বিজয়ের মুখে "ডার্বি সুইপের" গল্প শুনিয়া শান্তি বলিল--"তা হোক না, একখানা টিকিট কেনায় দোষ কি?"

"আমার অদৃষ্ট যে কেমন তাত জানই। গরীবের উপর লক্ষ্মীর দয়া হয় না। শান্তি, একদিনে কি কখন বড় মানুষ হওয়া যায়?"

কথা বলিতে বিজয়ের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

শান্তি ছাড়িল না। বলিল 'টিকিট কিনিতেই হইবে'। অবশেষে বিজয়

শান্তির নামে ১০৲ টাকা দিয়া টিকিট ক্রয় করিল। অদৃষ্টের সঙ্গে যদি নামের কোন সম্বন্ধ থাকে এই আশঙ্কায় বিজয় নিজের নামে টাকা দিতে সাহস পাইল না।

* * *

তারপর অনেক দিন চলিয়া গেল। শান্তি বড় দুঃখিনী। দুঃখিনীর দিকে লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন—শান্তি ৫০ ০০০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইল। যে দিন এই সংবাদ আসিল, বিজয় সে দিন আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।

(৩)

আর এখন সে বিজয় নাই। কাটখোলায় তাহার বড় বড় দুই তিনখানি আড়ত। বিজয়ের দিনগুলি এখন বেশ সুখে সচ্ছন্দে যাইতেছিল।

অর্থের সঙ্গে সঙ্গে অভাবও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহার অর্থ কম, তাহার অভাবও কম। তাই চাঁপাতলার সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার গৃহ বিজয়ের ভাল লাগিল না। সেই পদব্রজে কেরাণীর আপিসে গমন বিজয় এখন ভুলিয়া গেল। এখন কি আর এসব শোভা পায়!

এখন বালিগঞ্জে বিজয়ের প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা। তাহার কক্ষে কক্ষে গ্যাসের আলো। দেয়ালের গায়ে বড় বড় সোণালি ফ্রেমে আঁটা নানা রকমের বিলাতী চিত্র। কোনটী স্কটলণ্ডের পর্ব্বত শ্রেণী—দূর নীলাম্বর ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কেহ ধূসর—কেহ কাল—দূরের পর্ব্বত আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। নিকটস্থ পর্ব্বতের একটি সমতল ক্ষেত্রে কতকগুলি হরিণ নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোনটী নায়াগ্রার জল প্রপাত—সেই চিরচঞ্চল জলরাশি অনন্তকাল ধরিয়া কল কল নাদে পর্ব্বত গাত্রে আছড়াইয়া পড়িতেছে। এইখানে চিত্রকরের শিল্পকৌশল অতুলনীয়। প্রকৃতির সেই বিশাল গাম্ভীর্য্য যেন চিত্রের ভিতর দিয়া সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন ফ্রেমে একটি ইংরাজকৃষকের আনন্দ কল্লোলিত ক্ষুদ্র গৃহ অঙ্কিত রহিয়াছে। বৃদ্ধ কৃষক তাহার ততোধিক বৃদ্ধ অশ্বটীর মুখ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আর সেই মোটা মোটা

চাকাবিশিষ্ট গাড়ীর উপর পর্ব্বত প্রমাণ গম বোঝাই করা। বুদ্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌত্র পৌত্রীগণ রক্তরঞ্জিত মোটা মোটা গাল ফুলাইয়া দুই হস্তে গমের শীষ ধরিয়া টানিতেছে আর বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার মুখনিঃসৃত কুণ্ডলীকৃত চুরুটের ধূমরাশির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। কোথাও বা সুন্দর এডনিসের মৃতদেহপার্শ্বে বসিয়া বিরহ বিধুরা শোক বিহ্বলা সুন্দরী ভিনস রোদন করিতেছে। তাহার আলুলায়িত কুন্তল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত— চূর্ণ কুন্তলগুলি ধীর বাতাসে ধীরে ধীরে দুলিতেছে ভিনস তখন আত্মহারা।

কক্ষগুলি বেশ সুন্দর সুসজ্জিত মনোহর। বিজয়ের দিনগুলি এখন বেশ সুখেই যাইতেছিল।

কিন্তু শান্তির বড় কষ্ট হইয়াছিল। সে আর পূর্ব্বের মত তাহার বিজয়কে বুকের মধ্যে বুক দিয়া ঢাকিয়া নয়নে নয়নে রাখিতে পারিত না বন্ধু বান্ধব লইয়া, বিষয় কর্ম্ম লইয়া বিজয়কে অনেক সময় বাহিরে থাকিতে হইত। আজ এখানে নিমন্ত্রণ কাল সেখানে পার্টি— পরদিন অন্যত্র “এন্‌গেজমেণ্ট”। বড়মানুষের বন্ধুর অভাব হয় না, তাই বিজয়ের আর অবসর হইত না।

বিজয় এখন নিজে বেশ ভাল গান গাহিতে শিখিয়াছিল, তাই সে শান্তিকে হারমোনিয়ম্ শিখাইতে চাহিল। কিন্তু শান্তি তাহাতে রাজি হইত না— ছি লজ্জা করে, স্বামীর সম্মুখে আবার গান বাজনা কি। বাঙ্গালীর ঝি গান শিখিয়া কি করিবে?

বিজয় তাহা শুনিত না, শুনিলেও বুঝিত না বরং বিরক্ত হইয়া উঠিত। তাহার মেজাজটাও দিন দিন যেন কেমন একরকম হইয়া উঠিতেছিল। শান্তি তাহা বেশ বুঝিত বুঝিয়া মনের ব্যথা মনের ভিতরেই পুষিয়া রাখিত, কখনও প্রকাশ করিত না।

এত দাস দাসী থাকিতেও শান্তি পূর্ব্বের মত নিজে হইতে সকল কার্য্য করিত— বিজয় তাহা ভাল বাসিত না। হ্যামিল্টনের বাড়ীর বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি বিজয় যেমন আনিয়াছিল, তেমনিই রহিল। শান্তি অলঙ্কার পরিতে ভাল বাসিত না। গহনা পরিতে বলিলেই বিজয়কে বলিত, “তুমিই ত আমার অলঙ্কার”। বিজয় যেমন চাহিত, শান্তি তেমন হইতে পারিত না। শান্তি দেখিল পূর্ব্বেই তাহারা সুখী ছিল।

আজকাল বড়লোক বলিয়া পরিচিত হইতে হইলেই তাহার অনেক "ঠাট" আবশ্যক হয়। তাহা নহিলে "প্রেষ্টিজ" থাকে না, "পজিসন" ছোট হইয়া যায়— বন্ধু বান্ধবদিগের সকলরকম অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে, নহিলে তাহারা কি মনে করিবে ?

তাই প্রথমে বিজয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার গৃহে মধ্যে মধ্যে 'মাইফেল' হইত। শেষে "মাইফেল" একটি দৈনন্দিক কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইল। কলিকাতার প্রসিদ্ধা বাইজীরা আসিয়া তাহাদিগের সেই কমনীয়া মোহিনী স্বরলহরীতে বিজয়ের বৈঠকখানা কম্পিত করিত। সঙ্গীতপ্রিয় বিজয় সেই সুরতরঙ্গে আপনাকে ভাসাইয়া দিত— কখনও বা এসরাজ লইয়া নিজেই বাইজীর সহিত বাজাইতে বসিত।

বিজয় যদিও মদ স্পর্শ করিত না, কিন্তু "মাইফেলে" মদের অভাব নাই। নিমন্ত্রিত বন্ধুদিগের জন্য বিজয়কে সকল রকম বন্দোবস্তই রাখিতে হইত। তাই সেরি, স্যাম্পেন, ক্ল্যারেট, ব্রাণ্ডি, পোর্ট, হুইস্কি প্রভৃতি নানারকমের সুরা ছোট বড় নানারকম বোতলে বিজয়ের গৃহে শোভা পাইত। আর যখন সেই অগ্নিময়ী মদিরা স্ফটিক পাত্রে সোণার জলের মত জলিত তখন দূর হইতে দেখিয়া শান্তি শিহরিয়া উঠিত।

ইরাণী বাইজী লক্ষ্ণৌ হইতে নূতন আমদানী। কলিকাতার পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে ইরাণীর নাম। যে একবার তাহাকে দেখিয়াছে সেই মজিয়াছে, আর যে তাহার সেই হরিণনয়ননিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণশর সহিয়াও তাহার সঙ্গীত সুধা পান করিয়াছে সে মরিয়াছে। বিজয়ও মরিল!

গান গাহিতে গাহিতে একটি গ্লাসে সেরি ঢালিয়া ইরাণী বিজয়ের মুখের নিকট ধরিয়া একটু মৃদু হাসিল, হাসিয়া বলিল— "আপ্ পিজিয়ে বাবু সাব্"। ইরাণী তাহার কোমল হস্ত তুলিয়া বিজয়কে সেলাম করিল। বিজয় ইরাণীর হস্ত হইতে সেই সুরাপাত্র গ্রহণ করিল। সে স্পর্শ কি কোমল! বিজয় শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু কি জানি কেন শান্তির মলিন মুখের ছায়া তখন তাহার হৃদয়ের ভিতর আরও মলিন হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

বিজয় সুরাপাত্র নামাইয়া রাখিয়া 'বিবি'কে আর একটি সেলাম করিয়া বলিল "মাফ্ কি জিয়ে হাম্ শরাব পিতা নেই"।

ইরাণী একটু গম্ভীরা হইল। তারপর মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া, বিজয়ের হস্ত ধরিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায় বলিল—

"বাবু, আপনি আমাকে ভাল বাসেন না? আমি আর গান গাহিব না।"

বিজয় কাঁপিয়া উঠিল। ইরাণীর স্পর্শ কি মধুর—ইরাণীর দৃষ্টি কি সুন্দর। এর কাছে শান্তি! শান্তি গাহিতে জানে না - বাজাইতে জানে না— এমন করিয়া কথা কহিতেও জানে না। ইরাণীর কাছে শান্তি।

আবার শান্তির প্রেমপূর্ণ কোমল দৃষ্টি— সেই আগ্রহপূর্ণ ব্যাকুল নয়ন বিজয়ের সম্মুখে জাগিতে লাগিল। কিন্তু ইরাণী আর অবসর দিল না। আবার সেই সুরাপাত্র তুলিয়া লইয়া বিজয়ের মুখের কাছে ধরিল।

একবার একটু মদ খাইলে দোষ কি? সকলেইত খায়।

বিজয়ও খাইল।

আবার সঙ্গীত— আবার হাসি -- আবার সেই বঙ্কিম কটাক্ষ--- তারপর আবার মদ।

বিজয় আর একটু খাইল।

আবার এস্রাজের সহিত ইরাণী গাহিতে লাগিল---"তোমারে যৌবন মধু যাকি শুধারি——"

কি সুন্দর অঙ্গভঙ্গী— কিবা চাহনি-- কিবা সেই নূপুরশিঞ্জিতপাদবিক্ষেপ। আ মরি! মরি! মরি! ভূষণমণ্ডিতা ইরাণীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তখন সহস্র বিদ্যুৎ চমকিয়া ফাটিয়া পড়িতেছিল। ইরাণীর কণ্ঠ তখন উচ্চে উচ্চে— আরও উচ্চে উঠিতে লাগিল।

"ইরাণী— ইরাণী—"! উন্মত্ত বিজয় চিৎকার করিয়া উঠিল, "ইরাণী— ই-রা-ণী— !"

* * *

(৪)

শান্তি---শান্তি - কোথায় তুমি শান্তি!

নীরব নিশীথে, উন্মুক্ত বাতায়নমুখে বসিয়া শান্তি নীরবে কাঁদিতেছিল। বুঝি তাহার অন্তরের বাণি উৎকণ্ঠায় সেই ক্ষীণ জ্যোতিহীন নয়নদ্বয় হইতে দূরে-- বহুদূরে চলিয়া গিয়া আকাশের গায়ে ঐই একটি নক্ষত্র হইয়া

অস্ফুটিত হইতেছিল।

শান্তি আপন মনে আপনার কথা ভাবিতেছিল। হায় অদৃষ্ট!

যখন দারিদ্র্যের তীব্র নিষ্ঠুর দংষ্ট্রাঘাত সহিয়াও শান্তি ঘর সংসার করিত তখন তাহার যে সুখ ছিল আজ তাহা কোথায় গিয়াছে। শান্তির অর্থের অভাব নাই---বসনের অভাব নাই---ভূষণের অভাব নাই। তবে কিসের অভাব? শান্তির ব্যথিত হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিত "সবই অভাব"। যাহা থাকিলে রমণী আর কিছু চাহে না---যাহা পাইলে নারী জীবনের পুণ্যময় পবিত্র যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হয়---যাহার অস্তিত্বে রমণীর অস্তিত্ব---যাহার জন্ম রমণী জীবনের পবিত্র আত্মত্যাগ---যাহার মুখের দিকে চাহিয়াই নারীজাতির আত্মবিস্মৃতি, শান্তির আজ তাহারই অভাব। শান্তি কাঙ্গালিনী---শান্তি হতভাগিনী---শান্তি সর্বস্ব-বিহীনা!

শান্তির হৃদয়ের ভিতর যে দাবানল উঠিয়াছিল তাহার নির্বাণ নাই। পলে পলে শান্তি মরিতেছিল---পলে পলে তাহার জীবন্ত সমাধি হইতেছিল। শিশিরসিক্তা সদ্যঃস্ফুটিতা কুসুমকলিকার মত সুন্দরী শান্তি আজ বিশীর্ণা, মলিনা, রুগ্না। সদ্য চিতানলের পুঞ্জীকৃত ধূমরাশির ভিতর কাহাকেও কিছুক্ষণ রাখিয়া যদি বাহিরে আনা যায়, তাহা হইলে তাহার যেমন মূর্ত্তি হয় আজ শান্তিও ঠিক সেই রকম।

শান্তি এখন নিজে চেষ্টা করিয়া হারমোনিয়ম্ শিখিয়াছে---শান্তি এখন উত্তম বেশভূষা করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু কে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিবে। বিজয় আর গৃহে আসে না। রাত্রির পর রাত্রি শান্তি কাঁদিয়া কাঁদিয়া জাগে---জাগিয়া জাগিয়া অতিবাহিত করে। হায় হায়! "এ হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি, কি দিলে হইবে ভাল।"

শান্তি ভাবিতেছিল---'আমি কাহার কি করিয়াছিলাম যে আমার এমন শাস্তি হইল। কে আমার বুকের ধন বুক চিরিয়া কাড়িয়া লইল---কে আমাকে এমন করিয়া কাঁদাইল---এমন করিয়া ভাসাইল। কর্কশস্বরে শান্তি বলিয়া উঠিল, "রাক্ষসী ইরাণী"। শান্তির বেদনাময় দীর্ঘনিশ্বাসগুলি যেন ইরাণীকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রলয়ের অগ্নি, দুর্বাসার অভিসম্পাত, শনির দৃষ্টি লইয়া ছুটিতে লাগিল। শান্তি আবার বলিল---"ইরাণী, ইরাণী,

ইরাণী—" !

শান্তির কাছে সমস্তই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত। সেই বিজয়, বিজয়ের সেই অপরিমিত স্নেহ গৃহদ্বারে ক্ষুদ্র কমলের তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কর ধারণ করিয়া ক্লান্ত বিজয়ের রোজের আপিস হইতে প্রত্যাগমন — সেই দুঃখে ঘেরা সুখ স্বপ্নবৎ ছিল — শান্তির কাছে এখন সমস্তই যেন একটা জটিল প্রহেলিকা। হায়রে সেদিন! শান্তি তাহার বুক ছিঁড়িয়া একটি নিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিল—"হায়রে সেদিন। যাহা গিয়াছে আর বুঝি তাহা হইবে না। কেন হইবে না— কাহার জন্য হইবে না? ইরাণীর জন্য! ইরাণী কে? ইরাণী রাক্ষসী। ইরাণীই আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে।" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অনতি উচ্চ স্বরে শান্তি বলিয়া উঠিল, "না— না সবই আমার অদৃষ্ট"।

শান্তি এমন কতদিন ভাবিত— এমন কতদিন কাঁদিত। যে যাহাকে চায়, সে তাহাকে পায় না ইহাই সংসারের নিয়ম।

(৫)

ইরাণী বিজয়ের কণ্ঠলগ্ন লতা হইল। বিজয় ইরাণীর ছায়া! তাই যেখানে ইরাণী সেই খানেই বিজয়।

জলের স্রোতের মত টাকার স্রোত বহিয়া যাইতেছিল কে সেদিকে দৃষ্টি করে। ইরাণীর বিনিময়ে সমস্ত বিশ্বসংসারের রাজত্ব গ্রহণ করিতেও বিজয় তখন প্রস্তুত ছিল না।

পৃথিবীতে ইরাণীর সোহাগভাগী দুইজন থাকিতে পারে না। হয় বিজয় না হয় অবিনাশ! কিন্তু ইরাণী আয়েষা নহে ইরাণী বারবনিতা, অর্থের জন্য ইরাণী আপনাকে বিক্রয় করিয়াছে— ইরাণী প্রেমভিখারিণী নহে, অর্থের কাঙ্গালিনী। তাই ইরাণী বিজয়ের হইল।

* * *

ইরাণীগতজীবন মদ্যপায়ী বিজয় একদিন সন্ধ্যার সময় ইরাণীর একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া ইরাণীর সহিত সুরাপান করিতেছিল আর তাহার সেই সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বিশ্বসংসার ভুলিয়া যাইতেছিল।

মদের নেশায় বিজয় দেখিল, সেই কক্ষময় ইরাণী। কোচের উপর ইরাণী—সোফায় ইরাণী—শয্যায় ইরাণী—কক্ষ প্রাচীর সংলগ্ন বড় বড় চিত্রের ভিতর ইরাণী সকল স্থানেই ইরাণী। এক ইরাণী যেন সহস্র হইল। ইরাণীর সেই মধুর কণ্ঠ আজ আরও মধুর।

উন্মত্ত বিজয় তাহার দুইটি বিশাল বাহু সম্মুখের দিকে বাড়াইয়া দিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "ইরাণী, ইরাণী, কোথায় তুমি?"

ইরাণী ডাকিল, "বিজয়!"

বিকৃতস্বরে বিজয় কহিল, "ইরাণী!"

বাহিরে প্রচণ্ড বাতাস বহিতেছিল, হঠাৎ জানালা খুলিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই সমস্ত অন্ধকার!

(৬)

পরদিন পুলিশ ও দর্শকবৃন্দে সোপানাদি লোকারণ্য হইয়া উঠিল। ইরাণী মরিয়াছে তাহাকে কে যেন হত্যা করিয়াছে।

বিজয় তখনও মদের নেশায় অজ্ঞান।

করোনার (Coroner) আসিলেন আসিয়া অনুসন্ধান করিলেন। করোনার সাহেবের ইন্‌কোয়েষ্টে (Coroner's Inquest) স্থির হইল যে ইরাণী যখন মদোন্মত্তা ছিল তখন দুইটি বড় আলপিন দিয়া তাহার ক্যারোটিড্ আর্টারি ছিদ্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাই ইরাণীর মৃত্যুর কারণ।

পুলিশ বিজয়কেই হত্যাকারী বলিয়া চালান দিল। অনুসন্ধানে আর কিছুই পাওয়া গেল না, কেবল ৪টি টোটা পোরা একটি রিভলভার পুলিশের হস্তগত হইল।

* * *

আজ মোকদ্দমার রায় প্রকাশের দিন। হাইকোর্টের সেসনঘর লোকে লোকারণ্য। বিজয় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আপনার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছিল। এখন বিজয় নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল। শান্তির জন্য তাহার বুক ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবার উপক্রম হইতেছিল। বিজয় মনে মনে বলিল; 'শান্তি, আমার অপরাধ ক্ষমা করিও। আজ আমার রক্ত দিয়া আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, আজ আমি মরিব।'

সেই প্রকাণ্ড বিচারগৃহ নিস্তব্ধ।

গম্ভীরস্বরে বিচারক কহিলেন "বিজয় তোমার কিছু বলিবার আছে?"

ধীরে ধীরে, উচ্চস্বরে বিজয় বলিল, "না আমার কিছু বলিবার নাই। তবে আমার মৃত্যুর পর যেন শান্তি জানিতে পায় যে বিজয় মহাপাপী কিন্তু নরহন্তা নহে, বিজয় আজ হত্যা করিয়াই ফাঁসি কাষ্ঠে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।"

এইবার বিজয় কাঁদিল। নীরবে— অতিশয় নীরবে বিজয় কাঁদিল!

সেই নিস্তব্ধ লোকারণ্য বিজয়ের কথা শুনিল। কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। বিচারক বলিলেন, "আমি কি করিব। আইনের কঠিন নিয়মে আমি আবদ্ধ, আর তোমার বিপক্ষে যে সকল প্রমাণ হইয়াছে তাহাতে তুমিই হত্যাকারী।"

বিচারকের মুখের কথা মুখেই রহিল। সেই জনতা ঠেলিয়া ক্ষিপ্র বেগে নগ্নপদে অবিনাশ সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে, করজোড়ে বলিল,

"ধর্ম্মাবতার আমিই ইরাণীকে হত্যা করিয়াছি। বিজয় নির্দ্দোষী।"

ব্যাকুল আগ্রহে সহস্র চক্ষু অবিনাশের দিকে নিপতিত হইল। ধীর গম্ভীর স্বরে অবিনাশ বলিতে লাগিল—

"ইরাণীকে আমি প্রাণপণে ভালবাসিতাম, আমার আর কেহ নাই। আমার হৃদয় আমি তাহার কাছে বিক্রয় করিয়াছিলাম। কিন্তু অর্থের লোভেই হউক আর স্নেহের জন্যই হউক, ইরাণী বিজয়ের বাধ্য হইয়াছিল। তাই বিজয়ের উপর আমার বড় হিংসা হইয়াছিল। কিন্তু বিজয়ের স্নেহের কথা মনে করিলে তাহার কোন অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা আমার হইত না। আমিত ইরাণীকে পাইলামই না, যাহাতে বিজয়ও তাহাকে না পায় আমি সেই জন্যই ইরাণীকে হত্যা করিয়াছি। আমার হিংসার শান্তি হইয়াছে।"

"বিজয় ও ইরাণী যেদিন অতিরিক্ত সুরাপানে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেই রাত্রিতে আমি নিঃশব্দে ইরাণীর গৃহে গিয়াছিলাম। বন্দুক ও আলপিন উভয়ই আমার সঙ্গে ছিল। বন্দুকের আবশ্যক হইল না আলপিনেই আমার কার্য্য সিদ্ধি হইল। ইরাণীর গৃহ অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই

একটী রিভলভার পাওয়া যাইবে। বন্দুকের নলের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে আমার নাম লেখা আছে।"

"ইরাণী মরিয়াছে—আমিও মরিব। অতদিন আমি কবে মরিতাম কেবল বিজয়ের সঙ্গে একবার আত্মরশোধ দেখা করিব বলিয়া মরিতে পারি নাই। তাই বিজয়, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

ইরাণীর স্মৃতি আমার হৃদয়ের ভিতর সংপ্রচিতার মত জ্বলিতেছে। যেখানে ইরাণী গিয়াছে—আমিও সেইখানে যাইব। ইরাণী—ইরাণী—"

উন্মত্ত অবিনাশ আর কোন কথা কহিলনা। নিমেষমধ্যে জামার পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করিয়া কি যেন খাইয়া ফেলিল।

পরমুহূর্ত্তেই তাহার জীবনহীন দেহ যেমন ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সকলে দেখিল অবিনাশের হস্তে হাইড্রোসিয়ানিক বিষের শিশি! সাবধান হইবার আর সময় ছিলনা। সকলেই ভাবিতেছিল, 'এ বুঝি স্বপ্ন' ইরাণী মরিয়াছে—অবিনাশও মরিল। বিজয়ের পুনর্ব্বিচার আরম্ভ হইল।

* * *

(৭)

হত্যাপরাধবিমুক্ত বিজয় সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ফটকের সম্মুখে আসিয়া তাহার আর চরণ উঠিতেছিলনা। পুণ্যের সম্মুখে পাপ কি কখনও অগ্রসর হইতে পারে? বিজয়ের বড় ভয় হইতেছিল।

বিজয় দেখিল, দাস দাসী কেহই নাই—গৃহ অন্ধকার। একদিন এইখানে শতদীপ জ্বলিত—শতকণ্ঠ ধ্বনিত হইত। এইখানেই একদিন বিজয়ের সমাধি হইয়াছিল! এই সে-ই গৃহ। বিজয় কাঁপিয়া উঠিল। স্বর্গের স্বর্গাধিকারের সম্মুখে পাপীর আত্মা যেমন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপে, কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়ায়—বিজয়ও আজ তাহার আপন গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেমনি করিয়া কাঁপিতেছিল!

শান্ত সন্ধ্যার সেই ঘনান্ধকারে নিজের পাপরাশি লুকাইয়া বিজয় চোরের মত তাহার আপন গৃহের সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিল। উপরে যাইয়া

কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "শান্তি—" !

পার্শ্বের ঘরে অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া ব্যাধিপীড়িতা শান্তি কাঁদিতেছিল। শান্তি শিহরিয়া উঠিল— এযে সেই কণ্ঠস্বর !

আবার বিজয় ডাকিল— "শান্তি—!"

* * *

শান্তির হৃদয়দেবতা আবার ফিরিয়া আসিল। বিজয়ের 'সোণার কমল' কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বিজয়ের গলা জড়াইয়া ধরিল, ধরিয়া বলিল— "বাবা আমাদের ফেলে তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?"

কমল বালিকা।

বিজয় তখন নিতান্ত অপরাধী। অশ্রুভিন্ন হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিবার ভাষা বিজয়ের আর কিছু ছিল না। বিজয় কাঁদিতে লাগিল।

* * *

তাহার পর ৮।১০ দিনের মধ্যেই— শান্তির বুকের বেদনা বাড়িয়া উঠিল। শান্তি মুহূর্ত্তের জন্যও বিজয়কে নয়নের বাহির করিত না। মধ্যে মধ্যেই চমকিয়া উঠিয়া তাহার কম্পিত দুর্ব্বল হস্তে বিজয়ের হস্ত ধরিয়া বলিত,—

"বল, আর আমাকে ছাড়িয়া যইবে না ?"

বিজয় কোন উত্তর দিতে পারিত না; শান্তির ব্যথিত মস্তক আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বিজয় কেবলই কাঁদিত।

একদিন নীরব নিশীথে বিজয়ের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত শান্তি শান্তিনিলয়ে চলিয়া গেল। বিজয়ের দগ্ধ হৃদয়ে সহস্র বজ্র পতিত হইল।

তাহার পর আর একদিন মাত্র গেল। "মার কাছে যাব" বলিয়া কমল সমস্ত দিন রাত্রি কেবল কাঁদিল। বিজয় তাহার শূন্য বুকের ভিতর কমলকে ঢাকিয়া রাখিল। কমল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বাবা, মার কাছে যাব–"।

পরদিন প্রত্যুষেই কমল বিসূচিকা রোগাক্রান্তা হইয়া শয্যাশায়িনী হইল। মাতৃহীনা বালিকার কোটরগত চক্ষু, শীর্ণ মলিন দেহ, অস্থির দৃষ্টি বিজয়ের হৃদয়ে তীব্র যন্ত্রণার উগ্র বিষের মত প্রবেশ করিতে লাগিল। বিজয়ের বুকের ভিতর তখন এমন যন্ত্রণা বোধ হইতেছিল যে এক একবার তাহার

নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কমলের মুণ্ডিত মস্তকের উপর হস্ত বুলাইতে বুলাইতে চোখের জলে ভাসিয়া বিজয় বলিল—

"কেঁদনা মা— ভয় নাই। এখনই অসুখ সারিবে।"

"বাবা, আমার মা কৈ? মা—মা— ওমা—।" কমল আরও কাঁদিতে লাগিল।

বিজয়ও কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভয় কি মা কমল। এইত আমি তোমার কাছেই আছি।"

ক্ষীণ অর্দ্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠে কমল কহিল, "না বাবা, মা কৈ? তুমি যদি আমাকে ছেড়ে আবার চ'লে যাও। আমি তবে কার কাছে থাকবো?"

বিজয় আর কথা কহিতে পারিল না।

ক্রমশঃ কমলের শক্তি ফুরাইয়া আসিতেছিল।

যখন সেই বিষাদবেদনা পূর্ণারজনী কলিকাতাকে গ্রাস করিয়া আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতেছিল, ঠিক সেই সময় রোরুদ্যমানা কমল, অতি কষ্টে তাহার ক্ষুদ্র হস্ত দুইখানি বিজয়ের ক্রোড়ে স্থাপিত করিয়া অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল— "বাবা—"

বিজয়ের হৃদয়ে যেন তপ্ত লৌহ বিদ্ধ হইল।

বিকৃত কণ্ঠে বিজয় ডাকিল, "কিমা কমল—"

কমল আর কথা কহিল না!

* * *

তখন একটি বেদনাকাতর রুদ্ধ নিশ্বাস কষ্টে ত্যাগ করিয়া বিজয় কহিল—

"আজ আমার সব ফুরালো!"

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

পাষাণী।*

পাষাণী একখানি সরস গদ্যপদ্যময় অভিনব দৃশ্যকাব্য। তাহাতে হাস্য ও করুণ, উভয় রসই প্রচুর;—কে কাহাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, নির্ণয় করা কঠিন। করুণ রসের আতিশয্যে পাঠকচিত্ত নিতান্ত ভারাক্রান্ত হইবে বলিয়া কবিকল্পনা বুঝি কাতর করুণ রসের মধ্যে তরল হাস্যরসের তুফান তুলিয়া জোয়ার ভাঁটার সামঞ্জস্য রক্ষার্থ মাধুরী ও চিরঞ্জীবের অবতারণা করিয়াছে।

চির পরিচিত পৌরাণিক চরিত্র কবিকল্পনাবলে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া থাকে। সেকালের চরিত্র একালের ছাঁচে না ঢালিলে, এ কালের রুচির তৃপ্তি সাধন করিতে সক্ষম হয় না,—বরং কাব্যসৌন্দর্য্যবিস্তারে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই ধুয়া ধরিয়া অনেকেই পৌরাণিক চরিত্রের ইচ্ছামত অদল বদল করিবার অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন। পাষাণীতেও তাহার ত্রুটি হয় নাই।

পাষাণী কে? মহর্ষি গৌতম পত্নী অহল্যা পাষাণী হইয়া রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের চরণ সংস্পর্শে আবার মানবী হইয়াছিলেন,—এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। পাষাণী সেই গৌতমপত্নী অহল্যা। কিন্তু এ পাষাণী শিলারূপিণী নহে,—নারী দেহধারিণী। কিভাবে এই নারীচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার রামায়ণবর্ণিত অহল্যা-কাহিনী স্মরণ করা মন্দ নহে। সে কাহিনীর বক্তা বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে শুনাইয়া বলিতেছেন :—

"গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বমাসীন্মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ॥
স চাত্র তপ আতিষ্ঠদহল্যাসহিতঃ পুরা।
বর্ষ পূগান্যনেকানি রাজপুত্র! মহাযশঃ॥"

এই বর্ণনায় জানা যায়,—মহর্ষি গৌতম তাঁহার সুরসম্পূজিত স্বর্গোপম পুণ্যাশ্রমে অহল্যার সহিত বহুবর্ষ দীর্ঘতপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তখনও সে সিদ্ধাশ্রম পুণ্য প্রেমের পবিত্র আলোকে উজ্জ্বল ছিল। তাহার পর, একদা—

"তস্যান্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেষধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ॥
ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।
সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে॥"

বহুবৎসর মহর্ষি গৌতমের ন্যায় পুণ্যাত্মা পতিদেবতার সহবাস সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হইয়া অহল্যা এই পাপময় তপোবনবিরোধী অসৎকল্পনা শ্রবণ করিলেন! যে কথা কদাচ গৌতমের মুখে শোভা পাইত না, সেই কথা শুনিয়া অহল্যা শিহরিয়া উঠিলেন না। তিনি বুঝিলেন,— প্রার্থয়িতা গৌতম নহে, অন্য কেহ। তখন লজ্জা মলিন হইয়া গেল, সাধ্বীতেজ অন্তর্হিত হইল। স্বয়ং দেবরাজ মুনিবেশ ধরিয়া রতি-প্রার্থনায় দণ্ডায়মান, ইহা জানিবামাত্র

"মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ।"

এই মর্মাক্ষর বর্ণনার মধ্যে বাল্মীকিবর্ণিত অহল্যা চরিত্রের গুপ্তরহস্য নিহিত রহিল। কৌতূহলবিজড়িত উন্মত্ত উত্তেজনায় অহল্যার জন্মার্জ্জিত পুণ্য-প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া গেল! অহল্যা জানিয়া শুনিয়া দেবেন্দ্রের অঙ্কশায়িনী হইলেন! ইহাতে কে না অহল্যার নামে ধিক্কার দিবে? "অহল্যা— ছি! ছি!" —ইহা ভিন্ন আর কোন্ কথা মুখে আসিবে?

যদি কাহারও আহা! উহু! করিয়া অহল্যার সহিত কিছুমাত্র সমবেদনা প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা সমূলে বিনষ্ট করিয়া বাল্মীকি লিখিলেন:—

"কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ! গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো!
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ! সর্ব্বথা রক্ষ গৌরবাৎ॥"

ব্যভিচারিণী রমণীর ন্যায় পরপুরুষলিপ্সা চরিতার্থ হইবামাত্র অহল্যা কহিলেন,—"কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু আর বিলম্ব নহে, দেবরাজ! আপনার ও আমার উভয়ের গৌরবরক্ষার্থ শীঘ্র পলায়ন করুন।" এ অহল্যা যে যথার্থই দুর্মেধা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহার ন্যায় ব্যভিচারিণীর জন্য কে আর আহা! উহু! করিবে? যে অহল্যা ঋষিপত্নী বলিয়া সাধ্বীর মণি ছিল, সে অহল্যা একেবারে অধঃপাতে গেল; তাহার জন্য একবিন্দু অশ্রু—

একটিমাত্র দীর্ঘশ্বাস---লজ্জায় তাহাও পতিত হইবার সম্ভাবনা রহিল না! পাঠকচিত্ত কঠিন হইয়া উঠিল, পাপের শাস্তি দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল,---যেন অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক অঙ্গুলি অহল্যা ও ইন্দ্রের দিকে সঞ্চালিত হইল!

ইন্দ্র বা অহল্যা কেহই পলায়ন করিতে পারিলেন না। মহর্ষি গৌতম সহসা উটজদ্বারে উপনীত হইয়া সচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। অভিশাপে দেবেন্দ্র বৃষণচ্যুত হইয়া মেষবৃষণ সংযোগে চিকিৎসাগুণে সে যাত্রা বহুক্লেশে আরোগ্য লাভ করিয়া, তদবধি "মেষবৃষণ" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। আর অহল্যার কি হইল? গৌতম তাহাকেও অভিশপ্ত করিলেন :----

"ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি।
বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানা মাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি॥"

ইহাতে অহল্যা "পাষাণী" হইবার কথা নাই; ইন্দ্রের "সহস্রাক্ষ" হইবারও বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাহা পদ্মপুরাণের মত। যথা,---

"শাপদগ্ধা পুরা ভদ্রা রাম শক্রাপরাধতঃ।
অহল্যাখ্যা শিলা জজ্ঞে শতশীর্ষাকৃত স্বরাড়্॥"

পদ্মপুরাণের মতই এখন সর্বাধিক প্রচলিত। রামচরণসংস্পর্শে পাষাণী মানবী হইবার কাহিনীও পরবর্তী কালের কল্পিত কাহিনী। মূল রামায়ণে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। রামচন্দ্রের আশ্রমে উপনীত হইবার কথা রামায়ণে দেখা যায়, কিন্তু তাহা প্রাচীন টীকাকারদিগের মতে প্রক্ষিপ্ত---প্রামাণিক নহে।

বাল্মীকি বর্ণিত অহল্যা একদিনের এক মুহূর্তের চরিত্রস্খলনদোষে বহুবর্ষের জন্য অভিশপ্ত; সে কাহিনী এরূপ ভাবে বর্ণিত যে, তাহাতে অহল্যার জন্য কাহারও সমবেদনা জন্মে না। পাপের চিত্র অঙ্কিত করিবার সময়ে বাল্মীকি কোন কৈফিয়তের অবতারণা করেন নাই; তিনি পাপকে পাপের ভয়মূর্তিতেই চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার যথোপযুক্ত শাস্তি বিধানের সময়ে এরূপ সুকৌশলে দণ্ডব্যবস্থা করিয়াছেন যে, দণ্ডের কাঠিন্যের কথা পাঠকের মনে উদিত হইবার অবসর পায় নাই;---সকলকেই বলিতে হইয়াছে, "বেশ হইয়াছে; যেমন কর্ম তেমনি ফল!" আধুনিক কবিকল্পনা এই রামায়ণ

বর্ণিত অহল্যা চরিত্র রূপান্তরিত করিবার সময়ে সে চরিত্রের মূলতত্ত্ব কি, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

এ অহল্যা যেন সে অহল্যা নহে! এ অহল্যা মানবী,--স্বকার্য্যের পরিণামফলে পরিতপ্তা পাগলিনী,—বাহিরে রমণী, অন্তরে পাষাণী! পাপাচরণের ফলে অভিশাপবলে পাষাণী হয় নাই, পাপাচরণকালে পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া পাপাচরণ করিয়াছে!

কবিকল্পিতা পাষাণী অনিন্দ্য সুন্দরী পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকাবধূ:— শরীর ভরা যৌবন, যৌবনভরা লাবণ্য, আর লাবণ্যভরা ভোগলালসা লইয়া বৃদ্ধগৌতমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হইয়া, অজ্ঞাতপূর্ব্ব অশান্ত অতৃপ্তিতে নিয়ত তাড়্যমানা! তিনি যেদিন তপোবনশোভায় আত্মহারা হইয়া গান করেন,---

"আজি, স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,
ঘন মঞ্জু কুঞ্জ ভবনে,
মরি কি গান গাহিছে পাপিয়া!"

সেই দিনই প্রাণের অন্তস্তল হইতে কি যেন এক অব্যক্ত ব্যথা কেমন করিয়া সঙ্গীতচ্ছলে সুব্যক্ত হইয়া পড়ে!

"আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগিয়ে,
মম হৃদয় কাহার লাগিয়ে,
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া!"

এই ব্যথা অহল্যাকে তপোবনের শান্তি সুখ উপভোগ করিতে দেয় না! সেখানে প্রভাতের শঙ্খনাদ, মধ্যাহ্নের দীর্ঘধ্যান, সায়াহ্নের সামগান,--ঋত্বিক্ মণ্ডলীর যাগযজ্ঞ, অহল্যাকে যেন যন্ত্রের মত চালাইয়া লয়, প্রাণে কোন তৃপ্তিদান করে না। সহচরী পূজায় বসিলে, অহল্যা সুশীতল বটবৃক্ষ মূলে আশ্রয়লাভের জন্য ছট্‌ফট্ করে; চিরাশ্রমানা সহচরীকে ভৎর্সনা করিয়া বলে :---

"এসেছিস্ এতক্ষণে?— ধন্য তোর পূজা!
ঘন্ধ দ্বিপ্রহর দিবা। আর লো মাধুরি!
বসি গিয়া সুশীতল বটবৃক্ষমূলে।"

স্বাধীন কৌমার সুখময় ছিল, কি এমন পরাধীন যৌবন সুখময় হইয়াছে,---- অহল্যা তাহার মীমাংসা করিবার জন্য নিয়ত চিন্তামগ্ন! ক্ষণে ক্ষণে বলিয়া উঠে,---

"ছিলাম না সুখিনী কি কৌমার-জীবনে
এর চেয়ে?"

এইরূপ তপোবনবিরোধী অশান্ত হৃদয় লইয়া অহল্যা নিবৃত্ত ভোগাভিলাষিণী,---বৃদ্ধ গৌতমের সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী নহে। সুতরাং পাঁচ বৎসরের কৃত্রিম তপস্যায় তাহার কি হইবে? সে যাহা ছিল, তাহাই রহিয়া গিয়াছে! পিঞ্জরে আসিয়াও মুক্তগগনে বিচরণ করিবার জন্য পক্ষপুট নিয়ত চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে! সে যেন অবসরের অপেক্ষায় দিন দিন অধীরা হইয়া উঠিতেছে! সহচরী মাধুরী তাহাকে সৌভাগ্যবতী গৌতমপত্নী বলিয়া সম্বোধন করিলে, তাহার মনের কথা ফুটিয়া বাহির হয়:—

"———— বলিতে পারি না,
তিনি জ্ঞানী, তিনি শাস্ত্র বিশারদ, তিনি
ধার্ম্মিক মাধুরি! কিন্তু রমণী হৃদয়
তাঁর প্রার্থী নহে সখি!"

অহল্যা যখন এইরূপে স্বামীসুখবঞ্চিতা, স্বামী সহচারিণী হইয়াও অন্তরে অন্তরে চিরবিরহিণীর ন্যায় নিয়ত ক্লিষ্টমানা, সেই সময়ে বৃদ্ধ গৌতম তীর্থযাত্রার জন্য বিদায় লইতে আসিলেন। এইবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সূত্রপাত হইল, রুদ্ধবাষ্প ভীমনিনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, গলিত ধাতুস্রাবে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহার পূর্ব্বসূচনায় অহল্যা কহিল,—

"তুমি কার কাছে
আমারে রাখিয়া যাবে?"

অহল্যা গ্রীবা হেলাইয়া চক্ষু বাঁকাইয়া উপহাসের সংযুক্ত উচ্চহাস্যে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল গৌতম জ্ঞানী, শাস্ত্র বিশারদ, ধার্ম্মিক হইলে কি হইবে? তিনি এই ভাব নিহিত সহজ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার একমাত্র উত্তর দিলেন,—

"——সতী সাধ্বী যাহ
পতি স্মৃতি ধ্যান করি।"

অধঃপাতের সূত্রপাত হইল। অহল্যা কহিল :—

"——প্রভু, ধ্যান করি
মিটেনা আকাঙ্ক্ষা। হায়! মিটে কি পিপাসা
পুষ্করের চিত্র পটে?"

ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্ট করিয়া কহিল। গৌতম তদুত্তরে এইমাত্র বলিলেন—"ছি! বিপ্র হইয়া বিপ্রের কর্ত্তব্য ভুলিয়া, প্রেয়সীর অঞ্চল ধরিয়া থাকা কি তাহার পক্ষে শোভা পায়? তাহা যে নিতান্তই অসম্ভব!"

অহল্যা এতক্ষণে জ্ঞান হারা হইল; নারীর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিল, কিন্তু রোদনে ফল হইল না; রুদ্রতেজে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সে গর্জ্জনেও ফল হইল না! তখন অহল্যা কহিল,—

"——যদি না থাকিবে,
বিবাহ করিলে কেন? বাঁধিলে আমার
কৈশোর তোমার শীর্ণ বার্দ্ধক্যের সনে?"

তথাপি বৃদ্ধস্বামী চলিয়া গেল। কেবল পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—সেই তৃপ্তিহীন তপোবন, আর বিফল—যৌবনা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা! সে বুঝিল,—

"এত রূপ! এ পূর্ণ যৌবন! সব বৃথা?
ধরিয়া রাখিতে তবু পারিলিনা হায়!
এ স্ত্রৈণ স্থবির মূঢ় গৌতমে? হা ধিক্!
চলিয়া গেল সে দৃঢ় চরণে? চাহিয়া
শুষ্কনেত্রে, যেন গাঢ় অনুকম্পাভরে
মোর পানে? হা রমণি! করিস্ না তুই
দুর্ব্বল নিষ্ফল এই রূপের গৌরব।"

এইরূপে বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। একদিন যে তাহার তাড়নায় জীবন মৃত্যু অপেক্ষাও কঠোরমূর্ত্তি ধারণ করিবে, সে কথা ভাবিয়া দেখিবার অহল্যার আর অবসর রহিল না। সে পাষাণী হইল,—পাষাণ পীড়নে গৌতমের স্মৃতিচিহ্ন চূর্ণ হইয়া গেল!

রামায়ণের অহল্যা কেবল তিরস্কারের পাত্রী। কিন্তু কবিকল্পিতা

অহল্যা কৈফিয়ত লইয়া অবতীর্ণা। তাহাকে কৃপাপাত্রী সাজাইবার জন্ত সমগ্র কাব্যের ভিতর দিয়া কবিকণ্ঠ যেন অস্ফুটস্বরে কহিতেছে :— "বৃদ্ধস্ত তরুণী ভার্য্যা বৃদ্ধস্বামীর ধ্যানমাত্র অবলম্বন করিয়া বিরহ যাপন করিতে পারিলে কাল্পনিক নারীচরিত্র সুরক্ষিত হইতে পারে; অহল্যা রক্তমাংসের জীব; সে অসম্ভবের সঙ্গে সংগ্রামে পরাভূত বলিয়া, তাহার অপরাধ কি? আহা! সে যে পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকামাত্র,— তাহাকে তোমরা কি বলিয়া তিরস্কার করিবে?"

এইভাব আরও ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত কবিকল্পনা রতি ও মদনের সহায়তায় অহল্যাকে একেবারে উন্মত্তা করিয়া তুলিল; তাহার আর আত্মসংযমের চেষ্টা বা সতর্কতামাত্র রহিল না। সেই সময়ে সকল মাধুর্য্য দেবরাজ তপোবনে অতিথি হইলেন। রামায়ণের অহল্যা ইন্দ্রকে চিনিয়া ইন্দ্রাভিলাষিণী হইয়াছিল। এ অহল্যা ইন্দ্রকে চিনিল না; পরিচয় পর্য্যন্তও জিজ্ঞাসা করিল না। অতিথি পুরুষ — ইহাই যথেষ্ট। অহল্যাই তাহাকে প্রথমে আকর্ষণ করিল। অতিথি কহিলেন :— "তাপসি! তোমার নাম কি?" অহল্যা কি কহিবে? সে কহিল,—

"অহল্যা!— না সখে
মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আমি শুদ্ধ নারী;
কোন নাম নাহি মোর।"

মানুষকে কখন কখন এইরূপে নামোপাধি ভুলিয়া, কেবল নররূপে বা নারীরূপে পরিণত হইতে হয়। তখন সাধারণ নর নারীর স্বাভাবিক সংস্কার হিতাহিতের একমাত্র নিয়ামক হয়; শিক্ষা দীক্ষা ভাসিয়া যায়; ভদ্রতা শীলতার কৃত্রিম খোলস খসিয়া পড়ে; মানুষ মানুষের নিকট নগ্নবেশে দণ্ডায়মান হয়! এই অবস্থায় পাষাণী কি না করিল? সতীত্ব অতল জলে ডুবাইয়া দিল, স্নেহ শিলাপৃষ্ঠে চূর্ণ করিয়া ফেলিল, পুত্রহত্যা করিয়া মহেন্দ্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া গৃহত্যাগিনী হইল!

কিছুকাল গোপনে মহেন্দ্রের সুসজ্জিত প্রমোদ ভবনে দীর্ঘ দিন আর দীর্ঘরজনী বিরাম বিহীন বিলাসস্রোত প্রবাহিত হইল। অবশেষে একদিন মহেন্দ্র কহিলেন, "অহল্যা, আশ্রমে ফিরিয়া যাও!" অহল্যা প্রথমে কিছুই

বুঝিতে পারিল না, অথবা বুঝি ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে চাহিল না। কিন্তু মহেন্দ্র স্পষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিলেন,---

"অহল্যা বালিকা নহ তুমি। বুঝ না কি
যে বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম এত দিন,
তাহা প্রেম নহে, তাহা লিপ্সা ?"

অহল্যাতে প্রেম আর মহেন্দ্রে ভোগলিপ্সার আরোপ করিয়া কবিকল্পনা অহল্যার কৈফিয়ৎ সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছে। অহল্যা পাগলিনী হইল। পথে পথে পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া চলিল। কোথায় ? অহল্যাও জানে না---- সে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে ! কেবল কবিকল্পনা তাহার পশ্চাত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে হায় ! হায় ! করিতে করিতে ছুটিয়া চলিল !!

সে পাশ্চাত্তাপের মধ্যেও কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা নাই; প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ের মর্মদাহের সঙ্গে ভোগ্যালিপ্সা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। দেবেন্দ্র প্রস্থানোদ্যত হইলেও অহল্যা ("সহসা ধরিয়া পদতলে পড়িয়া") কাঁদিয়া কহিতেছে :—

"———— কোথা যাও ?
যাইও না প্রিয় ! এখনো যুবতী আমি;
দশবর্ষ ধরি পান করিয়াছ বটে
এরূপে তীব্র সুরা; পাত্রে চেয়ে দেখ
আরো আছে ! আরো দিতে পারি। দেখ চেয়ে
এই ঘন দীর্ঘ কেশগুচ্ছ; এই শুভ্র
কুন্দ দন্তপাতি; এই সুগোল সুঠাম
তন্বী দেহলতা এই লালসা-বিহ্বল
আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু; রক্ত বিম্বাধর;
পীন বক্ষ;— যত চাহো দিব, যত চাহ
পান কর।— যাইও না।

যখন সমস্ত কাকুতি নিষ্ফল হইল, তখন অহল্যার পশ্চাত্তাপ অগ্নমূর্তি ধারণ করিয়া "কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া ইন্দ্রের বক্ষে আমূল আরোহণ" করিল; ইন্দ্রের পতন, ভয়ে মদন রতির পলায়ন এবং তৎ সমকালে অহল্যার

বিকট আর্তনাদ শ্রুত হইল :—

"—এই হস্তে ধরিয়াছি আপন সন্তানে,
রুদ্ধ করিয়াছি তার তপ্ত ধমনীর
দ্রুত রক্ত স্রোত; আজি— লইয়াছি আজি
এই হস্তে, এই রক্তে তার প্রতিশোধ!
—দেখিয়াছ এতদিন রমণী প্রেমিকা
দেবরাজ? দেখ আজি রমণী ভৈরবী!
হাঃ হাঃ! এইখানে মরো, এইখানে পচো।
করুক ভক্ষণ বন্য শৃগাল শকুনি!"

তাহার পর অহল্যা যখন কাঙ্গালিনীর ন্যায় পথে পথে ভ্রাম্যমানা, তখনও তাহার পশ্চাত্তাপের মধ্যে অনুশোচনা নাই,— কেবল সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র তিরস্কার!

"আমি কলঙ্কিনী সত্য। কিন্তু কার দোষে?"

ইহাতে যে অহল্যার নিজের কিছুমাত্র দোষ ছিল বা থাকিতে পারে, সে কথা মনে পড়িলনা;— সে এমনই পাষাণী হইয়া গিয়াছে যে একেবারে সমস্ত স্মৃতি বিলুপ্ত হয়নাই, এখনও ব্যাভিচারের সুখস্মৃতি জল্ জল্ করিতেছে' সেই স্মৃতিধ্যানে অহল্যা আত্মপরাধ ঢাকিয়া রাখিয়া কহিতেছে:—

"আমি কলঙ্কিনী সত্য। কিন্তু কার দোষে?
কে রোপিয়াছিল এই স্বর্ণ লতিকারে
নীরস পাষাণস্তূপে? কে বা প্রলোভনে
ভুলাইল অসহায়া দুর্বলা রমণী?
কে তাহারে নিক্ষেপিল করিয়া সম্ভোগ
শূন্যপাত্র সম, পান করি তীব্র সুরা?
নহে সে নির্মম ক্রূর পুরুষ? তথাপি
শুদ্ধ আমি দোষী একা সমাজ বিচারে,

তারপর অহল্যার অনুতপ্তজীবনের দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভিতর দিয়া কবি কেবল তাহার অসহায় অবস্থার কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তাহার দীর্ঘোচ্ছ্বাসের মধ্যে অনুতপ্তের আত্মগ্লানির গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা পরপক্ষারিক্তা

পতিতা রমণীর প্রতি আন্তরিক কৃপার ভাবই সমধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে! পুরুষপ্রতারিতা অহল্যা যখন পুরুষজাতের উপর বিশ্বাস হারাইয়া তপোবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, গৌতম তখন কৈলাসে; তপোবন তখন জনসমাগমশূন্য তৃণলতাসমাচ্ছন্ন বিজন বন, সে সুরসম্পূজিত পবিত্র পুণ্যাশ্রম

"পরিত্যক্ত ভগ্নচূড়
আচ্ছন্ন উদ্ভিদে।"

অহল্যা তাহারই মধ্যে পশুপক্ষীর সহচরী হইয়া একাকিনী হায়! হায়! করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেখানেই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামলক্ষ্মণ আসিয়া উপনীত হইলেন সেখানেই রামের উপদেশে অহল্যার চেতনা হইল। অহল্যা কিরূপে আবার স্বামী সংগতা হইবে, তজ্জন্য পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইল!

রাজর্ষি জনকের সভায় আসিয়া অহল্যা স্বামীসন্দর্শন লাভ করিল। বৃদ্ধ গৌতম তাহাকে দেখিবামাত্র বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন! অভিশাপ দিবেন কি, নিজেই বলিয়া উঠিলেন :--

"-----শাস্তি দিব? হায়!
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মূঢ়মতি,
দুর্ব্বল মনুষ্য নিজে; সাধ্য কি আমার,
কর্ত্তব্য স্খলিত মূঢ় মনুষ্য উপরে
বসিব বিচারাসনে?"

বিশ্বামিত্রের বিশ্বাস ছিল, তিনি তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। রাজর্ষি জনক তাহা স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, "ক্ষমাগুণে ব্রাহ্মণ বহু উচ্চে অবস্থিত।" আজ বিশ্বামিত্র তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিলেন :---

"————— —— এত উচ্চে?
এত উচ্চে তুমি? এত পবিত্র, মহৎ (?)
এত ক্ষমাশীল? এত উদার? ব্রাহ্মণ!
অবনত করি শির।"

বলা বাহুল্য, রামায়ণ অবলম্বন করিলে, ইহার কোন চরিত্রই এরূপে

চিত্রিত হইতে পারিত না। রামায়ণ বর্ণিত অহল্যা ও গৌতম অন্যভাবে চিত্রিত! তাই কবিকল্পনা পুরাতন চিত্রপটের নামে এক অভিনব চিত্রপটের অবতারণা করিয়াছে। কোন্ চিত্র কেমন স্বাভাবিক, কেমন সুন্দর, কেমন সুকৌশল বিন্যস্ত, তাহার আলোচনা করিব না। লোকশিক্ষার্থ কোন্ চিত্র কিরূপ উপযোগী, তাহারই আলোচনা করিব।

কবিকল্পনা যে অভিনব অহল্যাচরিত্রের অবতারণা করিয়াছে, সেকালের মহিলামণ্ডলী তাহার হাব ভাব লাবণ্যভরা বাক্ চাতুরী দেখিলে নিশ্চয়ই বলিতেন — "তোমার গলায় দড়ি! স্বামী বৃদ্ধ হইলে, বা অকর্ম্মণ্য হইলেই বুঝি স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারে অধিকার জন্মে?" পাপ সকল অবস্থায় পাপ,—তাহার দুই দশটা কৈফিয়তের কদাচ অভাব হয় না। শিক্ষিত মাতাল মদের দোষ স্বীকার করিয়াও, এইরূপ দুই দশটা সরস কৈফিয়ৎ শুনাইয়া থাকে! কিন্তু লোকশিক্ষা যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে সে সাহিত্যে পাপের চিত্রকে কৈফিয়তের বলে মুখরোচক করায় ক্ষতি আছে। এখন দিন কাল যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে নারী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইবার জন্য ব্যগ্র। প্রকৃতির অনুগামিনী হইয়া পরাধীনতার মধ্যে স্বাধীনতার রসাস্বাদে তাহার তৃপ্তি হয় না। সে থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠে,— আপন গণ্ডা বুঝিয়া লইতে চাহে, পতিদেবতার উপর চব্বিশ ঘণ্টা খাড়া পাহারা দিয়া তাহাকে আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলাও মনে করে যথেষ্ট হইল না। যাহারা স্বামী সোহাগিনী তাহাদের দশা এই। কিন্তু নারীমাত্রেই স্বামী সোহাগিনী হইতে পারে না; অনেকের ভাগ্যে অহল্যার ন্যায় বৃদ্ধস্বামী কণ্ঠলগ্ন কাঁটার ন্যায় কষ্টদায়ক হওয়া বিচিত্র নহে! তাহাদের হাতে 'পাষাণী' পড়িলে, তাহারা ইহার ছত্রে ছত্রে কি শিখিবে? অহল্যার পশ্চাত্তাপের দুর্দ্দশার চিত্র বিফল হইবে; তাহার মুখ রোচক কৈফিয়ৎগুলিই কি মুখর হইয়া উঠিবে না?

বাল্মীকির অহল্যা, আড়ম্বরহীনা;—তাহার চরিত্রে এক সুমার্জ্জিত কৈফিয়ৎ নাই। সে চরিত্র লোমহর্ষণ পাঠক চিত্তকে সংযত করিত,—বিনা তর্কে পাপের বিভীষিকা দেখাইয়া পাষাণীকে মানবী করিত। আর এ চিত্রে মানবী পাষাণী হইবার আশঙ্কা আছে! সর্ব্বজনপরিচিত পুরাতন

চরিত্র অবলম্বন করিয়া, তাহার নাম মাত্র স্থির রাখিয়া, মূলতত্ত্ব পরিত্যাগ করায়, বৃদ্ধ বাল্মীকির উদ্দেশ্যকে বিফল করা হইয়াছে। দৃশ্যকাব্য যথেষ্ট মুখরোচক হইয়াছে, এবং তজ্জন্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য আরও বিফল হইয়াছে!

বঙ্গসাহিত্যের গতি কোন্ দিকে? "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" এই পুরাতন ঋষিবাক্যের প্রথমাংশ এখন বড় উজ্জ্বল বর্ণে বঙ্গ সাহিত্যে চিত্রিত হইতেছে। কাব্য ও উপন্যাস সম্ভোগাত্মক সৌন্দর্য্যকেই একমাত্র কাব্য সৌন্দর্য্য জ্ঞানে অতিরিক্তমাত্রায় তাহারই অনুশীলন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে! ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নাই;---- প্রতিবাদ করিলে, সমালোচকের মুখ দেখাইবার পথ নাই; তাঁহাকে ঘরে বাহিরে নিতান্ত "অরসিক" বলিয়া লাঞ্ছিত হইতে হয়।

সামাজিক রোগের সকল ... ব্যক্ত হইতে পারে না। এখন সম্ভোগাত্মক সৌন্দর্য্যের বড় বাড়াবাড়ির দিন,---- এদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবর্ত্তে এরূপ সুমিষ্ট সাহিত্য কুপথের ন্যায় ... প্রভাব বর্দ্ধিত করিয়া দিবে। কিন্তু কাব্য সৌন্দর্য্য লোলুপ লেখক ও পাঠক পাঠিকার সে দিকে লক্ষ্য নাই। তাঁহারা সংসারে কিরূপ ... বিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছেন, নিরবধি কালই তাহার একমাত্র ... বিচারক। সে বিচারের অগ্নিপরীক্ষায় পড়িয়া কালে আমাদিগকে ... হইতে না হয়, এইভাবে কাব্যসৌন্দর্য্য বিস্তার করাই নিরাপদ। পাষাণী যেভাবে রচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে "অহল্যা উদ্ধার" বলিলেই ঠিক বলা হয়। বাল্মীকির অহল্যার কৈফিয়ৎ ছিল না; তাহার সঙ্গে কৈফিয়ৎ সংযুক্ত করিবার জন্য কবিকল্পনা প্রৌঢ়াকে নবোঢ়া করিয়া সাহিত্যের তীব্র তিরস্কার হইতে অহল্যাকে উদ্ধার করিয়াছে। কেবল সীতা উদ্ধারের ন্যায় এ অহল্যা উদ্ধারে লঙ্কাকাণ্ড সংঘটিত হয় নাই,---- ইহাই যাহা কিছু পার্থক্যের কথা!

কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? প্রাচীন সাহিত্যের সুপরিচিত চরিত্র লইয়া প্রাচীন সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিফল করিয়া নব্য-সাহিত্যের অবতারণা না করিলে ক্ষতি কি? বোধ হয়, গ্রন্থশেষে কবির হৃদয়েও এইভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি গ্রন্থ প্রতিপাদ্য প্রকৃত

তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য একটি গীতে গ্রন্থসমাপ্ত করিয়াছেন। যথা;—

"বইছে বেগে প্রেমের সিন্ধু উঠছে পড়ছে প্রেমের ঢেউ,—
কেউবা খাচ্ছে হাবুডুবু, ভেসে চোলে যাচ্ছে কেউ।
কারো বক্ষে এ প্রেম আনে অবিচ্ছিন্ন পরম সুখ;
মর্মদাহে বহে এ প্রেম কারো বক্ষে জাগরূক।
প্রেমে লিপ্সা, প্রেমে ঈর্ষা, প্রেমে পুণ্যপরিণয়;—
কারো ভাগ্যে বিষের ভাণ্ড, কারো ভাগ্যে সুধাময়।
প্রেমের টানে টেনে আনে জনার্দনে সবার জীব,
পাগল, উদাস শ্মশানবাসী প্রেমে ভোলা সদাশিব।
কেউবা প্রেমে সর্বত্যাগী কেহবা চাহে উপভোগ;
কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি, কারো পক্ষে মহাযোগ;
প্রেমে জন্ম, প্রেমে মৃত্যু, প্রেমে সৃষ্টি প্রেমে নাশ;
প্রেমের শব্দ উঠে মর্ত্যে, প্রেমে স্তব্ধ নীলাকাশ।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন। ভাদ্র রবিবাবুর 'চোখের বালি' যতই পড়িতেছি, আমাদের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। উপন্যাসখানি বাঙ্গলা উপন্যাস শ্রেণীতে যে উচ্চ আসন পাইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 'সাগর কথা', 'কেকাধ্বনি' পড়িয়া সুখী হইতে পারিলাম না। শুনিতে পাইলাম শৈলেশ বাবু আর একখানি মাসিক পত্র বাহির করিবেন। বঙ্গদর্শনের নিমিত্ত প্রেরিত অমনোনীত প্রবন্ধগুলি সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা শৈলেশ বাবুকে শীঘ্র শীঘ্র তাহা বাহির করিতে অনুরোধ করি। 'সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনা' একটি দার্শনিক সন্দর্ভ। 'রাষ্ট্র ও নেশন' রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর একটি বহুগবেষণাপূর্ণ সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ। নবীন কবি প্রমথ বাবুর 'অনুনয়' পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। 'গ্রন্থ সমালোচনায় সাবেকি চোট্ ষোল আনায় আছে।*

---

* এবার স্থানাভাব বশতঃ অন্যান্য মাসিক পত্রের সমালোচনা বাহির হইল না। উঃ সঃ।

ভিক্ষা।

আজি এ কাঙ্গাল কবি দুয়ারে তোমার
দাঁড়ায়ে প্রকৃতি রাণি। অনন্ত বিস্তার
এ ভব ভাণ্ডার তব। চাঁদের কিরণ,
কামিনীর কমকণ্ঠ, কোকিল কূজন,
কল নিনাদিনী নদী, সান্ধ্য সমীরণ,
তোমারি বিভব-কথা করিছে কীর্ত্তন
শ্রবণ-রঞ্জন।

এত যে ঐশ্বর্য্য তব বিশ্ব বিনোদিনী,
তবু এ কাঙ্গাল তব রাঙ্গা পাদুখানি
ধরি দাঁড়ে চাহে শুধু শান্তি সুধা পিতে,
মাগে ভিক্ষা,— যাহে ঢাকা অন্ধ আঁখি পাতে
ফুটে তব স্বরূপ সুন্দর,
প্রাণ-মন-হর।

চাহে অনুভূতি, মাগো অবিমিশ্র সুখ
নহে এই জগতের। সুখ কিম্বা দুঃখ
তোমারি ঘটনা। তব কঠোর শাসন
পুণ্য কর্ম্ম ফল ভোগ করে জীবগণে।
তুমি প্রাণ, তুমি জ্বালা, তুমি তার শান্তি,
তুমিই যৌবন, জরা আনিছ নিয়ত
মরণ কুহেলী। তুমি তীব্র হাহাকার,
তুমিই সান্ত্বনা। তুমি শত রবিকর
তুমি ঘন অন্ধকার। কটাক্ষভীষণ
এক নেত্রে, অন্যে বহে প্রেম-প্রস্রবণ
পূত পুণ্যধারা। নবোদ্গত, জরাক্লিষ্ট,
তোমারি দ্বিভুজ বাধা— শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রবাদপ্রসঙ্গ।

(২)

শরীরং ব্যাধি মন্দিরং—

দুঃখোপকার সচ্চর্য্যা জ্ঞানং যত্র ন তাদৃশং।
বৃথা বহতি তজ্জীবঃ শরীরং ব্যাধি মন্দিরং ॥(১)

যৎকালে হনুমান সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কাপুরীতে গমন করেন, তৎকালে সমুদ্রমধ্যস্থিত গিরিবর মৈনাক, তাঁহার সুবিশাল পাষাণময় দেহোপরি ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করেন। মৈনাক আরও বলেন যে, যদি তুমি আমার আতিথ্য স্বীকার না কর তবে আমার এ দেহ ধারণ বৃথা। যে হেতু পরোপকার এবং সদাচার জ্ঞান যাহার দেহে স্ফূর্ত্তি না পায়, তাহার ব্যাধিমন্দির এই দেহ ধারণ করা বৃথা।

• • •

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে এই প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কবি সংসারে কোন্ কোন্ বস্তু পরিত্যাজ্য তাহা দেখাইবার ছলে বলিয়াছেন,—

বরং শূন্যশালা ন চ খলু বরো দুষ্টবৃষভো
বরং বেশ্যা পত্নী ন পুনরবিনীতা কুলবধূঃ।
বরং বাসোঽরণ্যে ন পুনরবিবেকাধিপপুরে
বরং প্রাণত্যাগো ন পুনরধমানামুপগমঃ॥

দুষ্ট বৃষ অপেক্ষা শূন্য গোয়াল বরং ভাল, বেশ্যা সহবাসও বরং ভাল তথাপি কুলটা স্ত্রী গ্রহণ করিতে নাই, অরণ্যে বাসও অতি ভাল, অতি সুখকর তথাপি অবিবেচক রাজার রাজ্যে বাস করা উচিত নয় এবং মৃত্যুও অতি ভাল তথাপি অধমের নিকট যাচ্ঞা করিতে নাই।

(১) বাশিষ্ঠ রামায়ণ।

প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।

হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

এক ব্রাহ্মণের চারি কন্যা ছিল। কন্যাচতুষ্টয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পিতা একে একে তাহাদিগকে সৎপাত্রে অর্পণ করিলেন। কিয়দ্দিবস পর চারি জামাতাই এককালে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিল। তাহারা জামাইভোগে আহার ও আমোদ আহ্লাদে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। এই রূপে অনেক দিবস কাটিয়া গেল। জামাতারা বাড়ী যাওয়ার নামও করে না। ইহাতে ব্রাহ্মণের অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হইল। এবং তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে একদা জ্যেষ্ঠ জামাতা হরিকে ভোজনকালে অন্নে ঘৃত দিলেন না। ইহাতেই হরি অনাদর করিল ভাবিয়া প্রস্থান করিল। তৎপরদিবস দ্বিতীয় জামাতা মাধবকে বিনা পীঠে বসিবার আসনে মৃত্তিকায় বসিয়া আহার করিতে বলায় সেও জ্যেষ্ঠের পদানুসরণ করিল। তৃতীয় পুণ্ডরীকাক্ষকে কদন্ন আহার করিতে দেওয়ায় সেও অপমান বোধে প্রস্থান করিল। কিন্তু কনিষ্ঠ জামাতা ধনঞ্জয় আর কিছুতেই নড়ে না,—তাহার কিছুতেই অপমান বোধ হয় না। বিশেষতঃ তিনজন শালি ও দুইজন সম্বন্ধীর স্ত্রীর ভালবাসায় ও মধুমাখা কথায় আত্মহারা হইয়া উঠিল। অতঃপর একদিবস তাহার সম্বন্ধীরা তাহার সহিত কথায় কথায় কলহ উপস্থিত করিয়া গুরুতর প্রহার করিল। বেচারি ধনঞ্জয় প্রহার খাইয়া অন্তর্হিত হইল। তদবধি অতিশয় প্রহার করা অর্থে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" ব্যবহৃত হয়। এইরূপ—

ঊর্দ্ধং বহতি

বলিলেও বেশ উত্তম সম্মান দেওয়া বুঝায়। কিন্তু এ প্রবাদ বাক্যটি পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে বিশেষতঃ রাজসাহী জেলাতে সবিশেষ প্রচলিত। এই উক্তিটি পিণ্ডদানের মন্ত্রের মধ্যে আছে। যথা

"ঊর্দ্ধং বহন্তিরমৃতং ঘৃতং, পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়তমে পিতৄন্।"

• • •

বা। ভিক্ষা মরণে রণে।

উৎসাহ।

পুরাকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে স্বর্ণবতী নগরে বর্দ্ধমান নামক এক বণিকের নন্দক ও সঞ্জীবক নামে দুইটি বলীবর্দ্দ ছিল। একদা বর্দ্ধমান উহাদিগকে শকটে যোজনা করিয়া পণ্যদ্রব্য লইয়া কাশ্মীর যাত্রা করিল। পথমধ্যে সঞ্জীবকের একখানি পদ ভগ্ন হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠী তথায় উহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য একটি বলীবর্দ্দ ক্রয় করিয়া শকট লইয়া চলিয়া গেল। কিয়দ্দিবসের মধ্যে সঞ্জীবক সুস্থ হইল এবং অরণ্যে অবস্থান করিয়া ও ইচ্ছামত নবকিশলয়ে উদর তৃপ্তির জন্য পাইয়া পরিপুষ্ট হইল। একদা তথাকার বনের রাজা সিংহ নদীতে জলপান করিতে যাইয়া, সঞ্জীবকের বিশালতনু ও অকাল মেঘগর্জ্জনের ন্যায় রব শুনিয়া সভয়ে নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিল।

অনন্তর সঞ্জীবকের সহিত সিংহের অত্যন্ত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইল। সঞ্জীবক [illegible] রাজা তাহার বশ হয়। ইহাতে মন্ত্রীপুত্র করটক ও দমনক নামক দুই শৃগালের অত্যন্ত ঈর্ষা হইল। উহারা তাহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ জন্মাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস এইভাবে অতিবাহিত হইল। একদা দমনক রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—"মহারাজ, আপনি পুরাতন ভৃত্যদিগকে অবজ্ঞা করিয়া আগন্তুকের পুরস্কার করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। কারণ দোষগুণ নির্ব্বাচন না করিয়া একজনকে অনুগত বা নিগ্রহ করিলে নিজেরই অমঙ্গল হয়। [illegible] আপনার [illegible] [illegible] উদ্ভাবন করিয়াছে।"

রাজা বলিল,—"একথা আমার বিশ্বাস হয় না। সঞ্জীবক আমার অনুগত [illegible]। সে কখনও আমার অনিষ্ট চিন্তা করিতে পারে না। [illegible] কোন অনিষ্ট করিতে যায়, তবে তাহা [illegible]। কেননা অগ্নিতে স্বর্ণ [illegible] ভস্মীভূত হইলে কি লোকে অগ্নির অনাদর করে?"

"যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিতে পারেন" বলিয়া দমনক রাজার নিকট হইতে বিদায় হইল। পুনঃ সঞ্জীবকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"বন্ধো! রাজাদেশে আজ তোমাকে আমার গুপ্ত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। রাজা আদেশ করিয়াছেন যে, সঞ্জীবককে বিনাশ করিবা

তাহার রক্তে পিতৃ পিতামহের তর্পণ করিব।"

শৃগালের কথা শুনিয়া বলীবর্দ্দ অত্যন্ত চিন্তিত হইল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করার পর বলিল,—"আমি ত রাজার কোন অনিষ্ট করি নাই, তবে কেন তিনি আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিতেছেন? আমি কখনো কোন প্রাণী বধ করি নাই, শস্পাদি দ্বারাই প্রাণধারণ করিয়া থাকি। যাহা হউক এখন আর চিন্তার সময় নাই। যদি নিতান্ত যুদ্ধ করিতে হয় তবে যুদ্ধ করিয়া মরিব। যদি পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় না থাকে, তবে পণ্ডিতেরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। আর

জিতেন লভ্যতে লক্ষ্মীর্মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণবিধ্বংসিনঃ কায়াঃ কা চিন্তা মরণে রণে॥(৩)

জয় হইলে রাজলক্ষ্মী লাভ হয়, মৃত্যু হইলে দেবকন্যা পাওয়া যায়। জীবন ক্ষণকালস্থায়ী অতএব যুদ্ধে মরিতে চিন্তা কি?

অন্যচ্চ— যদি কৃষ্ণপদে চিত্তং ভক্তিযুক্তং সদা ভবেৎ।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥(৪)

যদি কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি থাকে, তবে বিষম দুর্গমে অথবা সমরে মরণেই বা চিন্তা কি?

• • •

ভেড়ার মধ্যে বাছুর পরামাণিক।

এটী "হংসমধ্যে বকো যথা" হইতে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। হংসের মধ্যে বক শোভা পায় না, ভেড়ার মধ্যেও তদ্রূপ বাছুর শোভা পায় না বা হীন পাওয়ার যোগ্য নয়।

পুরাকালে পাটলিপুত্রাধিপ সুদর্শন তদীয় পুত্রের মূর্খতা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিষাদের সহিত এতন্নাম শ্লোকটি বলিয়াছিলেন,—

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা॥(৫)

যে মাতা ও পিতা পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস না করান, তাহারা শত্রু। হংসমধ্যে যেমন বক শোভা পায় না, তদ্রূপ মূর্খও বিদ্বজ্জনসমাজে শোভা পায় না।

"ভেড়ার মধ্যে বাছুর পরামাণিক" এ বাক্যটি বোধ হয় অনেকেই লিখ

(৩) হিতোপদেশ। (৪) ঋষিবাক্যং। (৫) হিতোপদেশ।

নিজ বাড়ীতে স্ত্রীলোকদিগের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। আহারাদির পর যখন তিন চার বাড়ীর স্ত্রীলোক একত্র হইয়া খোস গল্প করিতে থাকেন, তখন যদি কোন বালক তথায় গোলযোগ কিম্বা তাহাদিগকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—"যা, বাহিরে যা। এখানে কি কর্‌ছিস্? — মাগীর (মা ছেড়ার) মধ্যে বাছুর পরামানিক।"

• • •

যঃ পলায়তি স জীবতি।

এক ব্যাধ কপোত ধরিবার অভিপ্রায়ে শরীর আবৃত করিয়া জাল লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। সে ক্রমে ক্রমে কপোতদের নিকটবর্ত্তী হইলে এক বৃদ্ধ কপোত তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল,—

চিরকালং বনে বাসশ্চলদ্বৃক্ষং ন দৃষ্টবান্।
অবিচার পুরীষদায়ং যঃ পলায়তি স জীবতি॥

বহুকাল হইতে আমরা এই বনে বাস করিতেছি কিন্তু কখনও চলদ্বৃক্ষ দেখি নাই। অতএব অবিচার পুরীষ দোষ যুক্ত যে পলায়ন করে সেই রক্ষা পায়।

• • •

দাসীর শ্রাদ্ধে দান সাগর।

কোন একটা সামান্য কার্য্যের জন্য বৃথা আড়ম্বর করিতে দেখিলেই লোকে বলিয়া থাকে, "দাসীর শ্রাদ্ধে দান সাগর।" কিন্তু একজন প্রকৃতই দাসীর শ্রাদ্ধে দান সাগর করিয়াছিলেন। তিনি আর কেহ নয়, রোজাইদের সেই [illegible] রাজা ৺ রাজমোহন রায়। বড় লোকদের ছেলেরা যেমন শৈশবাবস্থায় দাসী কোলে লালিত পালিত হয়, রাজমোহনও তদ্রূপ এই দাসী কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। রাজমোহন তাহাকে 'দাইমা' বলিয়া ডাকিতেন। তাহার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া শ্রাদ্ধে দান সাগর করিয়াছিলেন। (১)

দাসীর শ্রাদ্ধে দান সাগরের সহিত —

"বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া"

---

(১) প্রদীপ, ৩য় বর্ষ।

প্রবাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।—

অজা যুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘ ডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ॥

ছাগলের যুদ্ধে, ঋষিদিগের শ্রাদ্ধে, প্রাতঃকালীন মেঘে এবং স্ত্রীপুরুষের কলহেতে কেবল বহ্বারম্ভ হয় মাত্র, ফলে ক্রিয়া অল্পই হয়।

• • •

যার মনে যা লাফ্ দিয়ে উঠে তা।

প্যারী একদা প্রাতঃকালে এক ফুলগাছতলায় বাহ্যে বসিয়াছে। ইতিমধ্যে তাহার সম্মুখে গাছ হইতে একটি ফুল পড়িল। প্যারী ফুলটি কুড়াইয়া লইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়ায় ফুলটি ভক্ষণ করিল। পরে শৌচাদি করিয়া শ্যাম রায়ের বাড়ীতে মনোহরসাই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে গেল। শ্যামরায় প্যারীর প্রতিবাসী।

প্যারী বেশ নিবিষ্ট চিত্তে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সঙ্গীতওয়ালা গাইতে আরম্ভ করিল;—"প্যারীহে, তোমার ফুলের কথা শ্যাম রায়কে বলে দিব।" প্যারী ভাবিল—এ বেটাত আমার ফুল খাওয়া জানিতে পারিয়াছে। যাহা হউক বহু চিন্তার পর গানওয়ালাকে একটি মুদ্রা দক্ষিণা প্রদান করিল। গানওয়ালা মনে করিল, এ সঙ্গীতটি বোধ হয় উহার মনে লাগিয়াছে। সে আরও কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় তাহার নিকট আসিয়া বার বার ঐ গানটি বিশেষতঃ ঐ পদটি গাহিতে লাগিল। প্যারী তৎপর জামাটি, পরে জুতা জোড়া, সর্বশেষে উত্তরীয় বসন পরিধান করিয়া পরিধেয় বস্ত্রখানি শুদ্ধ গানওয়ালাকে দান করিল। গানওয়ালা ভাবিল, এ গানটাতে উহার বড় ভাল লাগিয়াছে, তাই সে তাহার আরও সন্নিকট হইয়া ঐ পদটি গাহিতে লাগিল। পরিশেষে প্যারী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—

"যা—বল্‌গে যা, বাহ্যে বসে একটা ফুল খেয়েছি বই ত আর কিছু না।—যা তুই বলে দিগে যা।"

এই ঘটনা হইতে উক্ত প্রবাদ বাক্যটির সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীতকার গান গাইতেছে, প্যারী ভাবিল, সে বোধ হয় আমার ফুল খাওয়া দেখিয়াছে। সেটিকে বুঝাইতে পারিয়াছিল না, বাহ্যে বসে ফুল খাওয়াটা সর্বত্র বলিয়া

তাই গানের মধ্যে "প্যারীকে, তোমার কূলের কথা শ্যাম রায়কে বলে দিব।" শুনিয়া সে ভাবিল, সঙ্গীতকার বোধ হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে যে, তোমার কুল খাওয়ার কথা গৃহস্বামী শ্যাম রায়কে বলিয়া দিব।

• • •

দারুভূতো মুরারিঃ।

জগন্নাথক্ষেত্রে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, একদা মুরারি শ্রীকৃষ্ণ শেষে কাষ্ঠময় হইলেন কেন? তর্কপঞ্চানন তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছিলেন —

একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা, চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া,
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ,
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥

মুরারির এক ভার্য্যা অতি মুখরা, দ্বিতীয়া অতি চঞ্চলা,— তাঁহার পুত্র ভুবনবিজয়ী কন্দর্প, তিনিও অতিশয় অবাধ্য এবং শেষ শয্যা, সমুদ্র বাস ও গরুড় বাহন। এই সকল আপনার গৃহচরিত ভাবিয়া মুরারি কাষ্ঠ হইয়াছেন।

• • •

অগস্ত্য যাত্রা।

বিন্ধ্য পর্ব্বত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এত উচ্চ হইয়াছিল যে, পাছে সূর্য্যের গতি রোধ হয় এই আশঙ্কায় দেবগণ তদীয় গুরু অগস্ত্য ঋষির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। দেবগণের সানুনয় অনুরোধে অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হন। বিন্ধ্য গুরুদর্শনে প্রণাম করিবার জন্য প্রণত হইলে, গুরু বলিলেন,— "যাবৎ আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তাবৎ তুমি এই ভাবে থাক।" গুরু আর ফিরিলেন না, বিন্ধ্যও গুরুআজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মস্তক উত্তোলন করিতে পারিল না।(৭) তাই লোকে বলিয়া থাকে,

— নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।
মাতুলো যস্য গোবিন্দ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥(৮)

[৭] কবিতাবলী, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। [৮] মহাভারত।

স্বয়ং গোবিন্দ যাহার মাতুল, ধনঞ্জয় যাহার পিতা, সেই অভিমন্যুই রণ ক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন। অতএব নিয়তির বাধা কোন মতেই হয় না।

অন্যচ্চ,— মাতা লক্ষ্মীঃ পিতা বিষ্ণুঃ স্বয়ঞ্চ বিষমায়ুধঃ।
তথাপি শম্ভুনা দগ্ধঃ নিয়তিঃকেন বাধ্যতে॥

যাঁহার মাতালক্ষ্মী এবং পিতা বিষ্ণু, যিনি স্বয়ং বিষমায়ুধ, তিনিও শম্ভুর ক্রোধানলে দগ্ধ হইলেন। অতএব নিয়তি কে লঙ্ঘন করিতে পারে।*

০ ০ ০

শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।

যৎকালে পার্ব্বতী হরকে পতিরূপে পাইবার জন্য ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, তৎকালে মহাদেব ব্রহ্মচারী বেশে নগাধিরাজ হিমালয়ের উচ্চচূড়ে উপস্থিত হইয়া অবক্র দৃষ্টি উমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশং জলান্যপিস্নান বিধিক্ষমাণিতে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্॥(৯)

অয়ি পার্ব্বতি! তুমি স্বকীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানার্থ কাষ্ঠ ও কুশ এবং পানীয় জল সুলভে পাওত? আর তুমি শক্তি অনুরূপ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছত? জানিও শরীরই ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রধান সাধন।

গাছে কাঁঠাল গোফে তা।

এক কৃষক জ্যৈষ্ঠ মাসে কাঁঠাল খাইয়া একটি বীচি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া সানন্দচিত্তে গোঁফে তা দিতে দিতে উহার চতুঃপার্শ্বে পদাচারণ করিয়া বেড়াইতেছে। ইতি মধ্যে তাহার এক প্রতিবাসী তথায় আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কিহে ভায়া, বলি ব্যাপার খানা কি? ভারি যে হাঁসছ আর গোঁফে তা দিচ্ছ?"

কৃষক বলিল,—"ভাই, আজ একটা ভারি কাজ করিয়াছি। ঐ দেখ তোমার পশ্চাতে একটি কাঁঠালের বীচ পুঁতিয়াছি। ঐ গাছে কাঁঠাল

* দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা। (৯) কুমারসম্ভব।

ধরিবে আর আমি খাইব। খাইতে খাইতে গোঁফে আঠা লাগিলে এই রকম করিয়া (গোঁফে তা দিয়া) পরিষ্কার করিব।"

—•—

পাঠকগণের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবাদগুলির উৎপত্তির কারণ যদি কেহ অবগত থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া উৎসাহ সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইলে আমি উপকৃত হইব।—

(১) মরার উপর খাঁড়ার ঘা।

(২) কিসে আর কিসে ধানে আর তুষে।

(৩) বজ্র আঁটনি ফস্কা গিরো।

(৪) মারিত হাতী লুটিত ভাণ্ডার।

(৫) নেংটার নাই বাটপারের ভয়।

(৬) ফেণ দিয়া ভাত খায় গল্পে মারে দই,
মেটে হুঁকোয় তামাক খায় বলে গুড়গুড়িটা কই।

মোগল শাসনকালে ভারতবাসীর অবস্থা।*

বর্ত্তমান কালে কোন রাজার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাঁহার শাসনে প্রকৃতি পুঞ্জের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহার বিবরণও ঐতিহাসিকগণ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস লেখকগণ সন্ধি বিগ্রহের

1. R. C. Dutt's Civilization in India.
2. P. N. Bose's Hindu Civilization during British rule.
3. Berner's Travels. A Constable and Co.
4. Keen's the Turks in India.
5. Gladwin's Ain-i-Akbari.
6. শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস।

*এই প্রবন্ধের প্রভূতাংশ শ্রীযুক্ত পি, এন্, বসুর পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

কথাতেই আপন আপন গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন জন্য প্রাচীন কালে দেশের অবস্থা কিদৃশ ছিল বহু পরিশ্রমেও তাহার পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। মোগল রাজত্বের ইতিহাস লেখকগণও প্রকৃতিপুঞ্জের কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই, বাদসাহগণের বিবরণ প্রদান করিয়াই স্ব স্ব কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মোগল শাসন কালে প্রজার অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা দুঃসাধ্য নহে। আবুল ফজল আইন-ই আকবরী গ্রন্থে ভারতবাসীর অবস্থার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। মোগল শাসনকালে বহু সংখ্যক ইউরোপীয় পর্য্যটক এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতেও এদেশের তৎকালীন অবস্থা কিপ্রকার ছিল তাহার অনেক বিবরণ জানা যাইতে পারে।

ভারতবাসীর অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে তাহাদের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজের দশা কিরূপ ছিল তাহাই প্রথমে আসিয়া পড়ে। মোগল জাতি মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মোগল শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আফগান জাতির আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। অতএব মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই নূতন রাজার প্রতাপে নূতন সভ্যতার সংঘর্ষণে এদেশে সমাজ বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। মোগল শাসন প্রণালী আফগান শাসন প্রনালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু আফগান মোসলমানের সভ্যতার সঙ্গে মোগল মোসলমানের সভ্যতার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। আফগান শাসন কালে যে সকল কারণে হিন্দুর ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সমাজে পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল তাহা মোগলের সময়েও সমভাবে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং আফগানের সংস্পর্শে দেশ মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত আসিয়াছিল তাহা মোগলের সময়েও অব্যাহত ছিল। তবে আফগানের সময়ে যাহা অর্দ্ধ মুকুলিত অবস্থায় ছিল মোগলের সংস্পর্শে তাহাই পূর্ণ বিকশিত হয়। এই যাহা কিছু প্রভেদ। সুতরাং আফগানের শাসন কাল ছাড়িয়া মোগলের সময়ে দেশের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজের অবস্থা কিদৃশ ছিল তাহা অঙ্কিত করিলে আংশিক চিত্র মাত্র প্রদান করা হয়; একারণ আফগান ও মোগল, উভয়

জাতীয় মোসলমানের সংঘর্ষণে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে হিন্দুর কিরূপ দশা হইয়াছিল তাহাই মোটের উপর বর্ণিত হইল। মোগল শাসন আফগান শাসন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া উহার শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি এবং রাজ কার্য্য লাভ সম্বন্ধে উভয় শাসন কাল মধ্যে বিস্তার পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছিল। এজন্য আফগান শাসন কালে এসব বিষয়ে ভারতবাসীর অবস্থা কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া মোগলের শাসন গুণে ভারতবাসীর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি এবং রাজ কার্য্য লাভ সম্বন্ধে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল কেবল মাত্র তাহারই চিত্র অঙ্কিত করা হইল।

মোসলমানের সংঘর্ষণে কিরূপ অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে তৎপূর্ব্বকালে হিন্দুর ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা বলা আবশ্যক। মোসলমান শাসন কালে ভারতবাসীর পূর্ব্ব গৌরব ও সৌষ্ঠব বিলুপ্ত হইয়াছিল। অগ্নি শিখা অদৃশ্য হইয়া গেলে অঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; মোসলমান শাসন কালে ধর্ম্ম ও জ্ঞান সর্ব্বস্ব ভারতবাসীর তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল। তাহারা ধর্ম্ম সম্পদ ও জ্ঞান বৈভব হইতে বিচ্যুত হইয়া কূপ মণ্ডুকের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু দেশে মোসলমানের আধিপত্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুসভ্যতা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এরূপ হইবার কারণ কি? সমাজতত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে বর্ণভেদ প্রথাই হিন্দুজাতির দুর্দ্দশার মূল কারণ। বর্ণভেদ প্রথাই ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতির পথ অবরোধ করিয়াছিল এবং তজ্জন্য ধর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলন একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। অলবেরুণী লিখিয়াছেন, "উপাসনা, বেদ পাঠ ও হোম প্রভৃতি যে সকল কার্য্যে ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল বৈশ্য অথবা শূদ্রের পক্ষে তাহার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। যদি কেহ এই ব্যবস্থার অন্যথাচরণ করিত তবে ব্রাহ্মণগণ রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন এবং নিয়ম ভঙ্গ কারীর জিহ্বা কাটিয়া ফেলা হইত।"

ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইত। সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন কেবল মাত্র ব্রাহ্মণগণ মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ধর্ম্মবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি সকলেই

একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। যুদ্ধ বিদ্যায় ক্ষত্রিয়গণের একাধিকার ছিল। কি জ্ঞানানুশীলন কি শাস্ত্র চালনা কিছুর সঙ্গেই জন সাধারণের সম্পর্ক ছিল না। শাস্ত্র চর্চ্চা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। আলবেরুণী লিখিয়াছেন যে কোন্ কোন্ জাতি মুক্তির অধিকারী, এসম্বন্ধে হিন্দুগণের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যজাতির বেদে অধিকার ছিল না জন্য কাহারও কাহারও মতে কেবল মাত্র তাঁহারাই মুক্তি লাভে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। আমরা আলবেরুণীর এই লেখা পাঠে অবগত হই যে যদিচ পূর্ব্বে বৈশ্যজাতির শাস্ত্রাধিকার ছিল তথাপি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাহারা সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়-গণ সর্ব্বদা শস্ত্র বিদ্যা উপার্জ্জনে নিরত থাকিতেন বলিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলনের অবসর ছিল না। এজন্য একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই ধর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

যে সকল রত্ন ভোজরাজা অথবা বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন তাঁহাদের মধ্যে একজনও বৈশ্য অথবা শূদ্র ছিলেন না। দেশ চলিত ভাষা তখন ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হইতে ছিল। গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায়ই লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের জন সাধারণ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিল। ক্ষত্রিয়গণ অবসরাভাবে গ্রন্থপাঠে মনোযোগী ছিলেন না। কেবল মাত্র ব্রাহ্মণগণই গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা অন্যান্য বর্ণের তুলনায় নগণ্য ছিল। অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকটই সংস্কৃত গ্রন্থগত বিদ্যা অর্গলবদ্ধ ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দুর ধর্ম্ম ও জ্ঞান সংকীর্ণ খাতে বদ্ধদশায় পতিত হইয়াছিল।

এই সময় লোকে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করে। দেব দ্বিজে ভক্তি, তীর্থ পর্য্যটন, উপবাস, ব্রত এই সকলই তখন ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। দেবতার সংখ্যা ও পূজার আড়ম্বর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-বাক্য সর্ব্বথা পালনীয় ছিল। ব্রাহ্মণ সাধুই হউন বা পাপনিরতই হউন, তাঁহাতে কিছু আসিয়া যাইত না; ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করার জন্যই তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট সম্মানার্হ ছিলেন। লোকে সাধুতা, সত্য বাদিতা, পরমার্থ নিষ্ঠা প্রভৃতি

গুণ নিচয় হইতে বর্জ্জিত হইয়াও কেবলমাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মহিমায় জন সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত। বস্তুতঃ তৎকালীন হিন্দুধর্ম্ম "মনুষ্যের হৃদয় কন্দর হইতে স্বাভাবিক স্রোতায় বিনিঃসৃত হইয়া দিগন্ত প্রমোদিত" করিত না।

সকল প্রকার শাস্ত্রাপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রই কঠিন ও সারবান পদার্থ। ইহার আলোচনাতে গভীর ধীশক্তি ও মনস্বিতার আবশ্যক। ন্যায় দর্শনের আলোচনায় ব্রাহ্মণগণ চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অক্ষয় ভূষণ মহাত্মা শঙ্কর আচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার তিরোভাবের পর আর কোন মৌলিক দার্শনিক ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। এই সময় হইতেই ভারবাসীর মানসিক অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল। এবং ইহার পর কি ধর্ম্ম কি বিজ্ঞান কি সাহিত্য, সকল বিষয়েই হিন্দুর প্রতিভা পরিম্লান হইয়া উঠিয়াছিল। কবিবর মাঘ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শিশুপাল বধকাব্য প্রণয়ণ করেন; নৈষধ প্রণেতা শ্রীহর্ষ, গীত গোবিন্দের গায়ক জয়দেব এবং কথা-সরিত-সাগর রচয়িতা সোমদেব দ্বাদশ শতাব্দীতে বিচরণ করেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ন্যায় কলকণ্ঠ নহেন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী কালে আর কোন নাম যোগ্য কবি প্রাদুর্ভূত হইয়া ভাবের তরঙ্গ লীলায় এদেশকে আলোড়িত করেন নাই। একাদশ শতাব্দী হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা রুদ্ধ হইয়াছিল। যদিচ মিথিলা, নবদ্বীপ ও কাশী প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনা হইত এবং রঘুনাথ, রঘুনন্দন, সায়নাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভাশালী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল তথাপি তৎকালীন পণ্ডিত মণ্ডলী পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষ্কগণের তুলনায় নিষ্প্রভ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজের অধঃপতনের সময় হিন্দুর প্রতিভা কতদূর পরিস্ফুট হইতে পারে তাঁহারা তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল। প্রাচীন জাতি সমূহ মধ্যে হিন্দু জ্যোতিষও চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পর এই দুই বিদ্যারও দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। উহা গণনা ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসকগণের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্যের পর আর কোন নাম যোগ্য বৈজ্ঞানিক এদেশে প্রাদুর্ভূত হন নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্

পণ্ডিতগণ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জয়দেবই চির কুসুম বিকশিত সংস্কৃত কাব্য কাননের শেষ কোকিল এবং সোমদেবের পর আর কোন উপন্যাস রচয়িতা সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে রত্ন রাজি সঞ্চিত করেন নাই।

মোসলমানের আগমন কালে কেবল যে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অধোগতি ঘটিয়াছিল তাহা নহে, সামাজিক হীনতা নিবন্ধন জন সাধারণের হৃদয় হইতে স্বদেশানুরাগও তিরোহিত হইয়াছিল। তাহারা দেশের ইষ্টা নিষ্টে উদাসীন ও বীতস্পৃহ ছিল। এজন্য মোসলমান অসিহস্তে ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপনীত হইলে জন সাধারণ জন্মভূমির স্বাধিনতা রক্ষার্থ এক পদও অগ্রসর হইয়াছিলেন না। কেবলমাত্র রাজন্য বর্গই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রতি- পালন জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর ঈদৃশ দুরবস্থার সময় দেশ মধ্যে মোসলমানের আধিপত্য স্থাপিত হয়; তাহাদের প্রখর শাসনে হিন্দুজাতির সঙ্কীর্ণ খাতবদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞান শুষ্ক হইয়া পড়ে এবং সে খাতের কেবলমাত্র কর্দ্দম অবশিষ্ট থাকিয়া ভারতবাসীর কলঙ্কের কারণ হইয়া উঠে।

আলবেরুণী সবক্তগীন ও তদীয় পুত্র মামুদের ভারতাক্রমণোপলক্ষে লিখিয়াছেন, "মামুদ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন; যে সকল অদ্ভুত কার্য্য ভারতবাসী ধূলি কণার ন্যায় দশদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা মামুদ কর্ত্তৃকই সংসাধিত হয়। * * * * ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবশিষ্ট ভারতবাসী কাজে কাজেই সকল শ্রেণীর মোসলমানের বিরুদ্ধে বদ্ধমূল ঘৃণা পরিপোষণ করিয়া থাকে। এ কারণেই হিন্দুর বিদ্যা আমাদের বিজিত দেশ পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে এ পর্য্যন্ত আমাদের অনধিগম্য কাশী ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করিয়াছে।" প্রাচীন কালে এদেশে গ্রন্থবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল না। গ্রন্থকর্ত্তাগণ রাজার অর্থ সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। হিন্দুর সিংহাসনে মোসলমানের অধিকার সংস্থাপিত হইলে সংস্কৃত বিদ্যা কাশী ও কশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করিয়াছিল। হিন্দু রাজগণের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের আশ্রয় প্রাপ্ত পণ্ডিত সমাজের ও অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। পণ্ডিত সমাজের অধঃপতনেই আর্য্যধর্ম্ম;

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। বিজয়নগর প্রভৃতি কতিপয় স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে সে সময়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিপালিত হইতেছিলেন। কাশী নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সার্দ্ধ পঞ্চদশ বৎসরব্যাপি মোসলমান শাসন কালে ব্রাহ্মণকুলে আর তাদৃশ প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয় নাই। এই সময় মধ্যে কেবল মাত্র কতিপয় টীকাকার ও সংগ্রহকার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সায়নাচার্য্য মাধবাচার্য্য, রঘুনন্দন, ইঁহারাই এযুগের অলঙ্কার স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের কেহই মৌলিক গবেষণা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মোসলমান যুগে জয়পুরাধিপতি জয়সিংহের আবির্ভাব হইয়াছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। এযুগে একমাত্র তিনিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মৌলিক গবেষণা প্রদর্শন করিয়া ভারত ভূমির বরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষে মোসলমান শাসন বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের অখণ্ড প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে কেহই তাঁহাদের সমকক্ষ ছিল না। তাঁহারাই সমাজের নেতা ছিলেন। তাঁহারা কখনও কাহারও অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হন নাই। মোসলমান শাসনের আরম্ভ হইতেই ব্রাহ্মণ জাতির দুর্দ্দশার আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই তাঁহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন তাহাদিগকে দেশাধিপতি বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য হন। দেশের বিশিষ্ট রাজপুরুষগণ আর তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন না অথবা দেশাধিপতিগণ রাজ্য শাসন বিষয়ে তাঁহাদিগের মন্ত্রণাপ্রার্থী হইতেন না। এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তাঁহাদের অখণ্ড প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মোসলমানের আগমনে তাঁহাদের এই প্রাধান্য অকস্মাৎ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। তাঁহারা রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া বিদ্যালোচনায় উৎসাহিত হইতেন। যে সকল রাজ সিংহাসন হইতে ব্রাহ্মণ সমাজের উপর অজস্রধারে প্রীতি ও ভক্তি বর্ষিত হইত তাহা অতঃপর যাঁহাদের পদতলে পতিত হয় তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে কুসংস্কারাপন্ন অপধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন। এজন্য যে সকল ব্রাহ্মণের সামর্থ ছিল তাঁহারা কাশী ও কাশ্মীর প্রভৃতি দূর স্থানে পলায়ন করেন। আলবেরুণী লিখিয়াছিল যে এই নূতন উপনিবেশে ধর্ম্ম ও

রাজনীতি বিষয়ক পার্থক্য বশতঃ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নবাগত বিজয়োন্মত্ত মোগলমানগণের মনোবাদ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতেছিল।

কাশী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের অধিকাংশই এই সময় হইতেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির পার্থক্য ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। মোগলমানের নিকট কি ব্রাহ্মণ কি নীচ শূদ্র সকলেই কাফের বলিয়া সমভাবে ঘৃণার পাত্র ছিল। নিম্নশ্রেণীর নিকট হইতে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববৎ সম্মান পাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সেই পূর্ব্ব মানসিক বল, উদ্ভাবন ক্ষমতা, স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনা শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। মোগলমানের আগমনে ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। এমন কি ক্ষত্রিয়গণও মোগলমানের অধীনে সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রাজদরবারে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল জন্য তাঁহাদের অবলম্বিত বৃত্তির পুরস্কার ও গৌরব বহুলপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। এই অবহেলায় তাঁহারা আপনাদিগকে অপমানিত বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন।

ইহার ফলে ব্রাহ্মণকুল উদাসীন ও বৈরাগ্য প্রবল হইয়া উঠেন এবং দেব দেবী সম্বন্ধে অন্তঃসার শূন্য গল্প প্রণয়ন করিয়া কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণই তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য ছিল। বৈশ্য ও শূদ্রের অর্থানুকূল্যেই তাঁহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশীল ও জ্ঞানবন্ধু হিন্দু রাজন্যবর্গের আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বদান্যতার উপর নির্ভর করিতে হইত। ধর্ম্মের কুসংস্কার বিদ্ধ অংশই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপদ ছিল। তাহাদের সন্তোষ উৎপাদন করাই ব্রাহ্মণ জাতির প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য দেশ হইতে ক্রমশঃ নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। কিন্তু কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দেশ মধ্যে পূর্ব্ববৎ প্রবল ছিল; উহার প্রসার ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ

করিয়াছিল এবং যে সকল কারণ পরম্পরায় হিন্দুর প্রজ্ঞা উজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তাহার বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। আমাদের মত সমর্থনার্থ জ্যোতিষ শাস্ত্রের দুর্দ্দশার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তথা কথিত জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞগণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের অভিনব রহস্য উদ্‌ঘাটনে আর ব্যাপৃত থাকিতেন না। তৎপরিবর্ত্তে বার বেলা, বার দোষ এবং শুভদিন নির্ণয়ে ও কোন তিথিতে কোন দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ তাহার মীমাংসাতেই তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইত। ফলতঃ হিন্দুর যাহা কিছু মহৎ তাহার তিরোভাব হইয়া তৎস্থলে যাহা কিছু তমসাচ্ছন্ন তাহাই বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অবশেষে মোসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে বেদ বিষয়িণী প্রজ্ঞা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল; মনু যাজ্ঞবল্ক্য পড়িবার লোকাভাব ঘটিয়াছিল, কাব্যরসাস্বাদনের ক্ষমতা বহুলপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। কেবলমাত্র ক্রিয়াকর্ম্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াই ব্রাহ্মণগণ সমাজে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন। এই সময়ের পণ্ডিত সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে একজন সূক্ষ্মদর্শী ইংরেজ লিখিয়াছেন, "The number of learned is not only diminished, but the circle of learning, even among those who still devote themselves to it appears to be considerably contracted. The abstract sciences are abandoned, polite literature neglected, and no branch of learning cultivated but what is connected with the peculiar doctrines of the people."

মোসলমান শাসন কালে একদিকে যেমন উপধর্ম্ম সমাজ মধ্যে বদ্ধমূল, এবং হিন্দুর প্রজ্ঞা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল; অন্যদিকে তদ্রূপ উদার ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াও তাপক্লিষ্ট ভারতবাসীর শ্রান্তি দূর করিবার জন্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সবিশেষ গুণী হইলেও তাহার জাতি ও কুল তদীয় উন্নতির বাধাদায়ক হইত। কিন্তু মোসলমানের পক্ষে এরূপ ছিল না, মোসলমান মাত্রেই সমান। অতি নীচ মোসলমানেরও কোরাণ পাঠ ও মসজিদে উপাসনা করিবার অধিকার ছিল। রাজত্ব ও দাসত্বের মধ্যে কেবলমাত্র গুণের ব্যবধান ছিল। অনেক ক্রীতদাস কেবল মাত্র বুদ্ধি ও শৌর্য্যবলে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। মোসলমান

ধর্ম্মের এই সাম্য ভাবের প্রভাব হিন্দু সমাজে কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রধানতঃ ইহারই ফলে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে কতিপয় ধর্ম্ম প্রচারক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সমুজ্জ্বল আলোকমালা সম্পাতে দেশের মুখশ্রী প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। রামানন্দ, কবির, নানক ও চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের মনে মোসলমান ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহারা সকলেই একেশ্বরবাদী ও বর্ণভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। রামানন্দ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হইতে শিষ্য গ্রহণ করিতেন। কবির জাতিতে জোলা ছিলেন। কবির, নানক ও চৈতন্য সকলেই মোসলমানদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতেন।

এই উদার ধর্ম্মের প্রচার প্রভাবে জন সাধারণের ব্যবহৃত দেশ চলিত ভাষা সমূহের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। কবির ও চৈতন্যের উপদেশ মালা দেশ চলিত ভাষায় গ্রথিত হইয়াছিল। তাঁহারা জন সাধারণের নিকট তাহাদের ব্যবহৃত ভাষায় ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহারা দেশ মধ্যে যে প্রেম ধর্ম্মের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন তাহার সিঞ্চনে দেশ চলিত ভাষাগুলিও শ্যামোজ্জ্বল শ্রীধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশ চলিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির অখণ্ড প্রতাপের দুর্গম দুর্গে প্রবল আঘাত করেন। সে আঘাতে সংস্কৃত ভাষা মৃত্যুদশায় উপস্থিত হয়। এ যাবৎ গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত। অভিনব ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষগণের অভ্যুদয়ে পণ্ডিতগণ দেশচলিত ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহ জন সাধারণের বোধগম্য ছিল না। জন সাধারণের উদ্দেশ্যে এসকল গ্রন্থ রচিতও হইত না। দেশ চলিত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিত হইলে নিরক্ষর লোকের নিকটও পাঠ করিলে সেও তাহা বুঝিতে পারে। এজন্যই গ্রন্থকারগণ দেশ চলিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ মোসলমান শাসনের সময়েই হিন্দী, বাঙ্গলা, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি দেশ চলিত ভাষার সমৃদ্ধি পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

কতিপয় ব্রাহ্মণের যত্নেই সংস্কৃত ভাষা জীবিত ছিল। দেশ চলিত ভাষার প্রভাবে কালক্রমে ইহার মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল। কিন্তু মোসলমান বিজয়ের

ফলে দুই কারণে সংস্কৃত ভাষার বিলোপ ও দেশ চলিত ভাষার পরিপুষ্টি দ্রুতগতিতে সাধিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ মোসলমান শাসনে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির গৌরব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ইঁহাদের গৌরব হ্রাস প্রাপ্ত হওয়াতে গৌণ ভাবে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ দেশমধ্যে প্রতিপত্তি শালী হইয়া উঠিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ মোসলমানের সংস্পর্শে হিন্দুগণ বর্ণ বৈষম্য এবং ব্রাহ্মণ জাতির বংশানুক্রমিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঈদৃশ মতের প্রভাবে যে সকল ধর্ম্ম প্রচারক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই একেশ্বর বাদী ও বর্ণভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কবির, বঙ্গদেশে চৈতন্য, মহারাষ্ট্রদেশে একনাথ এবং পঞ্জাবে নানক বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময়েই অমানিশার অন্ধকার তুল্য জন সাধারণের হৃদয় কন্দর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবার উগ্র বাসনা দেশের প্রতিভা-শালী ব্যক্তিগণের মনে জাগ্রত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের রত্ন রাজি এতদিন সংস্কৃত ভাষার লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিয়া জন সাধারণের অপ্রাপ্য ছিল। এই সময় এই দুই মহা গ্রন্থ প্রধান প্রধান দেশ চলিত ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই সময়ের অমর কবিগণ সকলেই দেশ চলিত ভাষায় কাব্য মালা গ্রথিত করিয়া জন সাধারণের কর্ণে উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কেহই বর্ণ বৈষম্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই উদার ভাব কেবলমাত্র ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় সাহিত্যেই আবদ্ধ ছিল। আকবর রাজকার্য্যে পারস্য ভাষা প্রবর্ত্তিত করাতে তৎসময় হইতে হিন্দুগণ বহুল পরিমাণে উহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দেশ চলিত ভাষা সমূহের সঙ্গে পারস্য ভাষার সৌসাদৃশ্য ছিল। দেশ চলিত ভাষা সমূহের ন্যায় উহাতেও কোন গভীর বিষয়ের আলোচনা হইত না। ক্রমশঃ।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

মাঝি ও চামার।

(টেনীসন্ হইতে।)

চামার॥ একটু দাঁড়াও আমুক সরলা,
শুনিব তোমার কাহিনী ;
বড় ভাল বাসে সে অপূর্ব্ব কথা
শুনিতে তোমার ভগিনী।
দেশ মহাদেশ, সাগর সরিৎ
কতই দেখেছ জীবনে,
বলিবে সকল, শুনিব উভয়ে
সঞ্চরি উঠিবে পরাণে।
তোমাদের বড়, মধুর জীবন,
গিরি, মরু কিবা সাগরে,
আহা, শুনিব আজিকে বিধাতার দয়া
কোন ভাবে কোথা বিহরে।

মাঝি॥ তাইত, তাইত, ঘরে বসে শুধু
বলিলে হয় না কথা,
নাবিক জীবন কত সে কঠোর
তুমি কি বুঝিবে তাহা।
এই ত সে দিন পর্ব্বতের মত
সাগরে উঠিল ঢেউ,
তরি টলমল উঠিছে পড়িছে
সম্মুখে নাহিক কেউ।
ডুবু ডুবু হ'য়ে বাঁচি কোন মতে,
আইনু এবার দেশে,—
যাক্ সেই কথা ;— বড়ই গরম—
হ'য়েছে এখানে এসে।

বড়ই গরমী আই ঢাই প্রাণ
ঘর্ম্ম বহিছে দেহে,
শুখাইছে মুখ আজি পিপাসায়,
কেমনে মানুষ সহে ?
বোতলে কি ঐ জানালার পরে,—
স্ফটিক ফুটিছে যেন ?
চা ॥ বোতলে মদিরা রেখেছি যতনে
সে কথা উঠালে কেন ?
* * *
চাও কি হে তুমি হয়েছে পিপাসা ?
যাও তবে সুরা দোকানে ;
আমার আলয়ে, হবে না হবে না,
খাইতে দিবনা এখানে।
মা ॥ এই যে—
ভট্‌চায্যি মশাই, কত দিন হ'ল
হ'য়েছে এমন দশা।
কার টোলে শাস্ত্র হ'ল অধ্যয়ন,
বলুন দেখি খোলাসা ॥
চা ॥ সরলার টোলে, ভগিনী তোমার ;—
সে বড় দুঃখের কথা।
শুনিবে কি তুমি ; আজিও স্মরিতে
ঘুরিয়া পড়িছে মাথা।
কহিব তোমারে, পারিনা রাখিতে
মনের আবেগ আর ;
শুন ভাই তবে আমার কাহিনী,
শুন দুখ সরলার।
সেইত সেদিন ;— বিবাহের পরে
ছিলাম আমরা সুখে,

আজি দু'বছর অনমিল খোকা
সোহাগে লইনু বুকে।
মিলিয়া ঝুলিয়া হাসিয়া খেলিয়া
সুখেতে ছিলাম মোরা :
যেন দুই পাটী সুন্দর বিনামা,
দুই পাটে এক জোড়া।
অথবা যেমন, বেহালা আমার,
তারে তারে বাঁধা সুর,
সেই ভাবে মোরা, মিলিয়া ঝুলিয়া
ছিনু ভাই কি মধুর!
খোকা হ'লে পরে;— হায় রে কে জানে
হইবে আমার হেন,
অমৃতে গরল, আশায় নিরাশা,
হঠাৎ হইল যেন।
ভাসিতেছি সুখে হেরি চাঁদ মুখে,—
হরেন্দ্র তখন চাহিল,
প্রীতি ভোজন দিলাম তাদের,
বাছারে আশীষ করিল।
কিন্তু মোরে মনে সেই দিন হ'তে
যে গরল হৃদে ডুবাল,
কহিব কি ভাই জানে তা' সবাই,
গেলাসে গেলাসে উড়াল।
সেই দিন হ'তে শিখিনু খাইতে
তীব্র বিষ সম মদিরা।
দিন মাস যায়, কত যে গড়ায়
তীব্র বিষ সম মদিরা।
ঘোরে ঘোরে আঁখি ঘোরে ধরাতল:
টলে দেহ মন অবশে;

মৃতের সমান কভু রহি পড়ি,
কভু ভাঙ্গি চুরি সরোষে।
সে দিন ভরপুর থাইতে থাইতে
টাপরে টলিতে গড়িয়া,
দু'পহর রাতে আইনু বাড়ীতে
কাদা মাটি গায় মাখিয়া।
কহিল সরলা, "কি বিষম জ্বালা,
একেবারে পশু হইলে,
নাহি কিছু জ্ঞান ঘরে নাই ভাত,
যা ছিল তাহাও উড়ালে!
এলে এত রাতে, আহা কিবা ছিরি,
হাড় গোড় ভেঙ্গে দু'খানা,
কাদা মাটি মেখে, ভূত হয়ে যেন;—
ছিলি কোথা সেথা ক'জনা?
যা' না চলি সেথা, কি কাজ আসিয়া"?
যেমন কহিল সরলা,
এক পদাঘাতে, দূরে ফেলি তারে,
চলিনু আবার একেলা।
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ঘরের জিনিষ
যত কিছু ছিল ছুড়িয়া,
ফেলিয়া বাহিরে, বাহিরিনু আমি
চলিনু গড়িয়া টলিয়া।
আহা, তার পর, তার পর বল,
কি হইল তা'র দশা।
কি কহিব আর আইনু প্রভাতে,
বড়ই তখন পিপাসা।
কহিনু সরলা, জল দেও মোরে,
ত্বরা করি দেও জল;

উঠিল গর্জ্জিয়া "পেয়েছ কি চোখ্,
"ত্বরা করি দিব জল ?
উঠিতে পারি না, দেখ পদাঘাতে,
কি দশা হ'য়েছে মোর,"—
শুনি সেই রোষ, চলিনু আবার,
যেথায় রজনী ভোর।
জানিনাক কিছু কখন যে তারে,
আঘাত করিনু কোথা,
কখন যে তারে কেমনে আঘাতি
দিয়াছি দারুণ ব্যথা ॥
কিন্তু যত দিন রুষিয়া গর্জ্জিয়া
তাড়না করিল বালা,
ততই আমার বাড়িয়া উঠিল
মরণের সেই খেলা।
জান তুমি সব কেমন সুন্দর
চামড়ার কায আমি
জানি করিবারে, কেহ এ অঞ্চলে
জানেনা, আমি যা' জানি।
কিন্তু একে একে গাহাক ছাড়িল,
এক বারে গেল ব্যবসা,
নাহি অন্ন ঘরে, বস্ত্র ছিন্ন সব,
হাতে নাই এক পয়সা।
পুনঃ এক দিন, ডুবাইতে দুঃখ
হইনু নেশায় ভোর,
কহিল সরলা, সুধামাখা স্বরে,
"ওহে প্রাণ নাথ মোর,

দেখত কি ছিল, হ'ল কি এখন,
সকলি যে গেল ফুরায়ে,
সুখের সংসার হ'ল ছার খার,
আগুন দহিছে হৃদয়ে।
রহি খালি পেটে, কিবা সে উলঙ্গ,
কিবা কর তুমি তাড়না,
নাহি দুঃখ তাহে, কিন্তু নাহি সহে
হৃদয়ে এ হেন বেদনা।"
হু হু করি আঁখি ঝরিল আমার,
ফাটিল বক্ষ শতধা,
চলিনু ছুটিয়া নির্ঝরীর সম,
না মানি তাহার সু-বাধা।
একটি নিশ্বাসে, সুরার দোকানে
গেলাম বাধা না মানি,
তখনি বোতল ঐযে দেখিছ
আনিলাম উহা কিনি।
আনিয়া এখানে, রাখিনু যতনে;—
সেই দিন হ'তে আর,
এক বিন্দু কভু ছুঁইনি কখনো,
ছোঁবনা জনম সার।
মা ॥ তবে কেন ওরে, এত যত্ন করে,
রেখেছ তুলিয়া ঘরে?
চা ॥ শুন তার হেতু ঐ রিপু মোর,
রেখেছি কয়েদ করে॥
কয়েদির মত ঐ শত্রু মোরে
রেখেছিল দাস করি,
দেখাব উহারে প্রতিশোধ তা'র
আমিও সাধিতে পারি।

দেখাব উহারে, কা'র কত বল,
কে কা'রে করিবে দাস;
দেখিবে মদিরা যত দিন মোর
এ দেহে বহিবে শ্বাস।
তাইতে উহারে বোতলে পূরিয়া
রাখিয়াছি বন্দী মম,
জানেনা আমারে? প্রতিহিংসা মোর?
কঠিন প্রতিজ্ঞা মম।
এই ধরা হ'তে যে দিন বিধাতা
লইবে আমারে ডাকি,
যাইব চলিয়া হাসিয়া হাসিয়া,
উহারে দিয়াছি ফাঁকি।
অথবা উহারে সাথে করে ল'য়ে
বিধির বিচারাসনে
হ'ব উপস্থিত, সাজা সমুচিত
হবে ওর সেই খানে।

শ্রীশ।

৺ যদুনাথ ন্যায়রত্ন।

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of the ocean bear:
Full many a flower is born to blush unseen,
And wastes its sweet-ness in the desert air."

কাননে কত কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সুরভি ছুটায়, আবার আপনাআপনি বিশুষ্ক হইয়া যায়। তাহার নয়ন-প্রীতিকরী সুষমা, মনপ্রাণামোদী সুরভি-সম্ভার কাহারও উপভোগে আসে না। যেমন নির্জ্জনে তাহার উৎপত্তি তেমনি নির্জ্জনেই তাহার লয় হইয়া থাকে। অম্বুনিধির অন্ধকারময় অতল গর্ভে কতশত ভাস্বর রত্নরাজি লুক্কায়িত রহিয়াছে, এখনও তাহারা মানবের উপভোগ ও গবেষণার বিষয়ীভূত নহে। যে গুণশালী ব্যক্তিগণকে আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি এবং যাহাদের অমানুষী প্রতিভা এবং অনতিক্রম্য উৎকর্ষে গুণমুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া যাই, না জানি কোন নিভৃত নিলয়ে তদপেক্ষা অধিকতর গুণশালী কতশত মহাত্মা বিদ্যমান আছেন অথবা কতশত আবির্ভূত হইয়া অজ্ঞাত ও অপরিচিত ভাবেই তিরোহিত হইয়াছেন! যশঃ ও কীর্ত্তিলাভ প্রায়শঃ ঘটনা ও অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে। কখনও কখনও দারিদ্র্যের প্রপীড়নেও প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয় না। "Slow rises worth by poverty depressed." আমরা অকিঞ্চন হইয়াও যে মহাপুরুষের পবিত্র জীবন আলোচনা করিতে যাইতেছি, স্থানাবস্থা-বিশেষ বিপর্য্যস্ত হওয়াতেই ইঁহার গুণরাশি আবালবৃদ্ধবনিতা প্রভৃতি সকলের নিকট পরিচিত হইতে পারে নাই। সংস্কৃত ভাষানুরাগী বঙ্গীয় বহুসংখ্যক—পণ্ডিতের নিকট ইনি বিশেষ পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়।—এই মহাত্মা পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ মহকুমাধীন বাগবাটী গ্রামে ১২৭১ সনের ৬ঠা কার্ত্তিক রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীনাথ পঞ্চানন। মাতার নাম গৌরী দেবী। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীনাথ পঞ্চানন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত ভক্তি ও বিবিধ স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। পাণ্ডিত্য গুণে মুগ্ধ হইয়া দিনাজপুরের মহারাজা ইঁহাকে দ্বারপণ্ডিত পদে স্বয়ং বরণ করেন। রাজার উপরোধ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলেও ইনি আজীবন বেতন গ্রহণ করেন নাই। পিতার এই অনন্যসাধারণ মানসিক বল ও অন্যান্য গুণাবলি পুত্র যদুনাথে সম্যক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদুনাথের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরনাথ চূড়ামণি। ইনিও নানাবিধ শাস্ত্রে কৃতী এবং স্থির ও প্রশান্ত প্রকৃতি ছিলেন; পঞ্চানন মহাশয়ের মৃত্যুর পর উভয় ভ্রাতাই পিতৃপদে নিযুক্ত হন। হরনাথ চূড়ামণি দিনাজপুর রাজধানীতে থাকিতেন এবং যদুনাথ রাজব্যয়ে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার স্বরচিত ইন্দ্রায়ুধদূত কাব্যের শেষভাগে যে বংশাবলী সন্নি বেশিত করিয়াছেন,— তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে ইঁহারা বংশ পরম্পরাক্রমে পাণ্ডিত্য গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন।

পাঠ্যাবস্থা।— ইঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। ইঁহার বাড়ীতে একটি চতুষ্পাঠী ছিল, তথায় বহুসংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এই সকল পাঠার্থীর আহারাদির ব্যয়ভার ইনি বহন করিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মাতা গৌরী দেবী অপত্য নির্ব্বিশেষে ছাত্রবৃন্দের যত্ন লইতেন। তাঁহার উদার প্রকৃতি ও জননীোচিত সরল ও সস্নেহ ব্যবহারে প্রত্যেক ছাত্রই পঞ্চানন মহাশয়ের গৃহে নিজ ভবনাপেক্ষাও সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। এই সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার পিতার নিকট কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলেন। পঞ্চানন মহাশয় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পুত্র যদুনাথকেও জাগাইতেন এবং তাহাকে মুখে মুখে নানাবিধ কবিতা ও অভিধানাদি শিক্ষা দিতেন। এইরূপে তিনি অমরকোষ, একাক্ষরকোষ প্রভৃতি মুখে মুখে অভ্যাস করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ন্যায়রত্ন পিতার নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নৈষধচরিত, প্রবোধচন্দ্রোদয়, রাঘব পাণ্ডবীয়, ধাতু পরিশিষ্ট, বেণীসংহার এবং মাঘ ও ভারবির কতিপয় সর্গ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে এতগুলি সাহিত্য ও নাটক পড়া পণ্ডিত বড় বেশী ছিলনা। টোলের প্রত্যেক ছাত্রের সহিতই যদুনাথের অকৃত্রিম প্রণয় ছিল। তাঁহার মাতার সারল্য ও উদারতা এবং ছাত্রবৃন্দের সংসর্গজাত বহুবিধ

গুণাবলী হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার চরিত্র গঠনের উপাদান স্বরূপ হইয়াছিল। পিতার অভাবে ইঁহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা টোলের অধ্যাপক হইয়াছিলেন এবং সযত্নে যদুনাথকে কলাপ ব্যাকরণ শিক্ষা দেন। ব্যাকরণ পাঠকালে তাঁহার সম সাময়িক ছাত্রবৃন্দ যদুনাথের অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ও অপরিসীম অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময়ান্বিত ও স্তম্ভিত হইত। টোলের ছাত্রদিগের মধ্যে একটি প্রবচন প্রচলিত আছে যে "সন্ধিতে ফন্দী, চতুষ্টয়ে ধাঁধাঁ, আখ্যাতে সাক্ষাৎ, কৃতে হয় বাধা।" যদুনাথ ব্যাকরণ পাঠকালে ফন্দী ও ধাঁধাঁ প্রভৃতি দেখাইয়া যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিতেন তাহাতে উল্লিখিত প্রবচনের সার্থকতা তাঁহাতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর তিনি সিরাজগঞ্জের সমীপবর্ত্তি ভাঙ্গাবাড়ী নিবাসী পণ্ডিত ভুবনচন্দ্র বিশারদের নিকট পঞ্জী, কবিরাজ টীকা প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই সময় হইতেই ইঁহার কবিত্বের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবদ্বীপে অবস্থান।— ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি রাজব্যয়ে অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপ গমন করেন। এখানে তিনি পাঠকার্য্যে প্রায় ৭ সাত বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। তথায় শ্রীরাম শিরোমণির নিকট ন্যায় ও ব্রজলাল বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতি অধ্যয়ন করেন। স্মৃতি পাঠকালে মাধব সুলোচন নামক চম্পূকাব্য এবং রুক্মিণী পরিণয় নামক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন। পুস্তকদ্বয় অমুদ্রিতাবস্থায় গৃহদাহে বিনষ্ট হয়। ন্যায় পাঠ কালীন "দায়ভাগ তত্ত্বাবলী" নামক স্মৃতি শাস্ত্র বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন এবং তত্রত্য পণ্ডিত ও ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

কবিত্ব বিকাশ।— "মহত্তস্তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে।
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষ ইবস্থিতঃ॥"

কাষ্ঠাপেক্ষী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কাষ্ঠসংযোগে যেরূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে তদ্রূপ যদুনাথের হৃদয় নিহিত প্রতিভা নবদ্বীপস্থিত অগণ্য পণ্ডিত মণ্ডলীর সুসংসর্গে লতপা উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে উদীয়মান কবি যদুনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার সহকারী ছাত্রদিগকে উপহার

দিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমসাময়িক ছাত্রদিগের প্রমুখাৎ যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে তাঁহার হৃদয় যে কবিত্বময় ছিল তাহা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে এবং প্রতিবাক্য বিন্যাসে স্পষ্ট বিকাশ পাইয়াছে। তিনি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পদার্থকে কাব্যালঙ্কার সংযোগে যেরূপ অলঙ্কৃত করিয়া বর্ণনা করিতেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ আনন্দরসে আপ্লুত হইত। মহাকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিখিয়াছেন—

"To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears."

যে সমস্ত পদার্থ সাধারণের নিকট অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, কবি তাহার মধ্যেও অনন্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্ব নিয়ন্তার অচিন্তনীয় শিল্প নৈপুণ্যে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া যান। কবি যদুনাথের কবিত্ব ও ভাবময় উদ্দীপনায় আমরা পাশ্চাত্য কবির এই মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি।

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায়শঃ একজাতীয় ঈর্ষাভাব স্থান পায়। এ ঈর্ষা সাংসারিকের কুঈর্ষা নহে, পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবলে কে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে ইহাই এ ঈর্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। যদুনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রগণও তাঁহার প্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। দিবানিশি তর্কজালে যদুনাথকে পরাজিত ও অপদস্থ করিবার জন্য অধিকাংশ ছাত্রই যত্নবান্ ছিল। কিন্তু চূর্ণ-জলদ পটল যেরূপ ব্যাত্যা বিক্ষুব্ধ হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ যদুনাথের যুক্তিতর্কাস্ত্র প্রেরিত প্রবল বাক্যাভিঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর সুচিন্তিত তর্কজালও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। অতঃপর স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা দর্শনে তত্রত্য পণ্ডিত সভা ইঁহাকে ন্যায়রত্ন উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

ইঁহার সমসাময়িক মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (রঙ্গপুর।) শ্রীযুক্ত রামতারণ শিরোমণি (কান্দী) প্রভৃতি সকলেই ইঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। বিশেষতঃ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কবিতা রচন শক্তি দর্শনেই নাকি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কবিতা রচন প্রবৃত্তি

উদ্বোধিত হইয়াছিল।

যশঃ লাভ।— ষড়বিংশ বর্ষ বয়ক্রমকালে ইনি নবদ্বীপের পাঠসমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং নিজ ভবনে একটি চতুষ্পাঠী খুলিয়া স্বয়ং অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হন। এই সময়ে "প্রবাস শতকম্" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন। ইঁহার শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি ও অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান বহুসংখ্যক ছাত্রকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এই সকল ছাত্র প্রমুখাৎ ইঁহার গুণ গৌরব দূরদূরান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মধুমক্ষিকা যেরূপ প্রস্ফুট কুসুমের দিগন্ত বিস্তারি সুরভি সম্ভারে প্রমত্ত হইয়া মকরন্দ লোভে তদভিমুখে প্রধাবিত হয়, নানাদিগ্‌দেশস্থ গুণগ্রাহি ছাত্রবৃন্দও তদ্রূপ ন্যায়রত্নের অনাবিল যশঃ গৌরবে প্রমুগ্ধ হইয়া শিক্ষালাভার্থ অল্পকাল মধ্যেই তৎসমীপে সমবেত হইলেন। এই সকল ছাত্রের ব্যয়ভার ইনি স্বয়ং বহন করেন। ইঁহার লব্ধ প্রতিষ্ঠ ছাত্রদিগের মধ্যে শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ, শ্রীরামরতন শিরোমণি, শ্রীজনার্দ্দন স্মৃতিরত্ন, শ্রীদিগম্বর স্মৃতিতীর্থ, শ্রীহরনাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীকিশোরিমোহন শিরোমণি, শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহোদয়দিগের নাম প্রধানতঃ উল্লেখ যোগ্য।

নিমন্ত্রণপ্রাপ্তি।— দেখিতে দেখিতে ইঁহার যশঃ গৌরব বঙ্গের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বহুবিধ সভাতে ইনি আহূত হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ঢাকা, বরিশাল বঙ্গপুর, ধুবড়ী, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, নাটোর, পুঠিয়া, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বিচারসভায় নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। উল্লিখিত স্থানের সর্ব্বত্রই ইনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। মহাভারত শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতির পাঠকতা কার্য্যে ইনি সচরাচর ব্রতী হইতেন। তন্মধ্যে সেরপুর, গোরজনা, দিনাজপুর, সুবর্ণখালি ও সন্তোষ প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বিবাহ ও সন্ততি।— ইনি ২০ বৎসর বয়ঃক্রমে বিবাহ করেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী। দাম্পত্য প্রেম জগতে দুর্লভ হইলেও ন্যায়রত্ন স্বকীয় রূপ গুণ মাধুর্য্যে এবং সরস ব্যবহারে এই অপার্থিব বস্তু আংশিক উপভোগ করিয়াছিলেন। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন— "The good husbands have often very bad wives and vice varsa"— এই

কথার সার্থকতা ন্যায়রত্নে ও তাঁহার পত্নীতে সম্যক প্রতিপন্ন হয়। ফলকথা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্ত্রী তাঁহার রূপ গুণানুযায়ী হইয়াছিল কিনা সন্দেহ স্থল। যাহা হউক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পত্নী পুণ্যশীলা, সতী ও সাধ্বী। ১৮৯৬ সালে স্বামী ও তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া তিনি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দাবন ধামে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

পাণ্ডিত্য।—শিক্ষা নানাবিধ। কেহ বা শিক্ষিত তোতাপাখীর ন্যায় অনধীত পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া আপনাকে পণ্ডিত মনে করেন, কেহ বা শাস্ত্রসিন্ধু বুদ্ধিদণ্ডে মন্থন করিয়াও স্বীয় লেখনী লতাগ্রে একটিও তত্ত্ব কুসুম ফুটাইতে সক্ষম হন না, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শিক্ষা সে জাতীয় নহে। ইনি যেরূপ অসামান্য স্মৃতিশক্তি বলে সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমনি স্বাধীনচিন্তা ও কবিত্বময় হৃদয় লইয়া, কবিজনোচিত কমনীয় কাব্যোদ্যানে ভ্রমরবৎ গুন গুন স্বরে সুমধুর কবিতা কুসুম প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেন। ইনি কাব্য, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতির্বেদ, আয়ুর্বেদ, সংহিতা, পুরাণ, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র অদম্য উৎসাহ এবং অধ্যবসায় সহকারে আজীবন আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতেন। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই সংস্কৃত ভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন অধিকাংশ পণ্ডিতই সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে সমর্থ নহেন। ন্যায়রত্নের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সংস্কৃত ভাষা স্বয়ংই যেন তাঁহাতে অনুরাগিণী হইয়া তাঁহার কণ্ঠে আশ্রয় লইয়াছিল। তিনি অবিরাম ও অজস্রভাবে কি গদ্যে কি পদ্যে উভয় প্রকারেই কথাবার্ত্তা বলিতে এবং বক্তৃতাদি করিতে পারিতেন। এক সময়ে সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী গাড়ুদহ গ্রামে লাহিড়ী বাড়ীতে কোনও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ইঁহাকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য একখানি সংস্কৃত ভাষায় পত্ররচনা করিয়া দিতে অনুরোধ করা হয়। ইনি ৯।১০ খানা পোষ্টকার্ড লইয়া অতিদ্রুত পোষ্টকার্ডগুলি লিখিয়া শেষ করিলেন। পরে দেখা গেল বিভিন্ন পত্রে বিভিন্ন ছন্দে সুললিত ভাষায় শ্লোকাকারে নিমন্ত্রণ পত্র রচিত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা ইঁহার জীবনে যে কত সংঘটিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। গ্রন্থবিদ্যা ব্যতীত পাণ্ডিত্যের প্রধানতম উপাদান ধর্ম্মাচারী।

"রণে শূরঃ ন শূরঃ সদ্বিদ্যয়া নচ পণ্ডিতঃ, ন বাগ্মী বাক্ পটুত্বেন, ন দাতা দান কর্ম্মনা। ইন্দ্রিয়াণাং জয়াৎ শূরঃ পণ্ডিতো ধর্ম্মচারতঃ সত্যবাদী ভবেৎ বক্তা দাতা পরহিতে রতঃ॥" ন্যায়রত্নের শিক্ষায় ধর্ম্মাচার অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার জীবন আরও মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। বৈদিক ক্রিয়া কলাপে ইঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল।

পরিচ্ছদ অনাড়ম্বর।— আজকাল আমরা দেখিতে পাই সামান্যশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিও পরিচ্ছদের পারিপাট্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ থাকেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। "গুণী গুণং বেত্তি" যাঁহারা গুণগ্রাহী, তাঁহাদের নিকট গুণী ব্যক্তি অপরিচিত থাকেন না। বাহ্যাড়ম্বর মূর্খের সম্বল। বিশেষতঃ সাজ অনুসারী মনুষ্যের ভাবেরও পরিবর্ত্তন দেখা যায়। একটি কোট্ পরিধান করিয়া পকেটে হাত দিলেই বক্ষঃস্ফীত করিয়া পদ বিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, কখনও বা জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ অভিমান নিঃশব্দে [illegible] ক্রমে হৃদয়কন্দর অধিকার করিয়া লয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় এ সত্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, কাজেই তিনি অভিমানোদ্দীপক পরিচ্ছদ উপেক্ষা করিতেন। ধর্ম্ম আড়ম্বর শূন্য হওয়া চাই * তাই ভক্তিপ্রবণ ন্যায়রত্ন ধর্ম্মবিরোধী জাঁকজমক ভুজঙ্গ যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ পরিত্যাগ করিতেন। ১৩০১ সালে একদিন তিনি কোনও মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য পাবনাতে উপস্থিত হন। মোকদ্দমারম্ভে বিলম্ব দেখিয়া ইনি জজ আদালতের সিঁড়িতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। ইঁহার পরিধানে একখানি অর্দ্ধ মলিন বসন এবং তদুপযুক্ত একখানি উত্তরীয় ছিল। তিনি বিশ্রামার্থে উত্তরীয় বিছাইয়া সিঁড়িতে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময়ে তত্রত্য আদালতের একটি খ্যাতনামা উকীল তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের বিশ্রাম গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় উকীল মহোদয়গণ তাঁহার গুণপণা পরীক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ সংস্কৃত পাদ রচনা করিয়া পূরণার্থে তাঁহাকে

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

প্রদান করেন, তিনি দেখিবামাত্র শ্লোকাকারে সেগুলি পূরণ করিয়া সমস্ত গুণীন মণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। যেন কোনও সহজাত সংস্কার অথবা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অনন্ত পুণ্য প্রসূত মহাবলে বলীয়ান হইয়া ন্যায়রত্ন অবিচলিত ভাবে তাঁহাদের উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপ শত শত স্থানে সমস্যা পূরণ করিয়া ইনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

স্বাধীন জীবিকা।— ইঁহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া অনেক দেশীয় রাজন্যবর্গ ইঁহাকে দ্বারপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন। যে বৎসর ইনি সন্তোষের অন্যতমা ভূম্যধিকারিণী জাহ্নবী চৌধুরাণীর অনুরোধে "গুপ্ত সম্বৎসর নিরসন" লিখেন, সেই বৎসর সিন্দিয়ার রাজবাড়ীর ও দুর্গাপুর রাজধানীর দ্বারপণ্ডিত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি স্বাধীন জীবিকা শ্রেয়স্কর মনে করিয়া উভয়পদই প্রত্যাখ্যান করেন। যাঁহাদের প্রকৃত আত্মাদর আছে, স্বাবলম্বন ও স্বাধীন চিত্তবৃত্তি যে মহাপুরুষদিগকে আত্মপ্রসাদ প্রদান করে, তাঁহারা দাসত্ব শ্মশান-কুসুমের ন্যায় বর্জ্জন করিয়া থাকেন। হায়! হতভাগ্য বঙ্গবাসী আজ দাসত্ব লাভের জন্য আমরা কত প্রাণপণ করিতেছি। সর্ব্বসুখের মূলীভূত কারণ স্বরূপ স্বাস্থ্য ধন বিনষ্ট করিয়া ভীষণ পরীক্ষায় আত্ম বিসর্জ্জন করিতেছি! এই মহাপুরুষের স্বাধীন হৃদয়বলের নিকট আমাদের দাসত্ব-লব্ধ ধন-গৌরব ও পদাভিমান কত তুচ্ছ ও কত নগণ্য !!

শ্রম-শীলতা।— ন্যায়রত্ন মহাশয় পরিশ্রমের একটি আদর্শস্থল। সত্য সত্যই বিনা পরিশ্রমে জগতে কেহ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রৌঢ়াবস্থায় যদিও চতুষ্পাঠী ছিল না তথাপি তিনি অধ্যয়নাদি পরিত্যাগ করেন নাই। অধ্যয়ন তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও তাঁহাকে আমরা অতি নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছি। প্রত্যুত তিনি বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করিতেন না।

আয় ও ব্যয়।— ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিষ্ঠ ও রূপবান্ পুরুষ ছিলেন। ইঁহার প্রশস্তললাট ও বীরত্বব্যঞ্জক বহিরাকৃতি মহত্ব ও গুণগৌরবের আধারস্থান বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি যেরূপ বলিষ্ঠ ছিলেন আহারও তদ্রূপ করিতেন। ন্যায়রত্ন জীবনে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সমস্তই একরূপ

নিঃশেষ করিয়া জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন। মহারাজাধিরাজের বাড়ীতে ব্যাপার উপলক্ষে যেখানে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইতেছে, যথাসাধ্য মিষ্টান্নাদি অক্ষুণ্ণ ভাবে বিতরিত হইতেছে তাম্বূল বিতরণ সময়ে সেখানেও আমরা কৃপণতা দেখিতে পাই, কিন্তু ন্যায়রত্ন অন্যান্য পাত্রদ্রব্যের ন্যায় তাম্বূল, তামাকু ইচ্ছানুযায়ী যথাসাধ্য প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইঁহার অর্থরাশির অধিকাংশই অন্নদানে ব্যয়িত হইয়াছে। পরিবারবর্গকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার প্রবৃত্তি ইঁহার বড়ই বলবতী ছিল। ইনি পরিবারের সুখ কল্পে সতত অর্থব্যয় ও নানাবিধ সুখ সামগ্রী সর্ব্বদা ক্রয় করিয়া তাহাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেন।

পবিত্রতা।— পবিত্রতা ইঁহার চরিত্রের একটি প্রধান উপাদান। বোধ হয় এই পবিত্রতা বলেই ইঁহার শরীর বৃদ্ধ বয়সেও এত বলিষ্ঠ ছিল। ইনি প্রায় স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া আহার করিতেন। ইঁহার মত নিত্য-নিরামিষাশী ব্যক্তি এখন সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

মানসিক বল।— ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মানসিক বল ও আত্ম সংযম ইঁহাকে স্বার্থ পঙ্কিল সংসারের কলুষতা দুষ্ট বায়ুস্তর ছাড়াইয়া অনেক ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছিল। ইনি বিপদ ও শোক তাপ তুচ্ছ করিয়া অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত ভাবে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। হৃদয় কুসুম-কোমল হইলেও মায়ামোহে বিজড়িত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েন নাই। ইঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যা রাধাসুন্দরীর মৃত্যুতে ও পত্নী বিয়োগে যে সংযত চিত্ততা ও ধৈর্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা সাধারণ মনুষ্যে সম্ভবেনা। এরূপ মনঃশক্তি মহাপুরুষের সম্বল।

ইনি কাহাকেও তোষামোদ করিতে জানিতেন না।— ১২৮৮ সালে স্বগ্রামস্থ বৈদ্যগণ উপনয়ন প্রচলন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিবাদ করেন। তজ্জন্য বৈদ্যদিগের সঙ্গে ইঁহার সদ্ভাব নষ্ট হইয়া যায়। ইনি বৈদ্যদিগের অধিকারস্থ প্রজা, বৈদ্যদিগের সহস্র উৎপীড়ন ও প্রলোভন ইঁহাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে স্খলিত করিতে পারে নাই। ইনি নির্ভীক বীরের ন্যায় অনন্ত শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া যুক্তি তর্কের সাহায্যে তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপে শাস্ত্রানুযায়ী দোষারোপ করিতে লাগিলেন। অশেষ

যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও কোন সময়েই উপাসর্পণা করিয়া নিজ অবস্থান নিরুপদ্রব করিতে প্রয়াস পান নাই। যদিও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার অনেক সৎপ্রবৃত্তি বহিঃ প্রকটিত হইয়াছিল তথাপি এই দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্ব তাঁহার কবিত্ব সরস হৃদয়স্তর অনেকাংশে শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছিল এবং ইহাই তাঁহার কবিত্ব বিকাশের প্রধানতম অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিল। মহাকবি মিল্টনের জীবনেও আমরা ইহা দেখিতে পাই দীর্ঘকালব্যাপী পক্ষ সমর্থনানুযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুল পরিমাণে তাঁহার প্রতিভাকে মলিন ও নিষ্প্রভ করিয়াছিল। বৈদ্য যুদ্ধে ন্যায়রত্ন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার কৌশলে এ দেশীয় কোন ব্রাহ্মণ বৈদ্যগৃহে যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। অদ্যাপিও বাগবাটীস্থ বৈদ্যগণ বিক্রমপুর হইতে ব্রাহ্মণাদি আনয়ন করিয়া ক্রিয়াকলাপ সমাধান করিয়া থাকে। "জ্বলতি চলিতেন্ধনোহগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে প্রায়ঃ স্বং মহিমানং ক্ষোভাৎ প্রতিপদ্যতেহি জনঃ" যেরূপ অগ্নির কাষ্ঠ সঞ্চালিত করিয়া দিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং আঘাত করিলে ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করে সেইরূপ বৈদ্যমহোদয়গণের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া ন্যায়রত্ন স্ব মহিমা ও অসাধারণ আত্মবল প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন প্রাণপণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি "বৈদ্য রহস্য" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম বহুদর্শিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইনি যে কেবল ঈর্ষার বশবর্ত্তী না হইয়া শাস্ত্রীয় মত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জনাই বৈদ্য রহস্য প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা তাঁহার উক্ত গ্রন্থের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ দ্বারা সপ্রমাণ হইবে। "..........." আমিও বৈদ্য মহোদয়দিগের অনুকূলে সুসিদ্ধান্ত নবনীত উত্তোলন প্রয়াসেই প্রাণপ্রণে বৈদ্যরহস্য রূপ গর্দ্দভী ক্ষীর মন্থন দ্বারা অবশেষে ভুরি পরিমান অতি জুগুপ্সিত তাদৃশ পদার্থ দেখিতে পাইয়া অনেক কাল যাবত নীরব ছিলাম। কিন্তু ইঁহাদের অতিবাদে স্থির থাকিতে পারিলাম না কারণেই নিগূঢ় তত্ত্ব-কুসুম সকল কালক্রমে লেখনি লতার অগ্রে স্বয়ংই বিকশিত হইয়া পড়িল"।

গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।— ইনি বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃত কবিতাবলী

রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রেত ক্রিয়াধিকারি নির্ণয়ঃ দুর্গাষ্টকম্, পজ্ঝাটিকাষ্টকং, সংস্কৃতভাষায়াঃ বিলাপঃ, ছক্কাবর্ণন (ব্যঙ্গকাব্যং), তোটকাষ্টকং শ্রীকৃষ্ণাষ্টকং প্রভৃতি। এইগুলি কোন সময়ে লিখিয়াছেন তাহা জানা যায় না। এই সকল কবিতা মুদ্রিত হয় নাই এবং সকলগুলি একত্র না থাকায় অনেকগুলির নাম পর্য্যন্ত প্রায় লোপ পাইয়াছে। ১২৯৮ সালে ইনি "ইন্দ্রায়ুধদূতম্" নামক কাব্য রচনা করিয়া মুদ্রিত করেন। ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিবে, কাজেই দুই একটি শ্লোকদ্বারা ইহার ঈষৎ সৌন্দর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিব। ইহার প্রণীত "ইন্দ্রায়ুধদূতম্" হইতে ২।১ টি সরস কবিতা বাছিয়া লইতে সেই চিরপ্রচলিত "বাঁশবনে ডোম কাণা" প্রবচন মনে পড়ে। সমস্তগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার মাধুর্য্য প্রস্ফুট করিতে পারিলে যেন প্রাণের আবেগ কতকাংশ প্রশমিত হয়। একেত রামসীতার কাহিনী প্রাণোন্মাদিনী, তাহাতে আবার কবির লিপি কৌশলে হৃদয় কারুণ্য রসে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, মহাকবি ভবভূতির কথা বলিতে গেলে "অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্" সীতারামের প্রতি কার্য্যে সহচরী।

"কার্য্যেষুমন্ত্রী করণেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা রঙ্গে সখী লক্ষণ সা প্রিয়া মে॥"

এদিকে রাম প্রিয়ার ক্ষণিক অদর্শন প্রলয় মনে করে। পতিগতপ্রাণা, সরল হৃদয়া, প্রেমময়ী সীতা সুদূর লঙ্কাধামে প্রিয় বিরহে দিন যামিনী উৎকণ্ঠা--ব্যাকুল-প্রাণে পতিচিন্তায় নিমগ্না। দেহের প্রতি যত্ন নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল পতির ধ্যানে বাহ্য জগৎ তন্ময়। আর উদাস প্রাণে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। মেঘদূতের যক্ষ যেরূপ প্রিয়া-বিরহে মেঘকে দূতজ্ঞানে তাহাকে প্রিতমার নিকট সংবাদ বহন করিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিল, ইন্দ্রায়ুধদূতেও ইন্দ্রধনু দর্শনে সীতার তদ্রূপ ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল। সীতা প্রাণের করুণ সঙ্গীত নয়নের অশ্রু ও হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত সিক্ত করিয়া ইন্দ্রধনুর নিকট গাহিতে লাগিলেন। আবেগভরে প্রাণের কত কথাই বলিয়া ফেলিলেন! হে দূত! তুমি আমার প্রাণবল্লভের নিকট সংবাদ লইয়া যাইতে পথিমধ্যে সমুদ্র দেখিয়া

তোমার মেঘ বলিয়া ভ্রম জন্মিবে।

"উর্ম্মী ঘোষৈঃ ক্বচিদপি ভৃশং বাড়বাগ্নেঃ শিখাভিঃ
কীর্ণং ভিন্নাঞ্জন চয়নিভং বীক্ষ্যবং ভ্রান্তিমুচ্চৈঃ।
ক্ষৌণী পৃষ্ঠে সজল জলদো ব্যাপ্লুবন্ দিগ্‌দিগন্তং
শ্বর্ধদ্‌গর্জ্জনচল চপলা রাজিভী বাড়তীথম্ ॥

অনন্ত সুনীল জলরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে, তুঙ্গ তরঙ্গভঙ্গী বিস্ফুরিত উচ্চ নিনাদে প্রকৃতি মুখরিতা হইয়া উঠিতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রদীপ্ত বাড়বাগ্নি শিখা জলনিধির বিশাল বক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে। কবি উদ্‌ভ্রান্ত নেত্রে এই মহান্ দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন যেন অনন্ত গগনাবলম্বি সান্দ্র নীল-নীরদ রাজি ব্যোমতল ছাড়িয়া ধরণী পৃষ্ঠে অবতরণ করিয়াছে, শ্রোত্র কঠোর গম্ভীর জলদ নির্ঘোষ এবং অম্বুনিধির তরঙ্গনিচয় নিঃসৃত কর্ণকঠোর নিনাদের পার্থক্য যেন তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। চঞ্চল চপলা ভাতি ধরণীবক্ষে অচঞ্চলভাব ধারণ করিয়াছে। কবি-হৃদয় বিশাল কল্পনারাজ্য। কবি প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া অতুল ভূমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। [illegible] স্বর্গের অমর চিত্র তিনি কল্পনা বলে পৃথিবীতে ফলাইতে অভিলাষী। না জানি কবির হৃদয়ে হৃদয় মিশাইতে কত সুখ।

মৃত্যু।— ইনি কয়েক বৎসর হইতে হৃদ্‌রোগে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন। গত ১৩০৭ সনের ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার সংসারের তাপ জ্বালা ছাড়িয়া ইনি অনন্ত শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অভাবে আমাদের এ প্রদেশ একরূপ পণ্ডিত শূন্য। মনুষ্যের জীবিতাবস্থায় আমরা তাহার গুণ তত বুঝিতে পারি না। অসংখ্য ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলীর পাদদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া যেরূপ বৃক্ষের পরস্পর উচ্চতা নির্ণয় করা অসাধ্য, কিন্তু দূরে থাকিয়া স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিলে উচ্চতম বৃক্ষটী প্রথমেই যেরূপ আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয় সেইরূপ প্রকৃতির বীরশিশু যদুনাথ আজ স্বার্থ পঙ্কিল মায়াময় সংসার ছাড়িয়া চির শান্তি নিকেতনে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আর ক্ষুদ্র আমরা দূরে থাকিয়া বিভ্রান্ত নেত্রে তাঁহার উচ্চতা ও মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছি, এই মহাপুরুষের অসাধারণ স্মৃতিবল, অসামান্য আত্মত্যাগ,

অনন্যসাধারণ আত্মাবলম্বন এবং সংসারের কর্ত্তব্য পুণ্যাদিতে নির্লিপ্ত কঠোরতার বিষয় যতই চিন্তা করিতে যাই ততই আমাদের ক্ষুদ্রত্ব যেন আরও ক্ষুদ্রতর হইয়া যায়। ইঁহার সুসংসর্গে ও সদ্‌গুণাদর্শে আত্মাভিমান টুটিয়া যায়, স্বার্থপরতা শারদ পঙ্কের ন্যায় তিরোহিত হয়, অকিঞ্চন হইলেও ধর্ম্মের সুবিমল বিভায় কলুষতাদুষ্ট হৃদয়ও যেন প্রোদ্ভাসিত হইয়া উঠে। হায়! ভারতবাসী, আজ তোমাদের ঘোর দুর্দ্দিন। তাই তোমরা গুণের আদর করিতে সক্ষম নও। পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ মহোদয়ের আবির্ভাব হইলে আজ কতশত পুরস্কারে ও কত অর্থব্যয়ে ইঁহার পবিত্র জীবন অমর করিয়া তুলিত। আমরা গুণহীন, গুণের মর্ম্ম বুঝিনা। তাই আমাদের নিকট এ মহাত্মা প্রকৃত পুরস্কার প্রাপ্ত হন নাই।

শ্রীঅবনীনাথ লাহিড়ী।

শিক্ষা-সমস্যা।

"আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।"

মানুষ জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে; তজ্জন্য পৃথিবীতে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিবিধ প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। প্রণালীভেদে মানবজ্ঞান দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একশ্রেণীর জ্ঞান 'আগমোত্থ', তাহা গ্রন্থগত। আর একশ্রেণীর জ্ঞান 'বিবেকোত্থ', তাহা চরিত্রগত। যে জাতি যাহা চাহে, তাহারা সেইরূপ জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। তাহার সাক্ষী ইতিহাস।

গ্রন্থগত জ্ঞানেরও যথেষ্ট গৌরব আছে। তাহাও মানুষকে বিবিধ তত্ত্বকথার সন্ধান প্রদান করে। কিন্তু গ্রন্থগত জ্ঞানে মানুষ বড় বাচাল হইয়া

পড়ে, তর্কে বৃহস্পতিকেও পরাস্ত করিয়া দেয়, অথচ আত্মচরিত্র সম্বন্ধে সমুন্নত করিতে পারে না। চরিত্রগত জ্ঞান সেরূপ নহে। তাহাতে মানুষ জ্ঞাননিষ্ঠ হয়; যাহা শিক্ষা করে, তদ্দ্বারা চিন্তা ও কার্য্য নিয়মিত করিবার চেষ্টা করিয়া পশু মানুষ হয়,— মানুষ দেবতা হইয়া যায়।

জ্ঞানোপার্জ্জন শিক্ষা-সাপেক্ষ। কিন্তু কেবল গ্রন্থগত জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য গুরুশিষ্যের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত না হইলেও ক্ষতি হয় না। শিষ্য টীকা টিপ্পনীর সহায়তায় শিক্ষককে সাক্ষীগোপাল করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ মস্তকে উপাধির উচ্চ উষ্ণীষ বাঁধিয়া সংসারে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে সক্ষম হয়। চরিত্রগত জ্ঞানোপার্জ্জনে গুরুশিষ্যের মধ্যে আন্তরিক যোগস্থাপন করা আবশ্যক; টীকা টিপ্পনী চরিত্রগঠনের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

অনুকরণই সকল শিক্ষার মূলমন্ত্র। এই অনুকরণ বলে মানবশিশু উঠিতে বসিতে হাঁটিতে ও কথা কহিতে শিখে; বড় হইয়াও অনুকরণ বলেই সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা অধিগত করিয়া সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। গ্রন্থগত শিক্ষায় শিক্ষানুকরণ হইলেই কাজ চলিয়া যায়; চরিত্রগত শিক্ষায় চরিত্রানুকরণের প্রয়োজন। সেখানে শিক্ষকের চরিত্রাদর্শই প্রধান পাঠ্যগ্রন্থ; সে আদর্শ যেমন সমুন্নত, শিক্ষাও সেইরূপ ফলপ্রদ হয়।

আমরা কি চাই? আমাদের শিক্ষা প্রণালী আমাদিগকে সমুন্নত করিতেছে না বলিয়া সর্ব্বদা যে কোলাহল উঠিয়াছে, তাহার মূলে অনেক সত্য কথা নিহিত আছে। আমরা মানুষ হইতেছি না বলিলে, আমাদের আত্মাভিমানে যে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, তাহাতে জ্ঞানশূন্য হইয়া আমরা সত্যগোপনের চেষ্টায় বিবিধ তর্কের অবতারণা করিয়া আত্মমর্য্যাদা ঘোষণা করি। দুই চারি জন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদিগকেও মানুষ বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করি। কিন্তু রোগীর পক্ষে রোগ গোপন করিয়া লাভ নাই; অধঃপতিত জাতির পক্ষে চরিত্রহীনতার কথা তর্কজালে ঢাকিয়া রাখিবার আড়ম্বর করিয়া লাভ নাই! শিক্ষায় সমুন্নত বলিয়া চীৎকার করিয়া কি হইবে? চরিত্রে দিন দিন বড়ই হীন হইয়া পড়িতেছি!

গ্রন্থগত শিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি; তাহার অনেক প্রমাণও সভাজগতে পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। এমন কি, আমাদের মধ্যে এত বড় বাক্যবীর আবির্ভূত হইতেছে যে তাহারা যে কোন জাতির গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারিত। তাহাদের কৃতিত্ব পদ্যে গদ্যে সাহিত্যে ইতিহাসে অভিব্যক্ত হইয়া জাতীয় ভাণ্ডার নানা রত্নে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। তথাপি থাকিয়া থাকিয়া কি এক করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে কেন? কে যেন শতকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া কহিতেছে— আমরা মানুষ হইতেছি না! ইহার সুতীব্র প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। ইহা একেবারে মিথ্যা কথা নহে!

কেহ কেহ এই আর্ত্তনাদের মূলানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া শিক্ষাপ্রণালীর দোষোদ্ঘাটনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের অধ্যবসায়বলে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা প্রায় পাঠ্য নির্ব্বাচনের সমালোচনা লইয়াই অবসর শূন্য। আরও ভাল ভাল পুস্তক নির্ব্বাচন কর, আরও গ্রন্থগত জ্ঞানের ছড়াছড়ি হউক,— ইহাই তাঁহাদের প্রধান প্রার্থনা। এ প্রার্থনা পূর্ণ হইলেই যে আমরা মানুষ হইব, তাহার আশা কোথায়? এ পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট জ্ঞানের কথা, যথেষ্ট চরিত্রবলের কথা লিখিত ছিল না কি? তথাপি আমরা মানুষ হইলাম না কেন?

সকল বিষয়েই আন্তরিকতার অভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। প্রেমে আন্তরিকতার অভাব, অপ্রেমেও আন্তরিকতার অভাব। ভাল মন্দ সমস্তই যেন মৌখিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশপ্রেম বেশ সতেজ হইয়া উঠিতেছে বলিয়া যাঁহারা দুন্দুভিনিনাদে শুভ সমাচার ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা সভামণ্ডপ ছাড়িয়া পল্লী কুটীরে প্রবেশ করিলে দেখিবেন— স্বদেশপ্রেমও শব্দমাত্রে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। সমবেদনা নাই, সমবেত চেষ্টা নাই; একনিষ্ঠ আত্মীয়তা যেন কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! ভদ্রতার খাতির প্রবল হইয়াছে। তজ্জন্য, যেখানে হাসিতে হয় সেখানে হাসি, যেখানে কাঁদিতে হয় সেখানে কাঁদি; কিন্তু স্বদেশের কল্যাণকামনায় যেখানে হৃদয় শোণিত ঢালিয়া দিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ে আমরণ খাটিতে হয়, সেখানে

পিছাইয়া পড়িয়া, যাহারা খাটিতেছে তাহাদিগকে উপহাস করিয়া আত্মকার্য্যের সমর্থন করি। আমি পারিতেছি না, তাহা স্বীকার করিয়া খাটো হইতে লজ্জা হয়; তাই সমালোচনায় আত্মদোষ উড়াইয়া দিয়া তোমরা যাহা করিতেছ তাহা যে কিছুই নহে সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য বিজ্ঞতার মুখস পরিয়া বেশ গম্ভীর হইয়া আসন গ্রহণ করি!

আন্তরিকতার ন্যায় একতাও দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। একতাই যাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াও একতা লাভে সক্ষম হইতেছি না কেন? আগমোত্থ জ্ঞান সকলকেই পণ্ডিতম্মন্য করিতেছে। আমরা সকলেই সুপণ্ডিত; সুতরাং কে কাহাকে মানিয়া চলিব? একতার মূলে যে চালক শক্তি বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক, আমাদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। যাহারা স্ব স্ব প্রধান, তাহারা কাহারও দ্বারা চালিত হইতে পারে না; যাহারা চালিত হইতে পারে না, তাহারা একতা লাভেও সক্ষম হয় না। চালিত হইতে হইলে চালকের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। দেশে যে সেরূপ লোক একেবারেই নাই, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়াই আমরা চালকশূন্য। শ্রদ্ধা চরিত্রগত শিক্ষার ফল; গ্রন্থগত শিক্ষায় তাহা বিকশিত হইতেছে না। যাঁহারা চালকের পদে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন, আমাদের বাচালতা তাঁহাদিগকেও আমাদের মত সাধারণ মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই বলিতেছে—আমিই সকলের বড়। কিন্তু আমি কত বড়, কেহ তাহার মাপকাঠি বাহির করিতে সম্মত হয় না।

কর্ত্তব্যজ্ঞান সমুজ্জ্বল করিবার জন্য কত আড়ম্বর আরব্ধ হইয়াছে! কিন্তু কর্ত্তব্য নিতান্ত আড়ম্বরহীন পদার্থ। সে মানুষকে নিঃশব্দে কর্ত্তব্যপথে তাড়না করে। এই তাড়নার মূল প্রস্রবণ আত্ম হৃদয়েই নিহিত আছে। বাহিরের দৃষ্টান্ত মানুষকে কর্ত্তব্য সাধনে কিয়ৎপরিমাণে উৎসাহ দান করিতে পারে; দেখাদেখি সৎকার্য্য সাধনে উদ্যোগী করিতে পারে; কিন্তু সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে মানুষকে কর্ত্তব্যপথে স্থির রাখিতে পারে না। সে শক্তি হৃদয়গত। তজ্জন্য চরিত্রের দৃঢ়তা চাই। গ্রন্থগত শিক্ষা সে দৃঢ়তা আনিয়া দিতে পারে না। সেই জন্য লোকে গ্রন্থগত শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াও কর্ত্তব্য

বিমুখ। কর্ত্তব্যপরায়ণতার একমাত্র পুরস্কার চিত্তপ্রসাদ; তাহা বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

কর্ত্তব্যের তালিকা নূতন করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের কর্ত্তব্য কি, তাহা জানি না বলিয়াই যে কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। জানি; কিন্তু তাহা মৌখিক জ্ঞান। হৃদয় তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তাড়না করে না। প্রসূতির জরায়ু যেমন আপনা হইতেই তাড়না করিয়া সুপ্রসব সুসম্পন্ন করিয়া দেয়, কর্ত্তব্যপালনও সেইরূপ। হৃদয়গত তাড়নাই কর্ত্তব্যপালনের প্রধান প্রবর্ত্তক। এই তাড়না এখন অন্য পথে ধাবিত হইয়াছে। আমরা বড় হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি; কিন্তু পথ হারাইয়া কেবল আস্ফালন আড়ম্বরে আপনাদিগকে নিতান্ত হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছি। ছোট খাট কর্ত্তব্যপালনই মহত্ত্বের সোপান; সে কথা এখন মানি না। ছোট খাট কর্ত্তব্য পদবিদলিত করিয়া খুব মস্ত রকমের কোন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া রাতারাতি বড় মানুষ হইবার আশায় ছুটিয়া চলিতেছি!

স্পৃহা অপেক্ষা ত্যাগই মানুষকে মানুষ করিবার পক্ষে অধিক উপযোগী। আমি খাইব, আমি পরিব, আমি বাঁচিব— তোমার যাহা হয় হউক: ইহা মানব সমাজের প্রাথমিক অবস্থার কথা। তখন মানুষ আর পশু পক্ষির মধ্যে অধিক পার্থক্য ছিল না। মানুষ আত্মত্যাগ করিয়া পশুকে মানুষ করিয়াছে। এই ত্যাগের প্রবর্ত্তকও মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক তাড়না। তাহা আগমোত্থ জ্ঞান হইতে বহুদূরে অবস্থিত। সুতরাং গ্রন্থগত শিক্ষা আমাদিগকে আত্মত্যাগ শিখাইতেছে না; বরং আমাদিগকে ক্রমশঃ ত্যাগের সীমা ছাড়াইয়া স্পৃহার সীমায় পৌঁছাইয়া দিতেছে। আমরা এখন স্পৃহাময়,— অন্ধ!

ত্যাগ, একপ্রাণতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় মানুষ মানুষ হয়। ইহা চরিত্রগত শিক্ষার অন্তর্গত। তাহা লাভ করিবার প্রধান উপায় চরিত্রানুকরণ। যে শিক্ষাপ্রণালীতে চরিত্রানুকরণ অধিক, তাহাই এরূপ চরিত্রগঠনের অধিক উপযোগী। গ্রন্থগত শিক্ষায় চরিত্রানুকরণের একান্ত অভাব,— এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু গ্রন্থনিহিত চরিত্র নিতান্ত নির্জ্জীব, প্রত্যক্ষবৎ দেদীপ্য-

যান নহে। গ্রন্থে সাধুচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া সাধুজীবন গঠনে যথেষ্ট উত্তেজনা লাভ করা সম্ভব; কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইবামাত্র গ্রন্থগত চরিত্রাদর্শ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত চিত্র মাত্র; কালে মলিন হইবার আশঙ্কা থাকে। আমাদের দেশে ইহার দৃষ্টান্ত বড় উজ্জ্বল। যাহাকে বিদ্যালয়ে দেখিয়া আশায় উৎফুল্ল হইতাম, তাহাকে সংসারে দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হইতেছি! গ্রন্থগত চরিত্রানুকরণের বল নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী।

আধুনিক শিক্ষা কেবল গ্রন্থগত শিক্ষা। সে শিক্ষা যাহা দিতে পারে, তাহা পর্য্যাপ্ত দান করিতেছে। যাহা দিতে পারে না, তাহা পাইলাম না বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করা শোভা পায় না। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী কথা কহিতে পারিলে কহিত,—"তোমরা আমার কাছে যাহা আশা করিতে পার না, তাহা পাইলে না বলিয়া অবোধের মত কাঁদিয়া মরিতেছ কেন?" আধুনিক শিক্ষা বিপণীর পণ্যদ্রব্য,— মূল্য দিয়া ক্রয় করা যায়। সেকালের শিক্ষা সিদ্ধাশ্রমের পুণ্যনির্ম্মাল্য,— ব্রহ্মচর্য্যের অমোঘ পুরস্কার স্বরূপ সাদরে মস্তকে স্থাপন করিবার যোগ্য। কেহ মূল্য দিয়া সে সৌভাগ্য ক্রয় করিতে সক্ষম হইত না। সেই জন্য বিদ্যার নাম— অমূল্য ধন।

এই অমূল্য ধন উপার্জ্জনের উপায় কি? হিন্দু তজ্জন্য বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে গুরুকুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; বৌদ্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গুরুকুলকে বিদ্যালয়ে স্থাপন করিয়াছিল; আমরা গুরুকুলকে অব্যাহতি দিয়া গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছি। সে বিদ্যালয়ে গুরুর আসনে বেতনভোগী শিক্ষক আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন।

গুরুকুলে চরিত্রানুকরণই শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ছিল; পড়িলেই পড়া শেষ হইত না; যাহা পড়িতে হইত, তদনুসারে চলিতে হইত। চলিতে চলিতে সৎপথে চলা অভ্যস্ত হইয়া পড়িত; সুতরাং সংসারে আসিয়া মানুষ সে শিক্ষা সহজে বিস্মৃত হইতে পারিত না। বিদ্যালয়ে শিক্ষানুকরণই শিক্ষার প্রধান উপায়। পড়িলেই পড়া শেষ হইয়া যায়; যাহা পড়িতে হয়, তাহা বলিতে পারিলেই পাণ্ডিত্যের পরিসমাপ্তি হয়। যাহা পড়িতে হয় তদনুসারে চলিতে হয় না, না চলিলে কোন তাড়না সহ্য করিতে হয় না;

সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষা মস্তিষ্কে এক গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়াই চরিতার্থ হয়, ইহারা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার জন্য শ্রম স্বীকার করে না। শিক্ষকের দায়িত্বও ইহার অধিক নহে। তিনি ঘড়ি ধরিয়া চড় চড় করিয়া পুস্তক পড়াইয়াই অব্যাহতি লাভ করেন। এইরূপ শিক্ষায় সমুন্নত হইয়াই লোকে শিক্ষকের আসনে উপবেশন করে। শিক্ষকের চরিত্র কিরূপ, নিয়োগকর্ত্তা তাহার প্রমাণ লইবার প্রয়োজন বোধ করেন না। যিনি স্বয়ং পিতামাতা গুরুজনকে ভক্তি করিতে সম্মত হন না, এমন কত শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসিয়া সুর করিয়া পড়াইয়া যান,—

"পিতামাতা গুরুজনে, সেবা কর কায়মনে।"

শিশু তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াই খালাস! ইহাতে মানুষ হইতেছে না বলিয়া আর্ত্তনাদ করা শোভা পায় না। এরূপ শিক্ষা ইহার অধিক আর কিছু প্রদান করিতে অক্ষম!

আমরা কি তবে এই গ্রন্থগত শিক্ষা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিব? এ চিন্তা এখন নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। এখনও আলোচনার সময় অতীত হয় নাই; সুতরাং কিরূপ সংস্কার সাধিত হওয়া উচিত, তাহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা কঠিন। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলবাস বুঝি অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। নূতন যুগের প্রয়োজন আর পুরাতন যুগের প্রয়োজন কিছু পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সেকালের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত করিবার উপায় নাই। একস্থানে বহুছাত্রের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইলেও গুরুকুলে স্থান হইতে পারে না; সকলের চরিত্রগঠনেও গুরুর সহায়তা প্রদত্ত হইতে পারে না। চরিত্রগত শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাহা অস্বীকার না করিয়াও বলা যাইতে পারে,—তাহা এ কালের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবার সম্ভাবনা অল্প। এ কালের উপযোগী চরিত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বৌদ্ধপ্রণালীর সহিত হিন্দুপ্রণালী মিলিত করিয়া অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া সারভাগ রক্ষা করিতে হইবে। গ্রন্থগত শিক্ষার সঙ্গে চরিত্রগত শিক্ষা সম্মিলিত করিতে হইবে। বিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে

হইবে; বুঝিবা শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যেও বহুব্যক্তিকে অন্যকার্য্যে প্রেরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সৃষ্টি।

(গান)

যবে, সৃজন বাসনা কণা লয়ে কৃপা আঁখি কোণে
চাহিলে হে রাজ-অধিরাজ,—
অমনি, নিমেষে বিরাট বিশ্ব, চরণে করিয়া নতি,
মহাশূন্যে করিলে বিরাজ!
মহালোক সিন্ধু হ'তে একবিন্দু ল'য়ে করে,
প্রক্ষেপ করিলে বিভু অন্ধকার চরাচরে;
অমনি চরণ তলে আলোক মণ্ডিত বিশ্ব
সন্তরিল জ্যোতিঃ স্রোত মাঝ।
মহাশক্তি তূণ হ'তে হেলায় একটি বাণ
নিক্ষেপিলে, জড় বিশ্ব অমনি পাইল প্রাণ
হ'ল মহাবেগে ঘূর্ণ্যমান আলোড়ি মহাবিমান
অগণিত জ্যোতিক সমাজ।

আনন্দ কণিকা মাত্র পরিল ব্রহ্মাণ্ড-শিরে
হাসিল এ চরাচর পুলকে শিহরি ধীরে
বহিল আনন্দ ধারা জড়জীব মাতোয়ারা
পরি তব আরোতির সাজ।
হেলায় ছিটায়ে দিলে অক্ষয় সৌন্দর্য্য তুলি'
ভাবচ্ছটা উজলিল মোহন বদন তুলি,
অমনি অনন্ত বরণ আসি ছড়াইল শোভারাশি
ধন্য তব নিত্য কারুকাজ!
তুমি কি মহান্ বিভু, আমি কি মলিন ক্ষুদ্র,
আমি পঙ্কিল সলিল বিন্দু তুমি যে সুধা সমুদ্র;
তবু তুমি মোরে ভালবাস, ডাকিলে হৃদয়ে এস,
তাই এত অযোগের লাজ।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

মালতীমাধব।

—•—

পদ্মাবতী নগরের প্রাচীন চতুষ্পাঠীতে এক নবীন যুবক ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। সে কত দিনের কথা, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পদ্মাবতী কোথায় ছিল, তাহাও ঐতিহাসিক তর্ক বিতর্কে নিতান্ত সংশয়াকুল।

যুবকের নাম মাধব:— রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় অতুলনীয়। একদা এক উন্মুক্ত বাতায়নপথে মাধবের নয়নযুগল পতিত হইল। সে যেন কি দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল; আবার কবে দেখিবে বলিয়া, ন্যায়শাস্ত্র ভুলিয়া, বিনাপ্রয়োজনেও সেই পথেই প্রতিদিন যাতায়াত করিতে লাগিল। তেমন দুটি হৃদয়ভরা নয়নভরা নয়নতারা আর কেহ কোন বাতায়নপথে দেখিবে কি না সন্দেহ। মাধব তাহা দেখিয়াছিল। দেখিয়াছিল বলিয়াই চিত্তবিসর্জ্জন করিয়াছিল। ন্যায়শাস্ত্র তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। ন্যায়দর্শনের প্রধান সম্বল অনুমান; এ দর্শন প্রত্যক্ষ— সংশয়চ্ছেদক অভ্রান্ত সত্য।

ইন্দীবরাক্ষীও দেখিয়াছিলেন, যেন রাজপথপার্শ্বে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া নববসন্ত দণ্ডায়মান; তাহার আবির্ভাবে পদ্মাবতীর শান্ত সমীরণ যেন ভ্রমর গুঞ্জনে ও কোকিলকূজনে নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! রমণীহৃদয় ন্যায়শাস্ত্র জানিত না; তাহা মাধবের অনুগামী হইয়া পড়িল।

রমণীর নাম মালতী;— রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, কলা চাতুর্য্যে সৌভাগ্যবতী অনূঢ়া যুবতী। সে আহার ভুলিল, নিদ্রা ভুলিল, ক্রীড়া-কৌতুক ভাসাইয়া দিয়া বাতায়ন খুলিয়া সেই পথের প্রান্তে চাহিয়া রহিল,— আবার কবে দেখিবে বলিয়া অপেক্ষা করিতে শিখিল।

কেহ কাহাকেও চিনিত না; পরিচয় জিজ্ঞাসারও উপায় ছিল না। লোকলজ্জা পরিচয় জিজ্ঞাসার অলঙ্ঘনীয় কণ্টক। কে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? কে আগে জিজ্ঞাসা করিবে? কি বলিয়াই বা জিজ্ঞাসা করিবে? কেহ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না; কিন্তু না দেখিয়া

থাকিতে পারা অসম্ভব হইয়া উঠিল। একজন উপরে,— প্রাসাদকক্ষে, বাতায়নপথে। আর একজন নীচে,— পদব্রজে, রাজপথপার্শ্বে। এইরূপে চক্ষুচতুষ্টয়ের দৃষ্টিবিনিময় প্রবর্ত্তিত হইল! ইহারই নাম "তারামৈত্রী"।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন,— বহুদিন দৃষ্টিবিনিময় চলিল; কিন্তু তাহাতে হর্ষ আর অধিক দিন কুলায় না! একরূপ দর্শনে সুখ না দুখ? কেহ তাহার মীমাংসা করিতে পারিল না। অবশেষে এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে, দেখিয়া আর সুখ নাই; অথচ না দেখিলেও মহাদুঃখ,— সংসার আঁধার, চিত্ত চেতনাহীন!

মাধব মালতীকে চিনিত না; মালতীও মাধবকে চিনিত না। কিন্তু মালতী মাধবের পিতা পরস্পরকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তাঁহারা সহাধ্যায়ী বাল্যবন্ধু। কামন্দকী নাম্নী বৌদ্ধতাপসীর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিবার সময়ে উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন— তাঁহাদের সন্তানদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। সে বাল্যপ্রতিজ্ঞা পালন করা মালতীর পিতার ভাগ্যে কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি রাজমন্ত্রী। রাজা নিজ শ্যালক নন্দন নামক এক অপাত্রে মালতীকে সম্প্রদান করিবার জন্য স্বয়ং সচেষ্ট হইলেন। পিতা নিতান্ত নিরুপায়,— নীরবে নয়নজলে অভিভূত।

ভগবতী কামন্দকীর নিকট ইহার কোন কথাই গোপন রহিল না। তিনি চীরধারিণী ব্রহ্মচারিণী হইলে কি হইবে? তিনিও ত রমণী। রমণীর দুঃখে রমণীহৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। রাজার প্রতিকূলে বলপ্রয়োগের উপায় নাই; সুতরাং কৌশলপ্রয়োগে মালতীমাধবের পরিণয় সাধনের জন্য কামন্দকী অগ্রসর হইলেন।

ইহা একটি সরল উপন্যাস। অমরকবি ভবভূতির কল্পনা প্রসূত "মালতী-মাধবের" অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে "প্রকরণ" নামে পরিচিত। যখন এই 'প্রকরণ' রচিত হয়, ভবভূতি তখন নবীনভাবুক,— সাহিত্য সংসারে অপরিচিত হইয়াও আত্মশক্তিতে সমুন্নত। তিনি সগর্ব্বে "মালতীমাধবের" অবতারণা করিয়া কহিলেন:—

"অদ্যই যোরে তারা
যারা করে মোর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ!

তাহাদের তরে নহে
বলি শুন, মোর এই রচনা প্রয়াস।"

"উত্তররামচরিতের" রচনাগৌরবে "মালতীমাধব" মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে "উত্তররামচরিতের" নাম সুপরিচিত, "মালতীমাধবের" নাম সুপরিচিত হইতে পারে নাই। এত দিন পরে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গানুবাদ করিয়া "মালতীমাধব" বঙ্গসাহিত্য সমাজে সুপরিচিত করিয়া দিলেন। এই বঙ্গানুবাদ কেমন সরল, সুন্দর, সুসঙ্গত, তাহা মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। এমন অনুবাদ যথার্থই অনুপম, অনুবাদকের অধ্যবসায় ও প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য কিরূপ উপাদেয় রসভাণ্ডার, এরূপ অনুবাদে তাহার অনেক আভাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

দক্ষিণাপথে, বিদর্ভদেশে, পদ্মপুর নগরে ভবভূতির জন্ম হয়। তিত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী কাশ্যপগোত্রীয় পঞ্চাগ্নিসেবক সোমপায়ী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশীয় সুগৃহীতনামা গোপাল-ভট্টপৌত্র নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণীদেবীর পুত্র শ্রীকণ্ঠ উপাধিধারী মহাকবি ভবভূতি প্রথমে কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সভাসদ ছিলেন, কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য কান্যকুব্জ জয় করিবার পর, ভবভূতি কাশ্মীরবাসী হন। ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ঘটনা। কিন্তু 'মালতীমাধব' কোথায় কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মালতীমাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত, ভবভূতির লেখনীপ্রসূত এই তিনখানি দৃশ্যকাব্য দেখিতে পাওয়া যায়। "উত্তররামচরিত" আত্মগৌরবে সর্ব্বজন বিদিত; 'মালতীমাধব' তাহার সমকক্ষ না হইলেও, "উত্তররামচরিতের" অমর কবির বাল্যরচনার অযোগ্য নিদর্শন বলিয়া বোধ হয় না। "মালতীমাধব" আদিরসপ্রধান;— ভাবে, ভাষায়, রস সমাবেশ বাহুল্যে টলটলায়মান!

"মালতীমাধবে" অমরকবি কালিদাসের "শকুন্তলার" ছায়া পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। অনুবাদক মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,— "পরবর্ত্তী কবির কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ছায়া পড়া স্বাভাবিক।" এ কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইলেও, সে ছায়া ভবভূতির গৌরববর্দ্ধন করিতে পারে

নাই। দুষ্মন্ত যেমন প্রিয়বয়স্য মাধব্যকে নির্জ্জনে ডাকিয়া তাপসকন্যার হাবভাব রূপলাবণ্যের বর্ণনা করিয়াছেন, মাধবও সেইরূপ প্রিয়বয়স্য মকরন্দকে ধরিয়া মালতীর কথা শুনাইয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের দুষ্মন্ত আর ভবভূতির মাধব তুল্য ভাবে সৌন্দর্য্যবিকাশ করিতে পারেন নাই। দুষ্মন্ত শকুন্তলাতে অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া এমনভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেন রক্তমাংসের অতীত — বিধাতার মানসী মূর্ত্তি, সৃষ্টিকৌশলের পরাকাষ্ঠা! মাধব মালতীতে লৌকিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া এমন ভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেন ইহলোকের সকল-সৌভাগ্যের সৌন্দর্য্যসার — মূর্ত্তিমতী সম্ভোগলক্ষ্মী! কালিদাসের বর্ণনায় বিস্ময় আছে; ভবভূতির রচনায় কেবল মোহ। সে মোহ অধিকাংশস্থলেই লালসাময়। কিন্তু "শকুন্তলের" সঙ্গে "মালতীমাধবের" তুলনায় সমালোচনা করিলে, ভবভূতির প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। "শকুন্তল" কালিদাসের পরিণত সাহিত্যশক্তির অক্ষয় ফল; "মালতীমাধব" ভবভূতির অপরিণত জীবনের রচনাশিক্ষার প্রথম নিদর্শন। নাট্যকৌশলে "মালতীমাধব" বাল্যরচনার পরিচয় প্রদান করিতেছে। অনুবাদক মহাশয় তাহারও একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি কেন — এরূপ দৃষ্টান্ত আরও উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু "মালতীমাধব" বহু ঐতিহাসিক তথ্যের আধার বলিয়া বহুমূল্য। সে গৌরবে "শকুন্তল" ইহার সমকক্ষ নহে।

লোকপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া "শকুন্তল" রচিত হইয়াছিল; তাহার সহিত নরনারীর পূর্ব্বপরিচয়ের অভাব ছিল না। অকপোলকল্পিত "মালতীমাধবের" রচনাকৌশলই একমাত্র সম্বল। তাহা যে কালস্রোতে ভাসিয়া যায় নাই, ইহাই ভবভূতির রচনাকৌশলের পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের কথা।

কে বড়,— সে তর্কে ইতিহাসের বিশেষ লাভ নাই। কাহার গ্রন্থে কত ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই বিচার করিয়া দেখ। 'মালতীমাধব' সে বিচারে বহুমূল্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। অনুবাদক মহাশয় এই সকল তথ্য সংকলন করিয়া দিলে ইতিহাস সংকলনের পথ সহজ হইত। তিনি কেবল ইহার ইঙ্গিত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

সেকালে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, "মালতীমাধবে" তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে শিক্ষা মহিলামণ্ডলীকে বহু বিদ্যায় বিভূষিত করিলেও, উচ্ছৃঙ্খল করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কামন্দকী রমণী হইয়াও অধ্যাপকের উচ্চাসনে আরূঢ়া ছিলেন; তাঁহার নিকট যুবকেরাও বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। যুবকের ন্যায় যুবতীরাও কাব্য অলংকার ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া নৃত্যগীত চিত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইতেন। তথাপি তাঁহাদের চরিত্রে রমণী স্বভাবসুলভ কমনীয়তার অভাব ঘটিত না। শিক্ষিতা যুবতী মালতী পিতা কর্ত্তৃক অপাত্রে সমর্পিতা হইবেন শুনিয়া, সরলা বালিকার ন্যায় রোদন করিয়াছেন; পিতৃশাসন উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য সিংহিনীর ন্যায় তীব্রতেজে গর্জ্জন করিয়া উঠেন নাই; কামন্দকীও তাঁহাকে পিতৃশাসনে আত্মসমর্পণ করিবার জন্যই উপদেশ দান করিয়াছেন। মালতীর সে সময়ের স্বগত চিন্তার মধ্যেও কেবল এই কথা;— "হা তাত! তুমিও আমার প্রতি এরূপ হইলে? এ পৃথিবীতে ভোগ-তৃষ্ণারই জয়।" মালতীর এই বিনীতাচার, সমাজশাসনের এই অখণ্ড প্রতাপ, গুরুজনের এই পরাধীন অবস্থাই মালতী চরিত্রকে এত সুন্দর করিয়া, "মালতীমাধব" এত মনোজ্ঞ করিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখ, সে সাহিত্যে শিক্ষিতা রমণী উপহাসপাত্রী। সংস্কৃত সাহিত্যে সেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেকালের সাহিত্যসেবকগণ নারী-জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন; একালের অনেকে সেরূপ মার্জ্জিত রুচির পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। দোষ কাহার,— ভবিষ্যতের ইতিহাস তাহার মীমাংসা করিতে পারিবে।

সেকালের স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে কিরূপ স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলিত ছিল, "মালতী-মাধবে" তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনূঢ়া যুবতী মালতী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রকাশ্যপথে দেবোদ্যানে গমন করিতেন;— সমাজে তাহা দোষাবহ বলিয়া পরিচিত ছিল না। এত স্বাধীনতা থাকিতেও, মালতী অপাত্রে সমর্পিতা হইবার ভয়ে পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই; হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তথাপি পিতৃশাসনে অবনত হইয়া নন্দনের সঙ্গে পরিণীতা হইবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বিবাহমঙ্গলের কৌতুকাগার

পালন করিতেছেন! ভগবতী কামন্দকীর কৌশলজাল সফল না হইলে, মালতীকে নন্দনের গৃহেই জীবন যাপন করিতে হইত।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা যে পুরাকালে ভারতললনার মর্যাদারক্ষার কিছুমাত্র অন্তরায় হইত না, "মালতীমাধবে" তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা সাধারণতঃ রক্ষিসঙ্গেই রাজপথে বহির্গত হইতেন। মদয়ন্তিকা নাম্নী নন্দনের অনূঢ়া ভগিনী এইরূপে মদনোদ্যানে গমন করিলে, উদ্যানের পালিত ব্যাঘ্র সহসা পিঞ্জরমুক্ত হইয়া তাঁহার শরীররক্ষিগণকে বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়াছিল। তখন মাধবসখা মকরন্দ স্বয়ং আহত হইয়াও মদয়ন্তিকাকে রক্ষা করিয়া ব্যাঘ্রটিকে নিহত করেন। এই সূত্রে তাঁহাদের মধ্যে "তারা মৈত্রী" ঘনীভূত হয়।

ভগবতী কামন্দকীর অব্যর্থ কৌশলে মকরন্দ মালতীর বৈবাহিক পরিচ্ছদে কন্যারূপে সুসজ্জিত হইয়া মালতী বলিয়া নন্দনকে মাল্যদান করেন এবং বধূবেশে নন্দনগৃহে উপনীত হইয়া নন্দনকে প্রহারে প্রত্যাখ্যান করেন। যখন সত্যঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন মাধবের সঙ্গে মালতীর এবং মকরন্দের সঙ্গে মদয়ন্তিকার পরিণয় ব্যাপার যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইল। এই আখ্যানবস্তু পরিস্ফুট করিতে গিয়া কবি সেকালের বৈবাহিক উৎসব আচারের যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত করিয়াছেন; সেকালেও যে একালের ন্যায় "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর" কত না দুর্গতি হইত, তাহার আভাস প্রদান করিয়াছেন।

সেকালে নরবলিপ্রিয় কাপালিকের কিরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, "মালতী-মাধবে" তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাপালিকের প্রতি সেকালের জনসমাজের মনে কিরূপ আতঙ্কজড়িত ঘৃণা বর্ত্তমান ছিল, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। কোন্ সময় হইতে কিসূত্রে ভারতবর্ষে এই কাপালিক ধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস সংকলন কার্য্যে "মালতীমাধব" অনেক সহায়তা করিতে পারিবে।

লোকব্যবহার প্রদর্শন করাই নাট্যসাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। যে সকল নাটকে রাজা বা রাজপুত্র নায়ক, তাহাতে সাধারণ প্রজাবর্গের ব্যবহার প্রদর্শিত হইতে পারে না। "মালতী মাধবের" নায়ক রাজা বা রাজপুত্র

নহে; তজ্জন্য "মালতীমাধবে" সাধারণ লোকব্যবহারের নানা তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ দৃশ্যকাব্য কাব্যাংশেও সুখপাঠ্য, ইতিহাসাংশে বহুমূল্য। সুতরাং এরূপ গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। অনুবাদক মহাশয় তাহার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, সোণায় সোহাগা হইত।

অনুবাদে মূলগ্রন্থের ভাবরক্ষা করা কত কঠিন, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। কেহ কেহ ভাষা রক্ষার চেষ্টা করিয়া, ভাবরক্ষায় উদাসীন হইয়া, অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া থাকেন। এ অনুবাদ সেরূপ হয় নাই। ইহাতে ভাবরক্ষার জন্যই চেষ্টা করা হইয়াছে, ভাষা তাহার অনুগামী হইয়া অনুবাদকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। সকলস্থলে এরূপ যথাযথ অনুবাদ চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই বলিয়া অনুবাদকের অপরাধ নাই। যতদূর সম্ভব, অনুবাদে মূলগ্রন্থের মর্য্যাদা ও কাব্যসৌন্দর্য্য সুরক্ষিত হইয়াছে। এরূপ অনুবাদ বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন। ইহার নূতনত্বের ন্যায় কৃতিত্বও সবিশেষ প্রশংসনীয়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন।— কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। 'চোখের বালি' যতই পড়িতেছি ততই ইহার বর্ণনা চাতুর্য্যে ও ভাষার লালিত্যে মুগ্ধ হইতেছি। গল্পটী ক্রমেই জমাট বাঁধিতেছে, পড়িবার কৌতূহলও ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। শেষে কি দাঁড়াইবে বুঝা কঠিন, তবে রবিবাবু হাল ধরিয়া আছেন, ইহাই একমাত্র সাহস। 'মুক্তামালা' গল্পটীতে সেকেলে গল্পের পরিচ্ছদে 'সুখ মনের অবস্থা মাত্র, তাহা বাহিরের বস্তুতে নাই' এই সত্যটী পরিস্ফুট করা হইয়াছে। 'জন্মভূমির' প্রথমভাগ দ্বাদশ সংখ্যায় 'দাবা খেলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ অনেকদিন হইল পড়িয়াছিলাম। ভাষার অমিল থাকিলেও 'দাবার জন্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা হইতে ভাবের অমিল বড় অধিক দেখিলাম না। 'সারসত্যের আলোচনা' অতি উৎকৃষ্ট দার্শনিক প্রবন্ধ। নবাবী-আমলের ইতিহাসের সমালোচনা কিছু মিঠেকড়া হইয়াছে। শুনিতেছি গ্রন্থকার তাহার প্রতিবাদ করিবেন। সমালোচনার সমালোচনা এক নূতন ব্যাপার বটে!

নবপ্রভা।— কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। 'আবার পূজা আসিল' প্রবন্ধটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'চাঁবল' শীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 'উৎসাহ' বাঙ্গলা মাসিকপত্রের যে দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়াছে, তাহার প্রতিকার 'উৎসাহে'র দ্বারা হইবে বা হইতেছে এ দম্ভ উৎসাহের নাই। যাঁহারা প্রতিকার করিতে সক্ষম, তাঁহারাও যে উদাসীন, তাহাও বলা হইয়াছে। 'নবপ্রভা' সে কথা না ধরিয়া আমাদিগকেই উপহাস করিয়াছেন। এরূপ ভাবে সমালোচনা লিখিলে নবপ্রভার মাসিক সাহিত্য সমালোচনার চেষ্টা না করিলে ক্ষতি নাই।

নির্ম্মাল্য।— আশ্বিন ও কার্ত্তিক। আবার 'নির্ম্মাল্য' বাহির হইয়াছে। এবার তাহার পুরাতন সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষক পরিবর্ত্তিত হইয়া এক কমিটির উপর ভার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বহুসন্ন্যাসীতে 'গাজন নষ্ট' না হইলেই আহ্লাদের কথা। আলোচ্য সংখ্যার প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য। 'ভাব আর চিত্রকলা' এবং 'অশিক্ষিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি কার্ত্তিকমাসের নির্ম্মাল্যের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। 'বসুমতী' উক্ত দুইটি প্রবন্ধকেই নিন্দা করিয়াছেন,— তাহা ট্রামের ধারের 'একপয়সা— বসুমতী'র উপযুক্ত বটে! এস্থলে আমাদের 'পিচুড়ী'র কবির কথা মনে পড়িল,—

বিষ উগারিণী ধরেছ লেখনী
Critic হয়েছ মস্ত,
পঙ্ক পঙ্ক বাক্য বরষি
দেখাইছ কত কস্ত।"

আশ্বিন মাসের নির্ম্মাল্য দেখিয়াও বসুমতীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। বল, এত আশঙ্কা কিসের? যাহা হউক আমরা নির্ম্মাল্যের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

প্রবাসী।— আশ্বিন ও কার্ত্তিক। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী লিখিত রাণীভবানীর পত্র সত্য হইলে একটি ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে একজন নবাবকে তাহার অধীন জমিদার স্বাধীন রাজার ন্যায় এরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ না পাইলে আমাদের বিশ্বাস দাঁড়াইবার সুদৃঢ় ভিত্তি পায় না। 'প্রাচীন মানব' ব্যতীত এবারকার প্রবাসীতে উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধও নাই। ইহার মধ্যেই এত দৈন্য? মাসিক সাহিত্য সমালোচনার ছবিটি নানা ভাবোদ্দীপক, ইহাকে "সমালোচনা" না বলিয়া "হেঁয়ালী" বলিলেও চলিত। আগামী সংখ্যায় বুঝি হেঁয়ালীর অর্থ দেখিতে পাইব?